182.৪C

1550

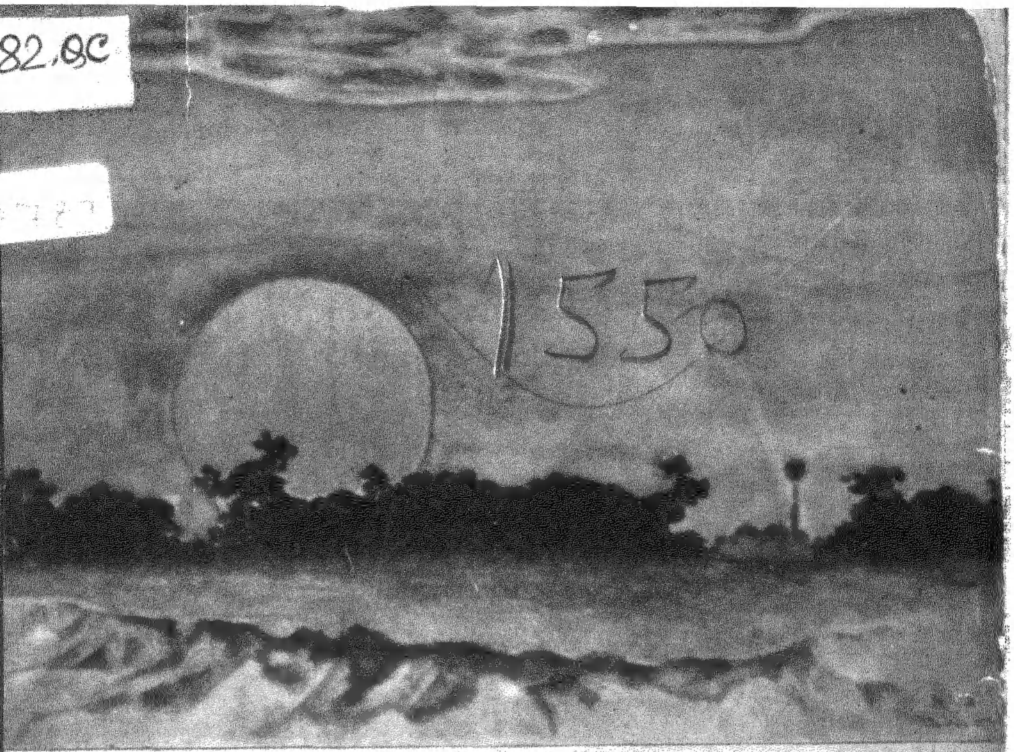

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

1392

499.

উদ্বোধন

শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন ১৩৯২

৮৭তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

9

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই
সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে।
বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হয়ে
চিনিটুকু নেবে।

"জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ
রস আর বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু
নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।

"আর পানকৌটির মত। গায়ে জল
লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল
মাছের মত। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ
পরিষ্কার উজ্জ্বল।

"গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে
মালটি নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার সংস্থা
আনন্দবাজার পত্রিকা *বিজনেস স্টাণ্ডার্ড* দ্য টেলিগ্রাফ
দেশ সানডে *স্পোর্টসওয়ার্ল্ড* রবিবার *আনন্দলোক*
আনন্দমেলা *বিজনেসওয়ার্ল্ড*

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০০১

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

●● **লেখক-লেখিকাগণের জন্য :** ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। ডট্ পেনে লেখা বা কার্বন কাগজে লেখা প্রবন্ধাদি গ্রাহ্য হইবে না। রচনার নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখায় প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকের দায়িত্ব থাকিবে না।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের যথাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। যে পুস্তক হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার নাম, গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একান্ত আবশ্যক।

অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে হইলে রেজেস্টারি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক। কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না।

পত্রের উত্তরের জন্য ২৫ পয়সার ডাকটিকিট বা ঠিকানা সম্বলিত খাম / কার্ড পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠি-পত্র, সংযুক্ত সম্পাদক অথবা সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। চিঠি-পত্র বাংলায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধাদির মধ্যে যদি ইংরেজী ভাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকে, তাহা হইলে লেখক যেন উহার বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধের মধ্যে সন্নিবেশিত করেন।

●● **গ্রাহকগণের জন্য :** মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হওয়া যায়। বৎসরের যে-কোন সময়ে বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হইলেও গ্রাহক করা হইবে মাঘ মাস হইতে। বার্ষিক মূল্য সডাক ২২.০০ টাকা, বাংলাদেশ ৪০.০০ টাকা, ভারতের বাহিরে হইলে সি মেল-এ ৮৫.০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ২৩০.০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা।

●● **আজীবন গ্রাহকগণের জন্য :** এককালীন অথবা ১২ মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী একাধিক কিস্তিতে ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা পাঠাইলে আজীবন গ্রাহক (৩০ বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ) হওয়া যায়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ২৫.০০ টাকা দিতে হইবে। যে কোন মাস হইতে আজীবন গ্রাহক হওয়া চলে।

পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, অবিলম্বে কার্যালয়ে জানাইলে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী মাসের মধ্যে না জানাইলে, পত্রিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকিবে না।

উদ্বোধনের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপনে **পুরা নাম-ঠিকানা** ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।

●● **কার্যালয়ের সময় :** সকাল ৯-৩০ থেকে বিকাল ৫-৩০

শনিবার সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১-৩০

রবিবার বন্ধ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার** সময় তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের গ্রাহক-সংখ্যা **অবশ্যই উল্লেখ করেন।** অন্যথায় কাজের অসুবিধা হয় এবং অযথা বিলম্ব হইবার আশঙ্কা থাকে।

ঠিকানার পরিবর্তন হইলে অন্ততঃ একমাস পূর্বে নূতন ঠিকানা কার্যালয়ে জানাইতে হইবে। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার কালে গ্রাহক-সংখ্যা এবং পূর্ব ঠিকানা অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

নমুনা সংখ্যার জন্য ২.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়।

মনিঅর্ডারযোগে অথবা ডিম্যান্ড ড্রাফট্ মাধ্যমে টাকা প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয়। "UDBODHAN OFFICE" এই নামে ড্রাফট্ করিতে হইবে।

●● **প্রকাশকদিগের জন্য :** সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

●● **বিজ্ঞাপনদাতাদিগের জন্য :** কার্যালয়ে যোগাযোগ করিলে বিজ্ঞাপনের হার জানা যাইবে।

কার্যাধ্যক্ষ

উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

1৪2 ৫৩.৪99 ৭

সূচীপত্র ॥ আশ্বিন ১৩৯২

'এবার যদি এলি উমা' স্বামী বিরজানন্দ ৪৭৩
কথাপ্রসঙ্গে :
  'নমস্তস্যৈ নমো নমঃ' ৪৭৪
আগমনী (কবিতা) শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৪৭৮
স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৪৭৯
স্বামী শুদ্ধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৪৮৩
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী স্বামী গম্ভীরানন্দ ৪৮৪
'খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায়'
শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৪৮৮
'মন নিয়ে কথা' স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ৪৯৭
ধ্যান : সকল যোগের পূর্ণতাসাধক স্বামী প্রেমেশানন্দ ৫০০
শ্রীশ্রীমায়ের একটি কথা স্বামী ধীরেশানন্দ ৫০৩
প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে যুবমানসে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রভাব
ডক্টর শিশির কর ৫১০
চরিত্রগঠনে সাহিত্য শ্রীআনন্দ বাগচী ৫১৮
'দেবীমাহাত্ম্য'-তত্ত্ব ও উপাখ্যান স্বামী প্রমেয়ানন্দ ৫২৩
বহুরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী ভূতেশানন্দ ৫২৮
এযুগের অসুখ শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী ৫৩৪
বুলগেরিয়ায় কিছুদিন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ৫৩৯
বিস্মৃত কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস শ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী ৫৫০
শ্রীম : পল ব্রান্‌টনের চোখে
অনুবাদক : অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৫৫৬
'দ্বা সুপর্ণা' ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৬১
নরেন্দ্রপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির শ্রীসুনীলকুমার পাল ৫৬৩
মন্দির ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ ৫৬৪
নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠা
শ্রীরণজিত মুখোপাধ্যায় ৫৬৫
জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী
ডক্টর চিত্রা দেব ৫৭০

কবিতা

শ্রীমন্‌-মহাপ্রভু-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রস্য পঞ্চশততম জন্মমহোৎসবে সপ্রণাম-প্রশস্তি-পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ৫৭৭
জগজ্জননী সারদা বেগম সুফিয়া কামাল ৫৭৯
যুবকদের উদ্দেশে শ্রীঅরবিন্দ
অনুবাদক : শ্রীকান্তপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ৫৮০
অপার কামনাসিন্ধুজলে ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র ৫৮২
নির্ভার শ্রীসুনীল বসু ৫৮৩
কথামৃত শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় ৫৮৪
অর্চনা শ্রীমতী হিমানী রায় ৫৮৫
প্রার্থনা শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী ৫৮৫
অশ্রুত-অদৃষ্টযোগ ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী ৫৮৬
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৮৬
সে-নির্জনে শ্রীশান্তশীল দাশ ৫৮৭
দশমহাবিদ্যা শ্রীমতী সাধনা মুখোপাধ্যায় ৫৮৭
মিনতি শ্রীপ্রদোষকুমার পাল ৫৮৭
অনাম-অরূপ স্বামী নিরাময়ানন্দ ৫৮৮
সৃষ্টি-পত্তন শ্রীসূর্যকুমার ভুঞা
অনুবাদক : ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী ৫৮৮
ধন্য-শিল্পী শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮৯
পঞ্চবটী শ্রীকালীসাধন ঘোষ ৫৯০
মন্দির ও দেউল ডক্টর শান্তিকুমার ঘোষ ৫৯১
বিজয়া ডক্টর নূপুর গুপ্ত ৫৯২
উদ্বোধনে মা ব্রহ্মচারিণী অজিতা ৫৯৩
রামায়ণীঃ তৃতীয়-চতুর্থ সর্গ শ্রীঅসিতকুমার হালদার ৫৯৪
‘নমো সম্বুদ্ধায়’ স্বামী বিবেকানন্দ
সঙ্কলক (গদ্য-ছন্দে) : অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু ৫৯৬

বিমলেশ্বরের পথে স্বামী চৈতন্যানন্দ ৬০৫
মনে মনে শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৬১৩
আণ্টার্কটিকা অভিযান ডক্টর সুদীপ্তা সেনগুপ্ত ৬১৬

ভক্ত ভবনাথ শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায় ৬২২
মুখের ভিতরের ক্যানসার ডক্টর অমিয়কুমার হাটি ৬৩১
শঙ্করাচার্যের দেবীপূজা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ৬৩৩
সাহিত্যের আলোকে শ্রীচৈতন্য শ্রীহর্ষ দত্ত ৬৩৫
বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : একদিনের কথা
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ৬৪২
বিবেকানন্দের ইসলাম-ভাবনা অধ্যাপক আবুল হাসনাত ৬৫০
ভক্তি—রামকৃষ্ণের বাণী এবং জীবনীতে শ্রীচিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ৬৫৫
ইসলামের অন-ইসলামি সম্পদ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৬৫৭
শিল্পী অসিতকুমার হালদার শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা ৬৬১
বিবেকানন্দগতপ্রাণ শরচ্চন্দ্র শ্রীমতী ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬৭
পুস্তক সমালোচনা : ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ৬৭৪
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৬৭৫
বিবিধ সংবাদ ৬৭৬

॥ প্রচ্ছদ-পরিচিতি ॥

'শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ একদিন ভোরের দিকে বাড়ির ছাদে পূর্বমুখী বসে ধ্যান করার চেষ্টা করছিলেন।…হঠাৎ চোখ খুলে গেলে তিনি দেখতে পেলেন পূর্বাকাশে নব অরুণোদয়ের কি অপূর্ব রঙের খেলা…। কে যেন তাঁর মনের মধ্যে কথা বলে—"বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে-রূপের বিকাশ চোখ মেলে তাকে দেখ। চোখ খুলে তোমার সাধনা, চোখ বুজে নয়। যোগীর ধ্যান চোখ বুজে, শিল্পীর ধ্যান চোখ চেয়ে। সাধনার লক্ষ্য যে পরম সুন্দর দেবতা যাঁর সৌন্দর্যের প্রকাশ এই জগৎ জুড়ে রয়েছে, তাঁর উপলব্ধিকে অন্তরে কেমন করে ধারণা করব যদি না চোখ ও মন খুলে তাঁকে দেখি…" !'—স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে এ-কথা বলেছিলেন বর্ষীয়ান শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা। শিল্পগুরুর এই জীবনদর্শন শিষ্যকেও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। এখনও প্রতিদিন উষাকালে বার্ধক্য-দীর্ণ মন্থরপদে তাই তিনি দূর প্রান্তর পেরিয়ে কোপাই নদীর ধারে গিয়ে নিরালায় বসে থাকেন—চোখ মেলেই প্রতীক্ষায় থাকেন পূর্বদিগন্তের সেই জবাকুসুমসঙ্কাশ অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য। চিত্তপটে প্রতিফলিত সেই রূপটি কেমন জানতে চাইলে শিল্পী দেববর্মা অবিলম্বেই যে-ছবিখানি রঙ-তুলি দিয়ে কাগজে এঁকে দিয়েছিলেন—শারদীয় 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদে সেটিই মুদ্রিত। উল্লেখ্য যে, তাঁরই ইচ্ছাক্রমে এই প্রচ্ছদ-মুদ্রণ।

পুণ্য মহালয়ায় প্রকাশিত
সঙ্ঘগুরু স্বামী গম্ভীরানন্দজীর
ভূমিকা-সম্বলিত
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ-সম্পাদিত

শতরূপে সারদা

● শ্রীমা সারদাদেবীর জীব
চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশিষ্ট সন্ন
সাহিত্যিক ও গবেষকের রচনা-
একখানি অনবদ্য গ্রন্থ।

● **সারদাদেবী সম্পর্কে**
জাতীয় গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত
হয়নি।

গ্রন্থখানি যাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ তাঁদের কয়েকজন :

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী গম্ভীরানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী সারদেশানন্দ, স্বামী অপূর্বানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী গীতানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী মুমুক্ষানন্দ, স্বামী অজজানন্দ, সিস্টার দেবমাতা, কুমুদবন্ধু সেন, অজিতনাথ রায়, আশাপূর্ণা দেবী, গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, ন্যান্সি টিলডেন (আমেরিকা), প্রণবেশ চক্রবর্তী, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, নীরদবরণ চক্রবর্তী, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রায় **নয়শো পৃষ্ঠার** এই গ্রন্থটি লাইনো টাইপে ও হোয়াইট অফসেট প্রিন্টিং কাগজে ছাপা এবং সুদৃশ্য প্লাস্টিক জ্যাকেটে মোড়া। গ্রন্থটিতে থাকবে বিভিন্ন সময়ে তোলা **শ্রীমায়ের তেরোখানি ফটো** এবং গুরুত্বপূর্ণ **অপ্রকাশিত কিছু চিঠিপত্র ও মূল নথি**। এছাড়া থাকছে **শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত ফটো** যেটি শ্রীরামকৃষ্ণ **স্বয়ং পুজো** করেছিলেন এবং শ্রীমা যেটি **নিত্য পুজো** করতেন।

এই মূল্যবান **গ্রন্থটির** মূল্য মাত্র **পঞ্চাশ টাকা**।

ইনস্টিটিউট থেকে **গ্রন্থটি** সংগ্রহের তারিখ : ১৪ থেকে ১৭ অক্টোবর, সময় : বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা।

পুজো উপলক্ষে **ইনস্টিটিউট বন্ধ :** ১৮ থেকে ২৯ অক্টোবর।

অগ্রিম গ্রাহকদের রসিদ দেখিয়ে বই সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। পুজোর ছুটির পর ৩০ অক্টোবর থেকে ঐ একই সময়ে (রবিবার ও ছুটির দিন ছাড়া) অগ্রিম গ্রাহকগণ আবার বই সংগ্রহ করতে পারবেন। যাঁরা ডাকযোগে বই নেবেন বলে জানিয়েছিলেন তাঁদের ভি. পি. করে বই পাঠানো হবে।

প্রকাশক :

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার

গোলপার্ক : কলিকাতা-৭০০০২৯ :: টেলিফোন : ৪৬-৩৪৩১—৪

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

সর্বভারতীয় যুবসম্মেলন

২৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮৫

স্থান : বেলুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

যুবসম্মেলনে যুবক-যুবতী প্রতিনিধিদের যোগদানের বয়ঃসীমা ১৬ থেকে ৩০ বছর। প্রায় ১৫ ০০০ মতো প্রতিনিধি নেওয়া হবে।

উদ্বোধনী ও বিদায়ী সভা, মুক্ত অধিবেশন, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা, তীর্থযাত্রা, মঠ থেকে শোভাযাত্রা সহকারে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত প্রভৃতি সম্মেলন-সূচীর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সন্ধ্যায় আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে। যুবপ্রতিনিধিরা আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, আবৃত্তি, বক্তৃতা, সঙ্গীত প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

আলোচনার বিষয়বস্তু ঃ

১। জনসাধারণের উন্নতিসাধনে স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা।

২। জাতীয়-সংহতি দৃঢ়ীকরণে যুব-নেতৃত্বের ভূমিকা।

৩। পল্লী-পুনর্গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা।

৪। ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে মূল্যবোধের উপযোগিতা।

৫। বর্তমান যুবসমাজের সমস্যা ও তার সমাধানের পথ।

৬। নিরক্ষরতা, বর্ণবৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে যুবসমাজের কর্তব্য।

আলোচনার মাধ্যম ঃ ইংরেজী, হিন্দী ও বাঙলা

যুবপ্রতিনিধি নির্বাচন ঃ

সম্মেলন কর্তৃপক্ষ আলোচনা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে সক্ষম একটি যুবপ্রতিনিধিদের তালিকা গঠন করবেন—বেলুড় মঠের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র হতে পাঠানো নামের তালিকার উপর ভিত্তি করে। সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু যে-কোন যুবপ্রতিনিধি নির্ধারিত ফর্মে তাঁর অংশগ্রহণের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করে শাখাকেন্দ্রে তা জমা দিতে পারেন।

নির্ধারিত সংখ্যক প্রতিনিধি যাঁরা আলোচনাদিতে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত হবেন, সম্মেলনের তিনদিন পূর্বে তাঁদের আলোচনা-শিবিরে যোগদান করতে হবে। এজন্য প্রতিনিধি হওয়ার খরচ ব্যতীত অতিরিক্ত কোন খরচ তাঁদের দিতে হবে না।

প্রতিনিধি হওয়া এবং অন্যান্য বিষয় বিশদ জানার জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কোন নিকটবর্তী শাখাকেন্দ্রে অথবা নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে :

Secretary
Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission Convention
Golpark, Calcutta—700029

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ
সাধারণ সচিব
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি

স্বামীজী চেয়েছিলেন : উদ্বোধনের মাধ্যমে **'ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই, অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে।—ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার জোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিক করা যেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনামূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।'**

'উদ্বোধন' ৮৬ বর্ষ অতিক্রম করে ৮৭ বর্ষ চলছে, তবু আজও স্বামীজীর ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। বিবেকানন্দ-অনুরাগী গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে, স্বামীজীর এই মহতী ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাঁরা যেন নিজেদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচারে সহায়তা-প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও বলেছিলেন : **'...তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি, ...সাহায্য করিস্; ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।'**

উদ্বোধন পত্রিকার বার্ষিক মূল্য সডাক	২২'০০ টাকা
ভারতের বাইরে সি-মেল-এ	৮৫'০০ টাকা
বাংলাদেশ	৪০'০০ টাকা
এয়ার-মেল-এ	২৩০'০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা	২'০০ টাকা

আজীবন গ্রাহক (৩০ বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ) ৩০০'০০টাকা

মাঘ হতে বৎসর আরম্ভ। যে-কোন মাস হতে গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্রীশ্রীদুর্গা

বেলুড় মঠে পূজিত প্রতিমা

উদ্বোধন

৮৭তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৯২

'এবার যদি এলি উমা'

[একটি অপ্রকাশিত আগমনী সঙ্গীত]

এতদিন পরে পুর আলো করে কে এলি রে ঈশানী।
আমার যে তোর তরে, দিবানিশি আঁখি ঝরে,
ভুলে ছিলি কেমন করে, মনে পড়েনি বলে জননী॥
তোরে না হেরে তারা, হারা হয়েছি নয়নতারা,
তারা বেয়ে পড়ে ধারা, ও মা ভবদারা দিবস-রজনী॥
কপালগুণে হয়ে রাজার ঘরণী, পেয়ে তোমা হেন মণি,
আমি নিরানন্দে দিন গণি, পিতৃগুণে মেয়ে হলি পাষাণী॥

এবার যদি এলি উমা, কিছুদিন থাক্ হেথা মা,
ও মা হর-মনোরমা—ভোলানাথে ভুলিয়ে, ঘরে রাখ ভবানী॥

—স্বামী বিরজানন্দ

কথাপ্রসঙ্গে

'নমস্তস্যৈ নমো নমঃ'

ভয়ার্ত সন্তানদের প্রতি জননীর সেই প্রতিশ্রুতিকে আজ একান্তভাবে স্মরণ করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন—স্বীয় সন্তানের অসুরভাব বিনষ্ট করিয়া তাহাকে দেবভাবে পূর্ণ করিতে তিনি বারবার অবতীর্ণ হইবেন।

'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যামি অরি-সংক্ষয়ম্॥'

জননীর পুত্র-কন্যাগণ সকলেই কিন্তু সমান নহে, সম-প্রকৃতি লইয়া জন্মায় না। মাতৃস্তন্যের পুষ্টি ও ঋদ্ধিকেও তাই তাহারা সমভাবে সমান আনন্দে ভোগ করিতে পারে না। স্বার্থপর ভোগপরায়ণ অসুর-প্রকৃতি সন্তান নিয়তই উদ্ধত চেষ্টা করিতেছে, শান্তিপ্রিয় সরলচরিত্র ভ্রাতা-ভগিনীকে দূরে হঠাইয়া মাতৃ-সম্পদে কেবলমাত্র নিজের ভোগাধিকারকে সবলে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে। জননীর স্নেহ-সাম্রাজ্যে অসুর-ভ্রাতাগণই নিজেদের আধিপত্য-বিস্তারে সদা প্রয়াসী! এইরূপই তো ঘটিয়া আসিতেছে চিরকাল। বুঝি-বা ইহাও প্রকৃতির নিয়ম,—মাতৃশক্তির আবির্ভাবের পটভূমিও এইভাবেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরমাপ্রকৃতি জননী সন্তান-কলহে বিচলিতা না হইয়া পারেন না, যেমন দৃশ্যমান বহিঃপ্রকৃতিতে কোথাও অসামঞ্জস্য দেখা দিলে স্বতই প্রতিবিধানও নামিয়া আসে। বায়ুমণ্ডলের তাপ-বৈষম্যই তো সমতা-বিধায়ক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাসহ, সুশীতল বর্ষণের হেতু হইয়া থাকে। বিবদমান উন্মত্ত সন্তানগণের অসুর-বীর্যকে নির্জিত করিয়া সংসারে সুখ-শান্তি বিধান করিতে বিশ্বজননীর প্রকাশও পুনঃ পুনঃ হইয়া আসিতেছে—হইবেও চিরকাল।

অহঙ্কার-মত্ত এবং মমতান্ধ পুত্রকন্যাগণ সংসারের যাবতীয় শুভকে সবলে নির্বাসন দিতে বদ্ধপরিকর হয়,—উঠিয়া পড়িয়া লাগে, যাহাতে এই সমাজ হইয়া দাঁড়ায় একমাত্র তাহাদেরই যথেচ্ছ ভোগক্ষেত্র। শান্তিপ্রিয় শিষ্টজন নির্যাতিত হইতে থাকে—সর্বপ্রকার সৎ ও কল্যাণ উহাদের উৎপীড়নে সাময়িক স্তব্ধ হইয়া পড়ে। সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতেই এই ধারা চলিয়া আসিতেছে। আবার ইহাও ততোধিক সত্য যে, ঐরূপ দুর্যোগের চরমাবস্থাই সন্তান-দুঃখহারিণী জননীর কৃপা-দৃষ্টিকে বারবার আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। জগৎপালিনী মাতৃশক্তির ইহাও এক বিস্ময়কর লীলা। বুঝি তিনি ইচ্ছা করেন, তাঁহার সন্তানগণ তেজস্বী, বীর এবং সংগ্রামক্ষম হউক সকলে,—বসুন্ধরা হউক বীরভোগ্যা।

কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপুকে বশীভূত করার পরেও কিন্তু দুর্মদ আরও দুই শত্রুর নিরন্তর পীড়ন মানুষকে বিপর্যস্ত রাখে অনুক্ষণ। একটু বিচার করিলে দেখা যাইবে, অন্যান্যদের অপেক্ষা শেষোক্ত এই দুই শত্রুর তাড়নাতেই জীব সর্বাধিক অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে—ব্যষ্টি ও

সমষ্টি-জীবনে উভয়তঃ। দুর্ধর্ষ এই অরিদ্বয়ের নাম অহঙ্কার ও মমত্ব—'আমি' এবং 'আমার'। সংগ্রামে ইহাদিগকে পরাভূত করিতে হইলে আত্মশক্তির উদ্বোধন-মূলক সাধনায় তৎপর হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই। ঐ সাধনবলে উদ্বোধিত আত্মশক্তিরই আর এক নাম মাতৃবল। মাতৃবলে বলীয়ান সন্তান অনায়াসেই 'অহং' ও 'মমত্ব'-রূপ দুর্জয় অসুরকে বিনাশ করিয়া দেবত্বের স্বাধিকারকে ফিরিয়া পাইতে পারেন—যুগে যুগে ইহাই তো ইতিহাসে প্রত্যক্ষ হইতেছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের মধ্যম ও উত্তরচরিত্রে মেধা ঋষি একটি অপূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন—যাহা সকল যুগের মানুষের পক্ষে অমর জীবন-দর্শনও বটে। ঋষি-বর্ণিত সেই কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ-রেখা হইতেছে :

দেবতা ও অসুরের দীর্ঘ কলহ। অসুরগণ দেব-ভ্রাতাগণকে সহ্য করিতে পারে না। পরিণামে যুদ্ধ এবং যুদ্ধে অসুরদেরই বিজয়। পরাভূত দেবতারা অসুরাধিপতি মহিষাসুরের নিষ্ঠুর অত্যাচারে জর্জর হইয়া অসহায়ভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকিলেন। স্বর্গ হইতে নিরাকৃত দেবগণ শ্রীভগবানের শরণ লইলেন। ভগবদ্-অনুগ্রহে দেবতাদের প্রসুপ্ত আত্মশক্তি জাগ্রত হইল,—সকলের অন্তর-উৎসারিত তেজঃপুঞ্জে গঠিত হইয়াছিল এক অনিন্দ্য-সুন্দর মাতৃমূর্তি। 'সমস্ত দেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্' জননী দুর্গার সেই আবির্ভাবে মহিষাসুর-প্রপীড়িত দেবতাদের আনন্দের অবধি ছিল না। অতঃপর শুরু হইল প্রচণ্ড সংগ্রাম। দেব-ঋষি-বন্দিতা সিংহবাহনা দেবী অবলীলাক্রমে অসুরগণের দেহে অস্ত্রনিক্ষেপ দ্বারা উহাদিগকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিলেন। অসুর শক্তির পরাভবে এবং দেবশক্তির পুনর্জাগরণে যুদ্ধ কিন্তু তখন আর যুদ্ধ থাকে নাই—রূপ নিয়াছিল এক আনন্দমুখর মহোৎসবের।

'অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে।
মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধ-মহোৎসবে॥'

সেই বিপুল সংগ্রাম, ক্রমে বিপুলতর বেগে ভিন্নগতি প্রাপ্ত হইল। স্বয়ং অসুরাধিপতি নিজগণ সহ নিঃশেষে ভূপাতিত হইল। দেবী দুর্গার খড়্গাঘাতে মহিষাসুর ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছিল। জীবিত অসুরসৈন্যরা হাহাকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল এবং দেবতারা সকলে মহোল্লাসে বিজয়োৎসবে মাতিয়া উঠিলেন। ঋষি-মুনি-দেবতাদের দ্বারা স্তুত হইয়া দেবীও অপ্রকট হইলেন,—সন্তানবৎসলা জননী আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন বিপদ্‌কালে স্মরণ-মাত্রেই তিনি পুনরাবির্ভূতা হইবেন এবং মহাবিপদ্ তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইবে। 'ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ।'

দেবগণ হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিরঙ্কুশ শান্তি তাঁহাদের ভাগ্যে ছিল না। বহিঃশত্রু বিনষ্ট হইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু গোপন শত্রুতা তাঁহাদের জন্য আরও অপেক্ষা করিতেছিল। উক্ত দেবীমাহাত্ম্যের উত্তরচরিত্রে মুখ্যতঃ সেই কাহিনীই বিশদ বিন্যস্ত। শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুর ভ্রাতৃদ্বয় দেবতাদিগকে নানাভাবে বঞ্চনা করিতে শুরু করে। উভয় ভ্রাতার দৌরাত্ম্যে দেবগণ পুনরায় স্বর্গাধিকার হারাইলেন। প্রবঞ্চিত দেবগণ জননীর পূর্ব-আশ্বাস স্মরণ করিয়া একান্তচিত্তে মাতৃ-আরাধনা করিবার জন্য নগাধীশ হিমালয়ের ক্রোড়ে প্রস্থান করিলেন এবং নিভৃতে মহামায়ার আরাধনায় রত হইলেন। আশ্চর্য মধুর ছন্দে মাতৃ-স্তুতি রচনা করিয়া তাঁহারা আকুল কণ্ঠে উহা গাহিতে থাকিলেন,—কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ কোন কিছুর জন্য কামনা ছিল না তাঁহাদের ঐ স্তবমালায়। শুধুই মাতৃমহিমা ও মাতৃস্বরূপকে

বাঙ্‌ময়ী করা হইয়াছিল সুললিত সেই স্তোত্রে,—আর সুস্পষ্ট ভাষায় পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতেছিল 'নমো নমঃ'। দেবগণের হৃদয়-উৎসারিত ঐ 'নমো নমঃ' উচ্চারণ যেন তাঁহাদের সকল 'আমি আমার' বোধকে বিনত করিয়া মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। জলধারা ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে প্রবাহিত হইয়া থাকে—করুণাধারাও সেইরূপ বিনতচিত্তে—যেখানে 'অহং'-এর উন্নত টিপি ধুইয়া মুছিয়া দ্রব হইয়া মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে, সেখানেই প্রবর্ষিত হয়। 'নমঃ' শব্দের নিহিত তাৎপর্যার্থ হইতেছে—'ন মম'। 'আমার নহে', 'আমি নহি' এইরূপ দ্যোতনাই ছিল দেবতাদের কণ্ঠোদ্গীত সেই স্তবের প্রতি গমকে।

অতিসৌম্যা বিদ্যারূপিণী তিনি,—আবার ঘোর অবিদ্যারূপেও সেই তিনিই অতি ভীষণা। জগতের আশ্রয়রূপিণী সর্ববিরামদায়িনী তিনি,—সকল কৃতিরূপা ক্রিয়ারূপেও তিনিই। সেই সর্বময়ী জগজ্জননীকেই দেবতারা প্রণাম জানাইতেছিলেন বারবার—উদার সুস্পষ্ট 'নমো নমঃ' ব্যঞ্জনাসহ। সোচ্চারে গাহিতেছিলেন :

'অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥'

নিরহঙ্কৃত দেবতাদের সেই আকুল প্রার্থনায় জননী দুর্গা পুনঃ প্রকট না হইয়া পারেন নাই,—দেব-সন্তানগণের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি। ঋষি মেধা সেই কাহিনীই সবিস্তার বর্ণনা করিয়া শুনাইয়াছেন উল্লিখিত দেবীমাহাত্ম্যের অবশিষ্টাংশে। অপরাজিতা জগদম্বিকা বিচিত্র ভাবে ও ভঙ্গিতে নিজেকে ব্যক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে অসুর-অনুচরগণকে নিধন করেন,—অবশেষে নিশুম্ভকে ও শুম্ভকেও চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করিয়া দেবশক্তিকে জয়ী করিয়াছিলেন। সৃষ্টিতে শান্তি ও কল্যাণ এইভাবেই ফিরিয়া আসিয়াছিল। পুনরায় পুণ্য বায়ু বহিতে লাগিল, সূর্য উজ্জ্বলতর কিরণ ঢালিতে থাকিল—পূত যজ্ঞাগ্নিশিখা সর্বদিকে উৎপন্ন অমঙ্গলসূচক সকল কোলাহলকে প্রশমিত করিয়া শান্ত ও সৌম্যভাবে আবার জ্বলিয়া উঠিল।

'ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সু-প্রভঃ অভূদ্‌দিবাকরঃ।
জজ্বলুঃ অগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ॥'

পুরাণকার যে অসামান্য কুশলতার সহিত দেবীমহিমা খ্যাপনের প্রসঙ্গে দেবত্বের প্রতিষ্ঠাকৌশলটিও শিখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই সর্বকালের সকল সমাজের জন্য অন্ধকারে আলোক বর্তিকা স্বরূপ। মহিষাসুর সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বধ হইলেও দেবতাগণের দুঃখ-দুর্ভোগ পূর্ণ নিরাকৃত হইতে কিন্তু আরও বিশেষ কিছু অপেক্ষা ছিল,—জগদম্বার প্রভূত অনুগ্রহভাজন হইয়াও নিরুদ্বেগ শান্তি-সম্পদ্ লাভ করিবার জন্য কঠিনতর সাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল তাঁহাদের। আবশ্যক হইয়াছিল, অহঙ্কার ও মমত্বকে নিঃশেষে মাতৃচরণে সমর্পণ করিবার।

সমষ্টিজীবনে যাহা সত্য, ব্যষ্টির ক্ষেত্রেও তাহাই। মহিষাসুর-বধের নিশ্চিন্ততা দেবতাগণকে আত্মপ্রসাদ আনিয়া দিয়াছিল, কিন্তু সাধকোচিত চৈতন্য আনে নাই। বাহিরের বাধা দূর হইলেও অন্তরের গভীরে লুকানো সংস্কার অস্মিতা ও আসক্তি গোপনশত্রুতা করিয়াই চলিতেছিল। উহারা এইরূপই করিয়া থাকে সকলের ব্যক্তিজীবনেও। শুম্ভ ও নিশুম্ভ প্রত্যেকের জীবনেই সুযোগ-সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া ওত পাতিয়া রহিয়াছে। মায়ের কৃপাতে আমাদের সংসার-সুখ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাদি বাধামুক্ত হইয়াছে, স্বর্গীয় বৈভব আমাদের করমুষ্টিতে, সার্বিক ক্ষমতা আমাদের অধিকারে—এইরূপ অহঙ্কৃত আত্মশ্লাঘা

যখনই পাইয়া বসে, তখনই চমক ভাঙিয়া যায়! শুম্ভ ও নিশুম্ভ ততক্ষণে উহাদের যথেচ্ছ তাণ্ডবে জীবনকে বিপর্যস্ত ও লণ্ড-ভণ্ড করিয়া তুলে! কেবল পুরাণে নহে, প্রতি সমাজে ও ব্যক্তিতে ইহাই চিরন্তন প্রত্যক্ষ ঘটনা। পুরাণ তাই চিরপুরাতনই বটে,—মানবের জীবনপুরাণ।

গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব তিনের দয়ার পরেও আমাদের ঈপ্সিত শান্তি বহুদূরে থাকিয়া যায়। 'অনিচ্ছন্নপি বলাদিব নিয়োজিতঃ'—অনিচ্ছা সত্ত্বেও কে যেন ঘাড ধরিয়া আমাদিগকে সংসারের কদর্যপথে চালনা করে, দুঃখের স্বপ্নে বিনিদ্র রাখে।

দেবীমাহাত্ম্যের এই উত্তরচরিত্র অতিশয় গহন এবং গভীর ব্যঞ্জনাময়। শুম্ভ—অস্মিতার প্রতীক। বিচিত্র সংসার—ধন-জন গৃহ, বিত্ত-প্রতিষ্ঠা-খ্যাতি, শরীর-রূপ-স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিচিত্র শোভাময় এই বিশ্ব জুড়িয়া কেবলই 'আমি'। 'আমি' 'আমি'—ইহাই অস্মিতা। যে শুন্ভ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এই শুম্ভ শব্দ, উহারও তাৎপর্যার্থ শোভাময়ই বটে! নিশুম্ভ হইতেছে মমত্ববুদ্ধি—আসক্তি—'আমার' 'আমার' ভাব। যেখানে 'আমি'—সেখানেই 'আমার'। 'আমি' ও 'আমার'—শুম্ভ ও নিশুম্ভ পরস্পর সহোদর। 'আমি' ও 'আমার'-রূপ শুম্ভ-নিশুম্ভকে পরাভূত করিতে না পারিলে ব্যক্তিজীবনে কিংবা সমাজ-জীবনে স্থায়ী শান্তি দূরপরাহত। ইহারই জন্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন স্ব-স্ব হৃদয়ের নিভৃতে প্রসন্ন মাতৃ-আবির্ভাবের।

শরতের নীল আকাশে নিরবচ্ছিন্ন আলোক-বিস্তার থাকে না। মাঝে মাঝেই মেঘের আনাগোনা চলিতে থাকে,—মেঘ ও রৌদ্রের এই দ্বন্দ্ব, প্রশান্ত গগনকে ক্ষণে ক্ষণে অনুজ্জ্বল করিয়া তুলে! কিন্তু আকাশের এই ম্লানরূপকে—নিরাশার ছায়াটিকেই মাত্র না দেখিয়া, প্রেরণা-দায়ক উহার অপর দিকটিকেও আমরা দেখি না কেন? ভাসমান পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালা পুরাণোক্ত সেই দেবতা-কণ্ঠের প্রার্থনা-ধ্বনিকেও বহন করিয়া ফিরিতেছে। উহারই অনুরণন আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠুক:

'দেবী প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং,
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥'

…দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যে দিন বসিয়ে দেবে, সেই দিন আমি একবার হাঁফ ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে যাচ্ছি না। যত শীঘ্র পারবে—।…

মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই।…আমেরিকা ইওরোপে কি দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজানতে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কী কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পার কি?

স্বামী বিবেকানন্দ

আগমনী

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

'আনন্দমেলা'র সম্পাদক। সাহিত্য আকাদেমী, আনন্দ পুরস্কার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পুরস্কার ছাড়াও তারাশঙ্কর স্মৃতি, উল্টোরথ ও শিরোমণি
সাহিত্য-সম্মানে বিভূষিত যশস্বী কবি ও প্রাবন্ধিক।

বেহুলার ভেলা যেভাবে
দুঃখের নদীতে ভাসতে-ভাসতে একসময়
স্বর্গলোকে গিয়ে ঢুকেছিল,
ঠিক সেইভাবেই
অনন্ত নৈরাশ্যের মধ্যে ভাসতে-ভাসতে এখন
অলৌকিক এক আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে
ঢুকে পড়েছে আমাদের এই
দুঃখী নগর, কলকাতা।

তার মাথার উপরে
কালো কুঞ্চিত মেঘগুলো এখন
রং পালটে
একটু একটু করে সাদা হয়ে যাচ্ছে। আর সেই
মেঘের কানা উপচে
কলকাতার বাড়িঘর আর রাস্তাঘাটের উপরে
গড়িয়ে পড়ছে
ঈশ্বরের হাসির মতন আলো।

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[প্রাপক : শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র]

[১]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

কাশ্মীর
কানন বল (বৃহস্পতিবার)
17. 4. 90

পূজনীয়েষু—

শ্রীনগর হইতে এ পথে আজ চারি দিন হইয়াছে। কিয়দ্দূরে কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান আছে, নাম—মার্ত্তণ্ড, বৈরিনাগ, অনন্তনাগ ইত্যাদি। সে সকল স্থান দর্শনের জন্য যাইতেছি। সমুদয় দর্শন করিয়া ১০/১৫ দিনে পুনঃ শ্রীনগরে পৌছিব। আপনার প্রেরিত পত্র পাইতে বিলম্ব হইবে।

কি সুন্দর স্থান হইয়া যাইতেছি—তাহা বলিতে পারি না। প্রকৃতির কি গাম্ভীর্য্য! কি পবিত্র ভাব! চতুষ্পার্শ্বে হিমালয়ের শুভ্র শিখরে বেষ্টিত এক অতীব চমৎকার ফল ফুলে সরোবরে শোভিত উপত্যকা ভূমি। পর্ব্বত প্রদেশের পবিত্রতার কথা কি লিখিব? যদিও পবিত্র হৃদয়ের জন্য সকল স্থানই পবিত্র, তথাপি এ সকল স্থান দর্শন করিলে যে পবিত্র ভাবের আরও বৃদ্ধি করে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে, যে কেবল দেশ কালের সৌন্দর্য্যের জন্য ভ্রমণ করে যথার্থই তাহার বিশ্রাম সপ্ত ভুবনেও নাই। এ সকল কথা শীঘ্রই আপনার নিকট স্বমুখে শুনাইবার ইচ্ছা রহিল। বোধ হয় বর্ষার আরম্ভে ও ·· দিকে যাত্রা করিব। একথা কাহাকেও জানাইবেন না।

গত পত্রে আপনাকে যাহা লিখিয়াছি তাহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে, কিন্তু কি করিব? বালকের পত্র এইরূপই হইবে। ক্ষমা করিবেন। পত্র লিখিতে জানি না। আমার বোধ হয় নির্ব্বিঘ্ন দেশভ্রমণই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। প্রকৃতি বিশেষে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিতে পারে। তিব্বত ভ্রমণে চিত্তের অবস্থা জানিতে পারা যায় ও পরীক্ষা হয়। তিব্বতে আমার মনে আছে গত বৎসরই একদিন একাকী চলিতে চলিতে জলাভাবে তৃষ্ণায় প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। সে অবস্থাতেও এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। এ অবস্থা ৩ বৎসরে তিন দিন ঘটিয়াছিল। তদ্দেশের সে গভীর পবিত্র ভাবে ডুবিয়া কিছুই মনে থাকিত না। অথবা ভ্রমণে নিরস্ত করিতে পারে না।

সংস্কৃতে তিব্বতকে "উত্তর কুরু" কহে লিখিয়াছেন। আমি দয়ানন্দের কোন গ্রন্থে 'ত্রিবীষ্টপ' কহিতে দেখিয়াছি, আর্য্যদের আদি নিবাস ছিল। সেদেশের লোক আর্য্যদের "ফাক্‌পা" কহে, আর আমাদের বড় ভক্তি করে। আমাদের সকল প্রকার দেবদেবীর পূজা করে। শাস্ত্রে বড় বিশ্বাস। সদা পাঠ করে। মঠস্থ ব্যক্তিদের আর কোন কর্ম্ম নাই। যে সকল নিয়ম আছে তাহার একটি লঙ্ঘন করিলে আর রক্ষা নাই। বিশেষ দোষ করিলে একেবারে মঠের বাহির করিয়া দেয়।

তিব্বতের রাজা লাহমা (লামা)। লাহমা (লামা) - যাহারা অধিক উন্নত। কয়েক শ্রেণীর আছে। প্রবর্ত্তকদের 'ডাবা' কহে। তিব্বতের সমস্ত আয় মঠাদিতে ব্যয় হয়। এখনও

জাতিস্মর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যথার্থই অতিশয় পুণ্যভূমি। কোন প্রকার উপদ্রব শূন্য। সে যাহা হউক এক্ষণে কোন নির্ব্বিঘ্ন স্থানে বসা। না বসিলে আর উপায় নাই। নরেন্দ্রনাথের আজ্ঞা শিরোধার্য্য, তাহাই কর্ত্তব্য। এ সকল কথা তাঁহাকে কিছু লিখিবেন না। এক্ষণে তিনি কিছুদিন গাজীপুরে থাকিবেন। আমিও শীঘ্র পৌঁছিব। পাওহারী বাবার কথা অনেক লিখিয়াছেন। তিনি এক অদ্ভুত যোগী, আপনার কি সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইতি—

সতত আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
গঙ্গাধর

আপনি ৺কাশীধামে বাস করেন ও নানাপ্রকার সাধুমহাজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রাদি অনেক দেখিয়াছেন। অতএব কৃপা করিয়া এ দাসকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবেন। অবশ্য অবশ্য; দেখুন কদাচ ভুলিবেন না। সদা আশীর্ব্বাদ করিবেন। ৺বিশ্বনাথের ধ্যানকালে যেন এ দাসকে না ভুলেন। আমার এ প্রার্থনা পূরণ করিবেন। আর অধিক কি লিখিব? আপনার অনুগ্রহ আমি ভুলি নাই।

এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোগোন অধিকাংশই শাক্ত ও বৈষ্ণব। এখানে যে সকল দেবীর স্থান আছে তথায় একত্র হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া এমন মধুর কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করে, আহ! সে ভাব বড় সুন্দর। কাশ্মীরের কথা আর বিশেষ কি লিখিব, আপনি জানেন। আজকাল এখানে শীতের লাঘব হইয়াছে। স্বাস্থ্য অতি উত্তম, সকল প্রকারে অনুকূল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাবাজীর কোমরের বেদনা কেমন লিখিবেন। আজ ২/৪ দিন হইল আমি তাঁহার ২ খানি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার শরীরের কথা আমাকে কিছু বিশেষ কিছু লিখেন নাই। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আর সকলকে প্রণাম জানাইবেন।

শ্রীনরেন্দ্র বাবাজী যদি কিছুদিনের জন্য এ সকল স্থানে আসিয়া থাকেন ত তাঁহার শরীরের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর হইবে। যাতায়াতেও বড় সুগম। আমি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছু বলেন নাই।

আমার দুর্ভাগ্য আপনাকে এমন পত্র লিখিতে পারিলাম না যাহাতে সকল কথা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। তজ্জন্য ক্ষমা করিতে হইবে। যতদিন না পৌঁছাতে পারি, ততদিন যেরূপ মনে হইবে লিখিব।

যেরূপ একখানি 'ভগবদ্গীতা' গুটকা কেবল মূল আমি আনিয়াছিলাম ঠিক সেরূপ একখানি মুম্বাই (বোম্বাই) ছোট গীতা এ ঠিকানায় পাঠাইবেন। গঙ্গা বিষ্ণুর ছোট গুটকা মূল গীতা। নিবেদনমিতি—

C/o Pandit Wash Kak, Dy Commr. Srinagar Khas mahal

আপনার—**গঙ্গাধর**

To Babu Pramada Das Mitra
Benares City

[২]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গাজীপুর
May, 1890

পূজনীয় মহাশয়ের চরণে সহস্র সহস্র প্রণাম—

দাসের এখানে পৌঁছিয়া ২ দিন হইয়াছে, সে দিন দিলদারনগর ষ্টেশনে সমস্ত রাত্রি থাকিতে হইয়াছিল। তথা হইতে রাত্রি ৫ ঘটিকার ট্রেণে তারীঘাটে আসিয়াছিলাম। দিলদারনগর ষ্টেশনে প্রাতঃকালে যেমন উঠিয়া বসিয়াছি, দেখি দাসের সম্মুখে আপনি শয়ান !! নিশ্চিত হইয়াছিলাম যে আপনি আসিয়াছেন। কি ভ্রম! আপনি কি জানেন? ইহার কারণ কি? দাসের বোধ হয় কেবল অতিশয় স্নেহ ও সংসর্গেই এরূপ ভ্রম হয়।

গতকল্য পাওহারী বাবাজীর আশ্রমে ছিলাম। তাঁহার বাণী শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছি। তিনি সাক্ষাৎ বিনয়ের মূর্তি। এমন বিনীত ভাব আর কোথাও দেখি নাই। বাবাজী এ দাসের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। তাঁহার 'দাস ও সরকার' ভিন্ন অন্য কোন সম্ভাষণ নাই। আমাদের নরেন্দ্র স্বামীর বহু প্রশংসা করিলেন। বাবাজীর সকল কথা ত আপনি বিদিত আছেন। আমি আর কি লিখিব।

পাওহারী বাবার কথা শ্রবণে দাস কৃতার্থ হইল। কথা শুনিলেই তাঁহার দর্শন হয়। তাঁহার দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

বহুকাল পরে গতকল্য দাসের শরীর ব্যাপিয়া বেদনা ও জ্বর হইয়াছিল। একদিনের জ্বরেই পেটে সেই পুরাতন প্লীহা দেখা দিয়াছে। এক্ষণে কিঞ্চিৎ সুস্থ আছি। এজন্য ২/৩ দিন এখানে থাকিতে হইল। আজকাল এখানে খুব আঁধি ও ঝড় হইতেছে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলে যাইতে পারিব না।

আপনার ওখানে ত গরম কাহাকে বলে জানিতেই পারি নাই। আপনার সৎসঙ্গের কথা মনে হইলে দাসের মনে এক বিমল ভাবের উদয় হয়। এ দাসকে কদাচ ভুলিবেন না, আর সদা আশীর্ব্বাদ করিবেন।

শরীর অসুস্থ হইবার কারণ বোধ হয় কেবল পূবে হাওয়া ও অত্যন্ত গ্রীষ্ম। তদ্ভিন্ন আর অন্য কোন কারণ দেখিতেছি না। কিছু চিন্তিত হইবেন না। বোধ হয় আর বেশী বাড়িবার সম্ভাবনা নাই।

বাবাজীর আশ্রমটি বড় শান্তিময়। কল্য রাত্রি তথায় ছিলাম। আশ্রমের নিকট একটি গ্রাম আছে। তাঁহার আশ্রমে রাত্রিতে কেহ থাকিতে পায় না। বাবাজীর কাছে ২/৩ দিন থাকিবার জন্য প্রতিশ্রুত আছি। সুতরাং থাকিতে হইল। শরীরও কিঞ্চিৎ অসুস্থ। এক্ষণে পেটের প্লীহার স্থানে অল্প বেদনা বুঝিতেছি।

এখানের শ্রীযুক্ত গগন বাবু ও শ্রীসতীশ বাবু যথার্থই অতিশয় উদার প্রকৃতির লোক। এক্ষণে গগন বাবুর বাড়ীতে আছি। আপনি বরাহনগর হইতে কোন পত্র পাইয়াছেন কি? অন্য

আমি একখানি পত্র দিলাম। বোধ হয় তাহার উত্তর পর্য্যন্ত এখানে আছি। আপনি যদি পারেন শীঘ্রই একখানি পত্র লিখিবেন। কিমধিকমিতি।—

[সতীশ বাবুর ঠিকানা :···]

আপনার চিরানুগত দাস
গঙ্গাধর।

পুঃ—আপনার কাছে আমি অনেক শিক্ষা পাই এবং সদাই শিক্ষা দিবেন। আর আশীর্ব্বাদ করুন যেন তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে পারি।···আপনি কেমন আছেন? আপনি ধন্য! শত সহস্র ধন্য। আপনি সদা সর্ব্বদা সেই প্রাণনাথকে হৃদয়ে দেখিতেছেন, সে বিমল সুখের ভাগী এই দাসকেও করিবেন। নিবেদনমিতি।—যদি ২/৩ দিনের মধ্যে পত্র আসে ত লিখিবেন, নহিলে নহে। (শরীর সুস্থ হইলেই যাইব) আজিকার বাত্রি ও কালিকার রাত্রি থাকিতেই হইবে। শরীন অসুস্থ না হইলে এই দুই রাত্রি থাকিয়া চলিয়া যাইব। আমাব অসংখ্য প্রণাম জানিবেন।

দাসানুদাস—**গঙ্গাধর**

[৩]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গাজীপুর
C/o সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
গোরাবাজার······Ganj
29. 5. 90

পূজনীয় মহাশয়ের চরণে সহস্র সহস্র প্রণাম···

অদ্য ৩ দিন হইল দাসের অত্যন্ত জ্বর হইতেছে। দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। বেলা ১২ ঘটিকার সময় আসে, অত্যন্ত শীত ও কম্পের সহিত। এ কি Influenza? সর্ব্ব শরীরে বেদনা হয়। এক্ষণে ভোগের কিঞ্চিৎ বিরাম হইয়াছে মাত্র, বিলক্ষণ জ্বর আছে। আপনাকে লিখিয়া কেবল চিন্তিত করা। কিন্তু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিরূপে যে পত্র লিখিতেছি তাহা আর কি বলিব। বড় দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা হোক ভাল হইয়াছে, একবার ত ভোগ ছিল। কল্যকার দিন দেখিয়া চিকিৎসা না করিলে আরোগ্য হওয়া কঠিন হইয়াছে—ইঁহারা বলিতেছেন। আপনি শারীরিক কেমন আছেন? আপনার চিরানুগত এ দাসকে কদাচ ভুলিবেন না। দাসকে শীঘ্রই আপনার শুভ সংবাদ দিয়া সুখী করিবেন। আর কি লিখিব। শরীর কাহিল, কিছুদিন ভোগাইবে। অতএব আরোগ্য না হইলে কোথাও যাওয়া অসম্ভব। আপনার হস্তাক্ষর পাইলে দাস অত্যন্ত আনন্দিত হইবে।

—দাস **গঙ্গাধর**

স্বামী শুদ্ধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[প্রাপক : ব্রহ্মচারী বুদ্ধচৈতন্য, যিনি পরে স্বামী ভাস্বরানন্দ।]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

উদ্বোধন কার্য্যালয়
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার
কলিকাতা।

প্রিয় বুদ্ধচৈতন্য, 10. 8. 25

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমাদের ওখানকার সমুদয় ব্যাপার বহুদিন হইতে সমুদয় জানিয়া আসিতেছি এবং আমরাও সময়ে সময়ে বিচলিত হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় পরিণামে ভালই হইবে এই বিশ্বাসে অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। আমাদের কোন কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বা কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার সময় রীতিমত আত্মপরীক্ষা করা উচিৎ। ভাবা উচিৎ, যে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমা প্রচারের জন্য কার্য্য করিতেছি অথবা নিজেদের কোন প্রকার সূক্ষ্ম স্বার্থের প্রেরণা আমাদিগকে এইরূপ কার্য্য করাইতেছে! এইরূপ বিচারপরায়ণ হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে সদাসর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিলে তিনি কখনও বেতালে পা পড়িতে দেন না [।]

বাস্তবিকই কার্য্যের মধ্য দিয়াই আমাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। মেঘ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। ওখানকার লোকের প্রকৃতি যেরূপই হউক আমাদিগকে যথাসম্ভব তাহাদের ভাল দিক দেখিতে হইবে এবং নিজেদের সাধন ভজন ও চরিত্রবল দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে যে আমরা যথার্থই ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আদর্শের অনুসরণ করিতেছি। সর্ব্বদাই যেন আমাদের আদর্শের দিকে দৃষ্টি থাকে। আমাদের মূল মন্ত্র স্বামিজী কথিত "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এটি যেন কখনও ভুল না হয়। তথা হইতেই আমাদের সকল কল্যাণ হইবে। এবং যাহারা না বুঝিয়া এক্ষণে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে তাহারাও বুঝিতে পারিলে ক্রমশঃ মিত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

মঠে মহাপুরুষ মহারাজ এবং পুরীতে শরৎ মহারাজ প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন। আমার শরীর কিছু খারাপ হওয়ায় আমি কিছুদিন হইতে উদ্বোধনে রহিয়াছি। তুমি আমার ভালবাসাদি জানিবে। এবং বিদেহানন্দ ও সোমেশ্বরানন্দকেও জানাইবে। নূতন বাটীর কতদূর হইল জানিতে বাসনা [।] আগামী Easter-এ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ-মিশন-মহাসম্মেলন হইবে। তাহাতে আমাদের সকল কেন্দ্র হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত হইবে। বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্র ছাপান পত্রে জানিতে পারিবে। ইহাতে প্রায় দেড় হাজার টাকা খরচ হইবে। তোমাদের ওখান হইতে ঐ উদ্দেশ্যে যদি কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পার তাহা হইলে ভাল হয়। সকল কেন্দ্রের প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হইয়া যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে এবং মিশনের আদর্শ বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে এবং সকল কার্য্যগুলি প্রণালীবদ্ধ সুশৃঙ্খলভাবে চলে এবং কার্য্যের আরও প্রসার হইতে পারে তাহার জন্য এই উদ্যম।

এখানে প্রতিমা করিয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আয়োজন হইতেছে। সম্প্রতি পূর্ণিয়া জেলার আরারিয়া মহকুমায় কলেরা Relief হইয়াছিল। তথায় একটি নূতন কেন্দ্র খুলিবার আয়োজন চলিতেছে। তোমরা যদি মধ্যে মধ্যে 'উদ্বোধন' 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রভৃতিতে প্রবন্ধ পাঠাও তবে ভাল হয়। সোমেশ্বরানন্দকে এ বিষয় বলিও। ইতি—

তোমার শুদ্ধানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী

স্বামী গম্ভীরানন্দ

**গত ২২ মে ১৯৮৫ নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন অন্তে সমাগত
ভক্ত নরনারী ও সাধুমণ্ডলীর উদ্দেশে পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধীশ মহারাজের অভিভাষণ—
টেপরেকর্ড থেকে অনুলিখিত।**

শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন হয়েছিল বিশেষ প্রয়োজনে। তাঁকে যুগাবতার আমরা বলে থাকি, কিন্তু তিনি শুধু এই যুগের জন্য আসেননি। তাঁর বাণী এবং জীবনীর অর্থ প্রকাশিত হতে হাজার হাজার বছর কেটে যাবে। তাঁর প্রভাব বিস্তারিত হতে থাকবে ঘর থেকে ঘরে, দেশ থেকে বিদেশে—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে অনেক সময় লাগবে। তাঁর কতটুকু আমরা আজ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি বা বুঝতে পারি—তার কতটুকুই-বা ভাষায় প্রকাশ করে বলতে পারি। সে অসম্ভব ব্যাপারেতে আমার মতো ব্যক্তির পক্ষে প্রবেশ করা অসম্ভব। তথাপি, অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আমাকে দু-চার কথা বলতে হবে, তাই সংক্ষেপে বলছি। সংক্ষেপে বলছি এইজন্য যে, বয়স হয়ে গেছে, স্বাস্থ্যও ভাল নয়—আমরা এখন ক্রমে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৌছে যাচ্ছি। জীবন্ত আর প্রায় নই বললেই চলে। এই অবস্থায় বক্তৃতা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, মানবজীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানলাভ। তার উপায় কি? উপায়ও তিনি বলে গেছেন তাঁর বাণীতে এবং সেই উপায়কে রূপায়িত করেছেন নিজের জীবনে। যাঁরা তাঁর বাণী এবং জীবনীর সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন তিনি কি বলে গেছেন এবং কি করে গেছেন এবং তার তাৎপর্য কত সুদূর বিস্তারিত।

তিনি একটি কথা বলে গেছেন,—কলিতে নারদীয় ভক্তি। ভগবানলাভের উপায় কি? বলেছেন, কলিতে নারদীয় ভক্তি। সর্বস্ব অর্পণ করে, তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে—সত্য, সরলতা ইত্যাদি অবলম্বন করে সারাজীবন তপস্যায় নিরত থাকা—এই হচ্ছে ভগবানলাভের উপায়। তিনি নিজে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন,—মা এই নাও তোমার শুদ্ধি, এই নাও তোমার অশুদ্ধি, এই নাও তোমার কর্ম, এই নাও তোমার অকর্ম, এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। সেই শুদ্ধাভক্তির জন্য তিনি প্রার্থনা করেছেন এবং আমাদেরও বলে গেছেন এই ভক্তি অবলম্বন করেই ভগবানের কাছে পৌঁছাতে পার। নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রেতে বলেছেন যে, ভক্তির যদি সংজ্ঞা দিতে হয়, সেই সংজ্ঞাটা কি, না—তাঁর প্রতি পরমপ্রেমস্বরূপ। 'তাঁর প্রতি' বললেন, কোন বিশেষ দেবতা বা দেবীর নাম করলেন না। সাধারণভাবে সকলভাবেতে বললেন 'তাঁর প্রতি'। ভগবান যে রূপেতেই থাকুন, যে রূপ ধারণ করে আসুন, মানবের মনেতে তিনি যেভাবেই উপস্থিত হোন না কেন, তাঁর প্রতি যে পরমপ্রেমস্বরূপ একটা ভাব—তাই-ই হচ্ছে ভক্তি। প্রেম বলতে আমরা সাধারণতঃ মানবজীবনের সর্বোত্তম, সন্নিকট সম্বন্ধ বলে বুঝে থাকি, যে-সম্বন্ধ অবলম্বন করে মানুষ মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় হয়ে থাকে—তাকে আমরা বলি প্রেম। সেই প্রেমের যা পরম অবস্থা,—সেই অবস্থার সঙ্গেও তুলনা করলেন না, বললেন সেই পরমপ্রেমের মতো। ভগবানের যে-প্রেম তার কাছে জাগতিক যত প্রকারের আমাদের অনুভূতি বা জাগতিক যত

প্রকারের বিশ্বাস প্রত্যয় ইত্যাদি আমাদের রয়েছে—সবকে পেরিয়ে যায় ভগবৎপ্রেম। এমন ভগবৎপ্রেমের কথাকেই ঠাকুর ভক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তারই কথা বলে গেছেন আমাদের সকলকে গ্রহণ করতে। নিজের জীবনে তিনি তাই করেছেন।

ভক্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নারদ ভক্তির বাইরের লক্ষণ বলেছেন এবং ভিতরের দিক থেকেও সংজ্ঞা দিয়েছেন। বাইরের দিক থেকে ভক্তির লক্ষণ যদি দেখতে যাই, তবে কি দেখব? দেখব,—ভগবানেতে সর্বপ্রকার কর্ম অর্পণ করা এবং তাঁর দর্শন পাচ্ছি না বলে পরম ব্যাকুলতা।—তাকেই বলে ভক্তি-লক্ষণ। তাঁর কাছে সমস্ত কিছু অর্পণ করে দেওয়া। ঠাকুর বলছেন, তাঁর নিজের বলতে কিছু নেই। মা যেমন চালান তেমনি তিনি চলেন, মা যেমন বলান তেমনি করে তিনি বলেন—এই ছিল তাঁর ভাব সর্বদা। এটা মুখের কথা নয়। ঠিক একেবারে প্রাণের কথা। তাঁর জীবন এবং বাণীতে তিনি তাই প্রকাশ করে গেছেন,—মায়ের ইঙ্গিতে তিনি পরিচালিত হচ্ছেন। যা কিছু কথা তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়েছে, জীবনটা যে ভাবেতে প্রকাশিত হয়েছে—সবই হয়েছে মায়ের দ্বারা। মা যেমন করেছেন ঠিক তাই ঘটেছে। এই হল তাঁর প্রতি সমস্ত অর্পণ করা।

তারপরে তাঁর পরম ব্যাকুলতা। এই আপনারা যাঁরা ভক্ত, যাঁরা তাঁর জীবনী পড়েছেন—তাঁরা জানেনও। আমাকে নতুন করে কিছু বলতে হবে না। তিনি গঙ্গাতীরে কাতর হয়ে পড়ে 'মা মা' বলে ডাকতেন—বলতেন, মা আরও একটা দিন ফুরিয়ে গেল আজও তোর দর্শন পেলাম না! পাশে লোক দাঁড়িয়ে যেত, তারা বলত লোকটা হয়তো পেটের ব্যথাতে কষ্ট পাচ্ছেন, হয়তো এইজন্যই কান্নাকাটি করছেন—তারা ভিতরের কথা কি করে জানবে! তারা বলত—শূল-ব্যথা। শূল-ব্যথাতে লোকটি ক্রন্দন করছেন! কিন্তু আদতে তিনি যে মায়ের জন্য কাঁদছেন সেটা তো তারা বুঝত না। তারপর এমন দিন এল যখন সে বিরহ আর তাঁর সহ্য হয় না—কালীমন্দিরে প্রবেশ করে দেখেছেন সেখানে একটি খড়্গ ঝুলছে দেয়ালেতে, সেই খড়্গ দিয়ে প্রাণত্যাগ করার জন্য তিনি চেষ্টিত হলেন—এমন সময়েতে তিনি মা-কালীর দর্শন পেলেন। এই ব্যাকুলতা—পরম ব্যাকুলতা,—তাঁকে না হলে চলে না! এই ব্যাকুলতা অবলম্বন করেই তিনি মাকে পেয়েছিলেন।

আর ঠাকুর বলেছিলেন, সত্যই হচ্ছে কলির তপস্যা। সত্যকে অবলম্বন করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কথাটা উঠলেই নানা মনেতে নানা প্রশ্ন জাগে,—সত্য নিয়ে কি আমরা সংসারে বেঁচে থাকতে পারি? কথা তা নয়। কথা হচ্ছে, সত্যটাকে অবলম্বন আমাকে অবশ্যই করতে হবে, মানুষ জন্ম যখন গ্রহণ করেছি এবং ভগবানকে যখন আমি লাভ করতে পারি।—পারছি না সেটা আমার ত্রুটি, সেটা আমার দুর্বলতা। কিন্তু যেমন স্বামীজী বলেছিলেন, 'রামকে পেলাম না বলে কি শ্যামকে নিয়ে ঘর করতে হবে?' তা তেমনি ভাবেতে সত্যকে যেহেতু আমি ধরতে পারলুম না তা বলে কি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে? তা কখনও নয়। সত্যকে আমাকে যেমন করেই হোক প্রাণপণে চেষ্টা করে ধরে রাখতে হবে, সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এটা হল সাধারণ মানুষের পক্ষে। কিন্তু ঠাকুরের পক্ষে সে সত্য কি ছিল? সত্যকে যে তিনি ধরেছিলেন তা নয়, সত্য ধরেছিল তাঁকে। যেমন নিজে বলেছেন,—যে বাবার হাত ধরে চলে তার পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে, কিন্তু বাবা যার হাত ধরেন সে পড়ে না। দৃষ্টান্ত—ঠাকুর গেছেন

নবদ্বীপে। মহাপ্রভুর জায়গা দর্শন করতে। কিন্তু কোন উদ্দীপনা তাঁর মনেতে জাগছে না। বললেন, এখানে এলাম কিসের জন্য? এখানে তো কোন উদ্দীপনা জাগছে না। তারপরে নৌকো করে যখন ফিরছেন,—গঙ্গাবক্ষে,—তখন হঠাৎ বলছেন, এইরে এলোরে এলোরে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ দুজন যেন তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। অতঃপর ইতিহাসের পাতা উল্টে আমরা জানতে পারি যে, মহাপ্রভুর জন্মস্থান যেটি ছিল সে জন্মস্থানটি ধুয়ে গঙ্গাগর্ভে চলে গেছে। সুতরাং নবদ্বীপে মহাপ্রভুর উদ্দীপনা যদিও তিনি পাননি, পেলেন তিনি গঙ্গাগর্ভে। সত্য তাঁকে জানিয়ে দিল যে আমি এই। তাঁকে কষ্ট করে সত্যটাকে জানতে হয়নি। সত্য তাঁকে ধরেছিল হাত, সত্যই তাঁকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি গেলেন মল্লিকদের বাড়িতে। শম্ভু মল্লিক মশাই তাঁকে বললেন যে, তুমি পেটের ব্যথায় ভুগছ, যাবার সময় এই ওষুধটুকু আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও। এখন, কার্যোপলক্ষে শম্ভুবাবু বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছেন, আর ফিরছেন না, দেরি হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরকে কালীমন্দিরে ফিরে আসতে হবে। সুতরাং তিনি ভাবলেন—ওই তো ওষুধের মোড়কটা রয়েছে, শম্ভু তো এইটে দিতে চেয়েছিল। সেইটে তুলে নিলেই তো হল। সেইটে তুলে নিলেন তিনি হাতে। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে তিনি আর রাস্তা দেখতে পান না। সামান্য একটুখানি দূরে কালীমন্দির থেকে, রাত্রে চলা এমন কোন অসুবিধা নয়, কিন্তু যতই কালীমন্দিরের দিকে এগিয়ে যেতে চাচ্ছেন পা তাঁর চলে যাচ্ছে পাশে ড্রেনের দিকে। বারবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফিরে যখন শম্ভুবাবুর বাড়ির দিকে তাকাচ্ছেন—সব পরিষ্কার। তখন বুঝলেন, তাই তো, এতো মিথ্যাচার হয়ে গেছে। শম্ভু বলেছিল তার হাত থেকে নিতে, আমি তো হাত থেকে নিইনি। সুতরাং ফিরে এসে আবার শম্ভুবাবুর বাড়িতে পৌঁছলেন, তখন ভিতরে সবাই চলে গেছে। বাইরে দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে মোড়কটি ভিতরে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এই তোমাদের ওষুধ রইলো গো।' তারপরে যখন ফিরলেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। তিনি ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। এই হল,—সত্য তাঁকে ধরেছিল। সত্য তাঁকে সত্যপথেতে পরিচালিত করেছিল। সেই কথাই যেটা নিজের জীবনেতে তিনি অনুভব করেছিলেন—ভক্তি, সত্য—তারই কথা তিনি বলে গেছেন আমাদের গ্রহণ করতে।

আর বলেছেন তিনি—সরলতা। শিশুর মতো সরল হতে হবে। মা বলেছেন, ও ধরে জুজু, ও ঠিক ধরে রেখেছে সেখানে জুজু। মা বলেছেন, ও তোর দাদা—সে কামারই হোক আর কুমোরই হোক না কেন, ব্রাহ্মণের ছেলে হলেও সে এক-পাতে বসে খাবে কেননা মা বলেছে দাদা। এই সরলতা। তিনি যাচ্ছেন গাড়ি করে কলকাতায়। কে বলেছিল শরতের হিম মাথায় লাগালে শরীর বেশ ভাল হয়। মাথা বের করে খুব শরতের হিম লাগালেন, তারপরে সর্দিকাশি। এই ছিল তাঁর সরলতা। তাঁর বাবাও ছিলেন তেমনি সরল। সরল না হলে সরল ভগবানকে লাভ করতে পারা যায় না।

আরও কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সংক্ষেপে বলছি। কত কথাই তিনি বলে গেছেন! তিনি বলেছেন—সাধনার উপায় স্বরূপে সাধুসঙ্গ করা, সৎগ্রন্থ পাঠ করার কথা। ভক্তদের তিনি সেগুলো শিখিয়েছেন, তিনি দেখিয়েছেন।

সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভগবানকে লাভ করে তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল যে, আমি ভক্তদের

নিয়ে থাকব। সংসারীদের কথাশুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল—আর কতদিন ধরে চলে। মা তাঁকে বললেন যে, তোর ভক্তরাও আসবে, তাদের সঙ্গে তুই কথাবার্তা বলতে পারবি। কিন্তু তারা তো আসছে না এখনও, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাই কুঠির ছাতে সন্ধ্যার সময় উঠে ডাকছেন,—ওরে কে কোথায় আছিস তোরা আয়। ভক্তরা সেই আহ্বান শুনলেন, তাদের প্রাণে জাগল আকুতি। ভক্তরা ক্রমে ক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাদের তিনি দিনরাত নানা ভাবেতে সাধনার পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা শোনাতে লাগলেন, যা কথামৃততে প্রকাশিত হয়েছে, লীলাপ্রসঙ্গেতেও লিখিত হয়েছে, যা স্বামীজী তাঁর নানারকম বক্তৃতাতে ব্যাখ্যা করেছেন।—এই সবটা মিলেই হল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। শুধু কথামৃত নিয়ে নয়—ঐ লীলাপ্রসঙ্গ নিয়ে এবং স্বামীজীর বাণী ও রচনা—সবটা নিয়েই হল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও তাঁর বক্তব্য।

তিনি আবার রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিষ্ঠা করলেন কাশীপুরে। তিনি তাদের গেরুয়া বস্ত্র দিলেন, তাদের ভিক্ষা করালেন এবং নরেন্দ্রনাথকে নেতা-রূপে স্থির করে তিনি তাকে নানারকম পরামর্শ দিলেন,—কিভাবে সংঘ গড়তে হবে, কিভাবে ভাইদের ধরে রাখতে হবে।

ভক্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি তাদের সৎসঙ্গ দান করতে লাগলেন। নানারকম কীর্তনাদিতে তিনি যোগ দিতে লাগলেন। নাচেন, গান করেন, মুহুর্মুহুঃ সমাধি হয়। তার অবস্থা দেখে ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একদিন বলেছিলেন, 'বাবা এ যেন ভূতে পাওয়া।' আর দৃষ্টান্ত তো সংসারে খুঁজে পাওয়া গেল না—এইজন্য ভূতে পাওয়া। ভগবান এমন ভাবেতে তাকে ধরে বসেছেন যে, এ জগতের কোন হুঁশই নেই। একেবারে ঈশ্বরেই তিনি মত্ত। এই যে মত্ত হয়ে যাওয়া, এই ভাব শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন তার জীবনেতে যে, না মাতলে,—ভগবানকে পাবার জন্য এমনি করে সর্বস্বহীন হয়ে সর্বহারা হয়ে তাঁকে প্রাণপণে না ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। এইভাবেতে তিনি তাঁর জীবনেতে যা উপলব্ধ বস্তু, নানাভাবেতে প্রচার করলেন। এবং তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন মাস্টার মশাইকে, নরেন্দ্রনাথকে, স্বামী সারদানন্দকে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইত্যাদি আরও অনেক বড় বড় ভক্তদের, যারা তাদের অনুভূতি, তাঁদের শোনা কথা সমস্ত লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, ব্যাখ্যা করে গেছেন, বলে দিয়ে গেছেন।—সেই সমস্ত থেকেই আমরা আজ শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় পাচ্ছি নানাভাবেতে। তাই বলছিলাম পাচ্ছি, আপনারা আরও পাবেন। আমি যতটুকু বললুম, তাতে আপনারা সকলেই বলবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। আরও অনেক কিছুই আছে। সত্যিই তো তাই। গোড়াতেই তো বলেছি। কতটুকু আমি বুঝেছি, আর কতটুকু আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারি এ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাতে। এ সম্ভবপর নয়। তাঁর জীবন, যতদিন যাবে, যত বছর যাবে, যত যুগযুগান্ত যাবে, ততো আরও বেশি প্রকাশিত হতে থাকবে। তাঁর জীবনের পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করতে মানবের সহস্র সহস্র বৎসর লেগে যাবে। আজও যীশুখ্রীষ্ট বেঁচে আছেন, আজও মহম্মদ বেঁচে আছেন, আজও বুদ্ধ বেঁচে আছেন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র—এখনও তাঁরা রয়েছেন এবং থাকবেন। তাঁরা থাকবেন আরও সহস্র সহস্র বৎসর ধরে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এবং তাঁর জীবন এইমাত্র তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে—চলবে আরও কত সহস্র সহস্র বৎসর ধরে। তিনি বলেছিলেন ঘরে ঘরে তাঁর ছবির পূজো হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারা আরও দেখতে পাবেন, কত ঘরে কত গ্রামে, কত শহরে, কত জায়গায় নানারকমভাবে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ভক্ত সমাগম হচ্ছে, ভাবপ্রচার হচ্ছে। আরও কত হবে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি দীক্ষার জন্য লালায়িত হয়ে আপনা থেকে ছুটে আসছে!—এ-সব কার প্রেরণা? এ তাঁরই প্রেরণা। যেমন মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ বলতেন, তিনিই তাঁর ভক্তদের নিয়ে আসেন আর আমি তাদের সকলকে তাঁরই শ্রীচরণে অর্পণ করে দিই। এ-সব তাঁরই কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ এ-সব লীলা করে যাচ্ছেন। এই কটি কথা বলে আমি আপনাদের কাছ থেকে আজকে বিদায় গ্রহণ করছি। ধন্যবাদ।

'খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায়'

শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ-পুরস্কারে সম্মানিত খ্যাতনামা গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

কথামৃতের শেষ পরিচ্ছেদে এসে প্রাণটা হুহু করে ওঠে। ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে টাঙানো গৌর নিতাইয়ের ছবি একখানা বেশি ছিল। গৌর নিতাই সপার্ষদ নবদ্বীপে সংকীর্তন করছেন। রামলাল শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন, 'তা হলে ছবিখানি এই এঁকে মাস্টারকেই দিলাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আচ্ছা, তা বেশ।'

সব ছাড়ার পালা। যাকে যা দেবার আছে সব দিয়ে যাচ্ছেন একে একে। যা বলার আছে সব বলে যাচ্ছেন।

ঠাকুর হঠাৎ একদিন মৌনী হলেন। সকাল ৮টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। ১১ অগস্ট ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। আগের দিন গেছে অমাবস্যা। শ্রীম লিখছেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি কি জানিতে পারিয়াছেন যে, শীঘ্র তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন! জগন্মাতার ক্রোড়ে আবার গিয়া বসিবেন? তাই কি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন? তিনি কথা কহিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা কাঁদিতেছেন। রাখাল ও লাটু কাঁদিতেছেন। বাগবাজারের ব্রাহ্মণী এই সময় আসিয়াছিলেন, তিনিও কাঁদিতেছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কি বরাবর চুপ করিয়া থাকিবেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে যে লীলা শুরু হয়েছিল তা শেষ হয়ে আসছে। এইবার প্রদীপ একদিন নিববে। কাল চলে যাবে ইতিহাসের গর্ভে। তারই ইঙ্গিত সর্বত্র। শ্রীম লিখছেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণ—রোগ সারাবার কথা বলতে পারি না। আবার ইদানীং সেব্য-সেবক ভাব কম পড়ে যাচ্ছে। একবার বলি মা তরবারির খাপটা একটু মেরামত করে দাও; কিন্তু ওরূপ প্রার্থনা কম পড়ে যাচ্ছে, আজকাল আমিটা খুঁজে পাচ্ছি না। দেখছি তিনিই এই খোলটার ভিতর রয়েছেন।'

এই কথার পর ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে গোস্বামীজীর কীর্তন শুরু হল। অনুমতি নেওয়ার কারণ, ঠাকুর অসুস্থ। কীর্তন হলেই ভাবাবেশ হবে। ভাবাবেশ হলেই গলায় চাপ পড়বে। কীর্তন শুনতে শুনতে ঠাকুর যথারীতি ভাবাবিষ্ট হলেন। দাঁড়িয়ে উঠে শুরু করে দিলেন ভক্তসঙ্গে নৃত্য। রাখাল ডাক্তার শ্রীমহেন্দ্রর সঙ্গে এসেছিলেন ঠাকুরের চিকিৎসার জন্যে। তাঁরা ঠাকুরের ভাবাবেশ দেখলেন। তাঁর ভাড়াটিয়া গাড়ি অপেক্ষা করছে বাইরে। কলকাতায় ফিরতে হবে। উঠে পড়লেন। একে একে প্রণাম সেরে বিদায়ের পালা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে মাস্টারকে বললেন, 'তুমি কি খেয়েছ?'

এ হল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বরের কথা। এরপর আর মাত্র একটি দিন। বৃহস্পতিবার ২৪ সেপ্টেম্বর। পূর্ণিমার রাত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরের ছোট খাটটির উপর বসে আছেন। মাস্টার প্রভৃতি ভক্তেরা বসে আছেন মেঝেতে। গলার জন্যে ঠাকুর কিছুটা কাতর।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলছেন, 'এক একবার ভাবি দেহটা খোল মাত্র। সেই অখণ্ড (সচ্চিদানন্দ) বই আর কিছু নাই।'

কথামৃতের মূলপর্ব শেষ হচ্ছে এইভাবে: 'তা হলে ছবিখানি এঁকেই (মাস্টারকে) দিলাম'—রামলাল এই কথা বলতে বলতে দেয়ালে

টাঙানো ঠাকুরের অতি প্রিয় ছবিখানি খুলে নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে গৌর নিতাইয়ের ছবি একখানা বেশি ছিল : গৌর নিতাই সপার্ষদ নবদ্বীপে সংকীর্তন করছেন।

ঠাকুর বললেন, 'আচ্ছা তা বেশ।'

এরপর সামান্য একটু সংযোজন, 'ঠাকুর কয়েকদিন প্রতাপের ঔষধ খাইতেছেন। গভীর রাত্রে উঠিয়া পড়িয়াছেন, প্রাণ আইটাই করিতেছে। হরিশ সেবা করেন, ঐ ঘরেই ছিলেন; রাখালও আছেন; শ্রীযুক্ত রামলাল বাহিরে বারান্দায় শুইয়া আছেন। ঠাকুর পরে বলিলেন, "প্রাণ আইটাই করাতে হরিশকে জড়াতে ইচ্ছে হল; মধ্যম নারায়ণ তেল দেওয়াতে ভাল হলাম তখন আবার নাচতে লাগলাম।"'

'সমাপ্ত' লেখায় অপূর্ব এক লীলার সমাপ্তি। এর পরেই পরিশিষ্ট। 'বরাহনগর মঠ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি আজ ৺শিবরাত্রির উপবাস করিয়া আছেন। দুই দিন পরে ঠাকুরের জন্মতিথি পূজা হইবে। বরাহনগর মঠ সবে পাঁচ মাস স্থাপিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যধামে বেশীদিন যান নাই।···আজ সোমবার ৺শিবরাত্রি, ২১শে ফেব্রুআরি ১৮৮৭।·· পূজা শেষ হইয়া গেল। শরৎ তানপুরা লইয়া গান গাইতেছেন—

শিব শঙ্কর বম্ বম্ (ভোলা)
কৈলাসপতি মহারাজরাজ !···

'নরেন্দ্র কলিকাতা হইতে এইমাত্র আসিয়াছেন। এখনও স্নান করেন নাই। কালী নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মোকদ্দমার কি খবর?

'নরেন্দ্র (বিরক্ত হইয়া)—তোদের ওসব কথায় কাজ কি?

'নরেন্দ্র তামাক খাইতেছেন ও মাস্টার প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন :

"কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না। কামিনী নরকস্য দ্বারম্। যত লোক স্ত্রীলোকের বশ। শিব আর কৃষ্ণ এঁদের আলাদা কথা। শক্তিকে শিব দাসী করে রেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংসার করেছিলেন বটে, কিন্তু কেমন নির্লিপ্ত। —ফস্ করে বৃন্দাবন কেমন ত্যাগ করলেন!"'

কথামৃতের এই পর্যায়টি উল্লেখ করলাম দুটি কারণে। প্রথম কারণ, আমরা যে লীলায় প্রত্যক্ষ অংশ নিতে পারিনি বা নিলেও দেহরূপ বদলাতে বদলাতে বর্তমানের নামরূপে এসে বিস্মৃত, সেই লীলার অমৃত স্বাদে কথামৃত জমজমাট। ঠাকুর, পরম ভক্ত শ্রীমর মাধ্যমে অক্ষরের মালায় স্তব্ধ করে রেখে গেছেন, সেই কাল, সেই ভাব, সেই আন্দোলনকে। ঠাকুরের হাঁটাচলা, ওঠাবসা, ফিরে তাকানো, কথা বলা, হাত নাড়া, ক্ষণে ক্ষণে ভক্তদের আসা যাওয়া, নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে কাষ্ঠপাদুকার শব্দ তুলে মা ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে ঘণ্টাবাদন, পঞ্চবটীতে ঘুরে বেড়ানো, ভক্তসঙ্গে লীলাপ্রসঙ্গ, আরতির কাঁসর ঘণ্টা, কথামৃতের দুই মলাটে চিরকালের জন্যে বন্দী হয়ে আছে। আজও জীবন্ত।

দ্বিতীয় কারণ, ঠাকুর যেই নিত্যধামে আরোহণ করলেন দক্ষিণেশ্বর যেন ফাঁকা হয়ে গেল। 'নন্দকুল চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।' পদব্রজে অথবা নৌকাপথে কি ফিটনে চড়ে, দূর দূর থেকে ভক্তরা আর আসেন না। মা আছেন; কিন্তু সেই পঞ্চবটীর সাধনপীঠের প্রাণপুরুষ ফিরে গেছেন অমর্ত্যলোকে। দেবী আছেন; কিন্তু তাঁকে জাগ্রত করার সাধকপ্রবর নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। তীর্থ আছে, স্মৃতি আছে, লীলা নেই। অন্তরঙ্গ পার্ষদ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সেই মুহূর্তের শূন্যতা দুঃসহ। সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন। কোথায় তাঁরা দানা বাঁধবেন। বরাহনগরের জীর্ণ কুঠিতে তাঁরা সমবেত হয়েছেন, ঠাকুরের পট প্রতিষ্ঠা হয়েছে, পূজার্চনাদিও হচ্ছে, সাধন-

ভজনেরও কমতি নেই ; কিন্তু কারুরই মন বসছে না। যিনি চলে গেলেন তাঁর তো কোনও দ্বিতীয় হয় না। কথামৃতের পরিশিষ্টাংশ যেন দীর্ঘ একটি বিলাপের মতো। সন্তানদের অনেকটা দিশাহারা অবস্থা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের 'টাকা মাটি আর মাটি টাকা' ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আত্মদর্শন, 'যা পাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।' 'গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।' তিনি কিছু প্রতিষ্ঠা করে যাননি। বিশেষ কোন মত, বিশেষ কোন পথ, বিশিষ্ট কোন অর্ডার। বেছে বেছে, আধার বুঝে, দশ-বারটি বৈরাগ্যবান্ যুবকের অন্তরে বীজ ফেলে গিয়েছিলেন। এ-যেন তাঁর নিজেরই 'প্যারেবল্‌স'-এর ধারা অনুসরণ। পাখি ঠোঁটে করে বীজ নিয়ে যেখানে সেখানে ফেলে। কোনটা পাথরে পড়ল, কোনটা পড়ল জলে, কোনটা মরুভূমিতে, ঠিক জায়গায় যেটি পড়ল, সেইটিই অঙ্কুরিত হল, ধীরে ধীরে পরিণত হল বিশাল বৃক্ষে। মঠ, মন্দির, মসজিদ অথবা কোন অর্ডারে ঠাকুর নিজেকে জড়াতে চাননি। তাঁর অসাধারণ মতবাদ—যত মত তত পথ।

'যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।'

আমার মত, আমার পথ বলে যাঁরা দম্ভ করতেন, ঠাকুর মুচকি হেসে বলতেন, ওরে, ও যে মতুয়ার বুদ্ধি।

'যদি হৃদয় মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবান লাভ করতে চাও, শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁক ফুঁকলে কি হবে! আগে চিত্তশুদ্ধি কর, মন শুদ্ধ হলে ভগবান্ পবিত্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না। এগারজন চামচিকে একাদশ ইন্দ্রিয়—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় আর মন। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা—তারপর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেকচার দাও! আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তারপর অন্য কাজ। কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, দু-চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার! লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন। ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায় তাহলে লোকশিক্ষা দিতে পারে।'

'তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বাৎ ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥'

তিনি নিজে দম্ভশূন্য, সাধারণের থেকেও সাধারণ মানুষ ছিলেন। বুঝতেই দিতেন না, তিনি অবতার। দক্ষিণেশ্বরে এসে কেউ ধর্মকথা, তত্ত্বকথা শুনতে চাইলে, লহমায় দেখে নিতেন আধারটি কেমন। যেই দেখতেন মতুয়া, অমনি বলতেন, যাও না যাও, ওই মন্দিরে মা ভবতারিণী আছেন, পঞ্চবটী, বেলতলা, গঙ্গা, বিল্ডিং দ্যাখো, সিনারি দেখ।

ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব ছিল না, টাটে বসে গুরুগিরি করার। তিনি সার জানতেন, ঈশ্বর মন দেখেন। মুখে এক, মনে আর এক, ও চলবে না।

'লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥'

তাঁর কাছে অনেকে এসেছেন, একবার, দু-বার, বহুবার, দর্শন হয়েছে, শ্রবণ হয়েছে, এঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই 'ইনার-অর্ডারে' স্থান পেয়েছিলেন। মায়ের পায়ে দেবার জন্যে বেছে বেছে তুলে নিয়েছিলেন মাত্র কয়েকজনকে। তাঁদের তিনটানকে একটান করে দিয়েছিলেন। ঠাকুর বলতেন, 'তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের ওপর, মায়ের সন্তানের ওপর, আর সতীর পতির ওপর টান। এই তিন

টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।'

ঠাকুর যাঁদের তুলে নিয়েছিলেন, তাঁদের তিনটান এক হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকেই ধাবিত হয়েছিল।

'তেজস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
রাগে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!'

ঠাকুর একদিন শ্রীমকে বলেছিলেন, 'দেখ, চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়; তারা ভাল গরু, মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না। যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে উঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র সেই গরুর জাত; ভিতরে খুব তেজ!' ঠাকুর হাসছেন আর বলছেন, 'আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিঁড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ করছে।'

ঠাকুরের ভাব আর স্বামীজীর তেজ দুয়ে মিলে সারা বিশ্বে যে ভাবান্দোলন হয়ে গেল তার কি কোনও তুলনা আছে? অবতার পুরুষরা এই ভাবেই একটা প্লাবন সৃষ্টি করে দিয়ে যান। গৌতম বুদ্ধ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য করেছিলেন। করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

'অযুত কণ্ঠে বন্দনা-গীতি ভুবন ভরিয়া উঠিছে,
(তব) অমিয় বারতা দেশ দেশান্তরে
হৃদয়ে হৃদয়ে পশিছে।'

গীতায় ভগবান বলছেন,

'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো
বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥'

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যেই স্থিত হয়েছিলেন,

'যা নাই—তা হ'তে কিছু হয় না প্রকাশ,
থাকে যদি—কিছুতেই নাই তার নাশ।'

তিনি ছিলেন। তিনি আছেন। তিনি সত্য অবিনাশী। ঠাকুরের সার কথা ছিল, ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুলতা। 'এই ব্যাকুলতা। যে পথেই যাও, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী—যে পথেই যাও, ঐ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা। তিনি তো অন্তর্যামী, ভুল পথে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই—যদি ব্যাকুলতা থাকে। তিনিই আবার ভাল পথে তুলে লন। আর সব পথেই ভুল আছে। সব্বাই মনে করে আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু কারও ঘড়ি ঠিক যায় না। তা বলে কারু কাজ আটকায় না। ব্যাকুলতা থাকলে সাধুসঙ্গ জুটে যায়, সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক করে লওয়া যায়।'

ঠাকুর বড় আয়োজন করে দেহধারণ করেছিলেন। ঠাকুরের কথায়, 'মা, আমি কি যেতে পারি! গেলে কার সঙ্গে কথা কব? মা, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকব!'

একান্তে দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের এই সব কথা হয়েছিল। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলছেন, 'তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি, আর আমায় বললি, "আমি এসেছি।"'

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে তখমা দিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীমকে একদিন একখানা কাগজে লিখে বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষা দেবে।'

নরেন্দ্র পরে শুনে ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আমি ওসব পারব না।'

ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোর ঘাড় করবে।'

তিরোধানের পর সন্তানেরা যে একটু বিপদে পড়বে ঠাকুর মানসচক্ষে তা দেখেছিলেন। দেখে শ্রীমকে একদিন বলেছিলেন, 'তোমরা রাস্তায়

কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ত্যাগ করতে একটু কষ্ট হচ্ছে।'

তিরোধানের অব্যবহিত পরের অবস্থা শ্রীম লিখে গেছেন। নরেন্দ্রনাথ তখনও বিশ্বজয়ী বীর বিবেকানন্দ হননি। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলছেন। গুরুভ্রাতাদের দায়িত্ব নিয়ে কখন বরাহনগর মঠে, কখন কলকাতায়। অর্থকষ্ট, নানা সংশয়। ঠাকুরের অনন্ত পরীক্ষা চলেছে। 'তুই পারবি না, তোর ঘাড় পারবে।'

> 'যোগ-ভোগ, গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস, জপ-তপ,
> ধন-উপার্জন,
> ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম
> দেখেছি এবার ;
> জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ
> বিড়ম্বন ;
> যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ
> নিশ্চয় !'

শ্রীম লিখছেন : 'দু-তিনজনের ফিরিয়া যাইবার বাড়ী ছিল না। সুরেন্দ্র তাঁহাদের বলিলেন, ভাই তোমরা আর কোথা যাবে, একটা বাসা করা যাক। তোমরাও থাকবে আর আমাদেরও জুড়াবার একটা স্থান চাই। তা না হলে সংসারে এরকম করে রাত দিন কেমন করে থাকব। সেইখানে তোমরা গিয়ে থাক। আমি কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্যে যৎকিঞ্চিৎ দিতাম। এক্ষণে তাহাতে বাসা খরচা চলিবে। সুরেন্দ্র প্রথম প্রথম দুই এক মাস টাকা ত্রিশ করিয়া দিতেন। ক্রমে যেমন মঠে অন্যান্য ভাইরা যোগ দিতে লাগিলেন, পঞ্চাশ, ষাট করিয়া দিতে লাগিলেন। শেষে ১০০ টাকা পর্যন্ত দিতেন। বরাহনগরে যে বাড়ী লওয়া হইল, তাহার ভাড়া ও ট্যাক্স ১১ টাকা। পাচক ব্রাহ্মণের মাহিনা ৬ টাকা, আর বাকী ডালভাতের খরচ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ডারের এই শুরু। শ্রীম লিখছেন : 'ধন্য সুরেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারি হাতে গড়া। তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল! তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ মূর্তিমান করিলেন। কৌমার-বৈরাগ্যবান শুদ্ধাত্মা নরেন্দ্রাদি ভক্তের দ্বারা আবার সনাতন হিন্দুধর্মকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। ভাই তোমার ঋণ কে ভুলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন—তোমার অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসিবে। আজ বাড়ীভাড়া দিতে সব টাকা গিয়াছে—আজ খাবার কিছু নাই—কখন তুমি আসিবে—আসিয়া ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে! তোমার অকৃত্রিম স্নেহ স্মরণ করিলে কে না অশ্রুবারি বিসর্জন করিবে।'

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-লীলা পাঠকের সামনে ঠাকুরের তিরোধান আর নরেন্দ্রের স্বামী বিবেকানন্দ হবার মাঝখানের কয়েকটি বছর যেন শূন্যতায় ভরা। শ্রীম প্রথম দিকের সংগ্রামের চিত্র যখন যেমন সুবিধে কথামৃতের পরিশিষ্টাংশে লিপিবদ্ধ করেছেন ঠিকই, তবে বেশ বোঝা যায় প্রাণ-পুরুষের প্রয়াণে তিনিও ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী হয়ে আসছেন। অন্তরে তাঁকে আসন দিয়ে মগ্ন হয়ে পড়েছেন। তখন তাঁর ভাব :

'My Soul, in everything and yet beyond everything, you must find your rest in the Lord, for He is the eternal rest of the Saints'.

যাঁর কাজ তিনি ঠিকই করিয়ে নেন। অল্প ব্যবধান, তার পরেই অনবদ্য আর একটি লীলা কাহিনী—'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'। লিপিকার আর এক গৃহী-সাধক, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। ঠাকুর-কৃপা করেছিলেন শ্রীমকে। স্বামীজী কৃপা করলেন, শরচ্চন্দ্রকে। শ্রীমর প্রথম দর্শনের কাহিনী বড় অপূর্ব। 'বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরী মাস।'

'মাষ্টার সিধু [বরাহনগরের সিদ্ধেশ্বর মজুমদার]র সঙ্গে বরাহনগরের এ বাগানে ও বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে [দক্ষিণেশ্বরে] আসিয়া পড়িয়াছেন।'

শ্রীম অবাক হয়ে দেখছেন, এক ঘর লোক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। তাঁরা ঠাকুরের কথামৃত পান করছেন। 'ঠাকুর তক্তপোশে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরিকথা কহিতেছেন।'

দ্বিতীয় দর্শনে, ঠাকুরের ঘর বন্ধ ছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে বৃন্দে।

শ্রীম প্রশ্ন করলেন—'হাগা, সাধুটি কি এখন এর ভিতর আছেন?'

বৃন্দে—হাঁ, এই ঘরের ভিতর আছেন।

মাস্টার—ইনি, এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দে—তা অনেকদিন আছেন।

মাস্টার—আচ্ছা ইনি কি খুব বইটই পড়েন?

বৃন্দে—আরে বাবা বইটই। সব ওঁর মুখে।

১৮৮২ আর ১৮৯৭, পনের বছরের ব্যবধান। স্থান, নির্জন, নিরালা, দক্ষিণেশ্বর নয়, খাস কলকাতা। বাগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। আর সেই বসন্তকাল। ফেব্রুআরি মাস। নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ। বিলেত থেকে সবে তিন-চারদিন হল ফিরেছেন। প্রিয়নাথবাবুর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ। স্বামী তুরীয়ানন্দ শরচ্চন্দ্রকে স্বামীজীর সামনে উপস্থিত করলেন। শরচ্চন্দ্র স্বামীজীর সেই দিব্যকান্তির কোনও বর্ণনা দেননি। ঠাকুর যাঁকে বলতেন, 'নরেনের অখণ্ডের ঘর।'

স্বামীজী ছিলেন, 'অল ফোর্স', দীপ্ত অগ্নিশিখা। সংস্কৃতে সম্ভাষণ করলেন। সাধু নাগমহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। স্বামীজী 'কিষ্টক্রিষ্ট'র চেয়ে প্রকৃত মানুষ চাইতেন। কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, সবিবেক কর্মী। শিষ্যকে বললেন:

'মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যুপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি ॥'

—হে বিদ্বন্! ভয় পেয়ো না, তোমার বিনাশ নেই, সংসার-সাগর পার হবার উপায় আছে। যে পথ অবলম্বন করে শুদ্ধসত্ত্ব যোগী এই সংসার-সাগর পার হয়েছেন সেই পথের নির্দেশ তোমায় আমি দিচ্ছি।

ঠাকুর শ্রীমকে অন্যভাবে বলেছিলেন, অনেক নরম করে সহজ করে। প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বিয়ে করেছিস? শ্রীম যেই বললেন, হ্যাঁ, ঠাকুর হতাশ হয়ে বললেন, যাঃ। প্রথম ধাক্কা। ছেলে হয়েছে শুনে, দ্বিতীয় ধাক্কা। শ্রীম বুঝতে পারছেন, ধীরে ধীরে ঠাকুর তাঁর অহংকার চূর্ণ করে দিচ্ছেন। শেষে পথও বাতলে দিলেন কৃপা করে—'তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।'

স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে শঙ্করাচার্যের 'বিবেকচূড়ামণি' পাঠ করতে বললেন। দেখিয়ে দিলেন বেদান্তের পথ। নিজের পথ। ঠাকুর বলতেন রসেবশে, স্বামীজী বলতেন, 'আমাদের ভেতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ।' আর 'চেতনের লক্ষণ কি?' 'প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।' 'যেখানে **struggle,** যেখানে **rebellion,** সেখানেই জীবনের চিহ্ন, সেখানেই চৈতন্যের বিকাশ।' রস বশ নয়। একেবারে বিদ্রোহ।

স্বামীজী শিষ্যকে বললেন, 'সকলকে গিয়ে বল্—"ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, একথা বিশ্বাস করো, তাহলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে।" ঐকথা সকলকে বল্

এবং সেই সঙ্গে সাদা কথায় বিজ্ঞান দর্শন ভূগোল ও ইতিহাসের মূল কথাগুলি mass-এর ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি Centre তৈয়ার করব—প্রথম তাদের শেখাব, তারপর তাদের দিয়ে এই কাজ করাব, মতলব করেছি।'

দক্ষিণেশ্বরে মা-ভবতারিণী, ধূপ, ধুনো, আরতি, ধ্যান, প্রাণায়াম। প্রাণপুরুষ ঠাকুর নিত্যধামে। সময় এগিয়ে গেছে পনের বছর। স্বামীজী পাশ্চাত্য কাঁপিয়ে এসেছেন। মেটিরিয়ালিস্টদের কাছে চাইতে যাননি, দিতে গিয়েছিলেন—বেদান্তধর্ম।

'আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদান্তধর্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের এখন আর কিছু নেই বললেই হয়।' স্বামীজী মিরার পত্রিকার সম্পাদককে বলছেন, 'ধর্মের চর্চায় ও বেদান্তধর্মের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্যদেশ—উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনীতিচর্চা এর তুলনায় আমার কাছে গৌণ উপায় বলে বোধ হয়।'

দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে ঠাকুর বেরিয়ে এসেছেন বিশ্বমঞ্চে। একদিকে ভোগবাদী পাশ্চাত্য, আর একদিকে দরিদ্র প্রাচ্য। মাঝখানে প্রকৃত সাম্যকার বিবেকানন্দ। ক্লাসকে নয় জাগাতে চাইছেন মাসকে। মঠ তখনও বেলুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মঠ আলমবাজারের ভাড়া বাড়িতে। স্বামীজী কখন বাগবাজারে, কখন আলমবাজারে, কখন কাশীপুরে। যখন যেখানে, সেইখানেই ভক্ত ও বিদ্বজ্জন সমাগম। কেউ আসছেন বিশ্বমানবকে চোখের দেখা দেখতে। কেউ আসছেন ক্ষুদ্র স্বার্থে। কেউ আসছেন, প্রাণের টানে পথের সন্ধান পেতে।

যিনি যেভাবেই আসুন, বৈদান্তিক, কর্মযোগী, তেজোময় স্বামীজীকে ঘিরে দক্ষিণেশ্বরের মতো শান্ত, একান্ত লীলা জমছে না। জমতে পারে না। কারণ, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।' মন্দিরে, মসজিদে নয়, নাকটেপা প্রাণায়াম, ধ্যান জপে নয়, পথ অন্য, কর্ম অন্য।

'একটি জীবের মধ্যে ব্রহ্মবিকাশ হলে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে পথ পেয়ে অগ্রসর হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাই একমাত্র লোকগুরু। এ-কথা সর্বশাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। অবৈদিক, অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরাই এদেশে প্রচলন করেছে। সেজন্য সাধন করেও লোক এখন সিদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞ হতে পাচ্ছে না। ধর্মের এ সকল গ্লানি দূর করতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—শরীর ধারণ করে বর্তমান যুগে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত সার্বভৌম মত জগতে প্রচারিত হলে জগতের এবং জীবের মঙ্গল হবে।'

স্বামীজীর পরিকল্পনা 'মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় দুইটি কেন্দ্র করে সর্ববিধ লোক-কল্যাণের জন্য নূতন ধরনে সাধু সন্ন্যাসী তৈরি করতে হবে।'

স্বামীজী মা-ভবতারিণীর কাছে ঐহিক কিছু প্রার্থনা করতে পারেননি। চেয়েছিলেন, শুদ্ধাভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গোপাললাল শীলের বাগানে বসে শিষ্যকে বললেন :

'তুই কি বলছিস? মানুষেই তো টাকা করে। টাকায় মানুষ করে, একথা কবে কোথায় শুনেছিস? তুই যদি মন মুখ এক করতে পারিস, কথায় ও কাজে এক হতে পারিস তো জলের মতো টাকা আপনা-আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে।'

মা-কালীকে তিনি আবাহন করেছিলেন, রক্ষাকারিণী শ্যামা হিসেবে নয়।

'করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,

তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

ঠাকুর আর স্বামীজীতে এই তফাত। গৃহী, সন্ন্যাসী, ভোগী ত্যাগী সকলকে নিয়েই ছিল ঠাকুরের মহতী পরিবার। তাঁর দৃষ্টি সকলের ওপরেই ছিল। তিনি ছিলেন—ভবরোগবৈদ্যম্। যেমন বলতেন, 'মা রাঁধেন ছেলেদের পেট বুঝে। একই মাছ কাউকে দিচ্ছেন ভাজা, কোনও ছেলেকে ঝোল, কোনও ছেলেকে ঝাল।' ঠাকুর কোনও প্রার্থীকে বললেন, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ। বৈরাগ্য। তিনটান একটান কর। সংসারে থাক দাসীর মতো। কাউকে বললেন, না হয় সদারা সহবাস হল। দিনান্তে না হয় একবারই তাঁর নাম নিলে। শিবের সংসার কর। সত্ত্ব গুণের সাধনা চালা। মা, তুমি আছ, আর আমি আছি। বিষয়ীর সঙ্গ বেশি করিসনি। আঁষটে গন্ধ সংসারী নাই বা হলি। অহঙ্কার বিসর্জন দে। তুঁহু তুঁহুতেই হাম্বার মুক্তি। রাজার ছেলের মাসোহারার অভাব হয় না। ঠাকুরের সব কিছুর মধ্যে একটা Personal Touch ছিল। তাঁর কথামত তিনি ছিলেন উত্তম বৈদ্য। রোগীকে ওষুধ দিতেন না, খাইয়ে দিয়ে পাশে বসে থাকতেন, সেবা করতেন। শ্রীমকে প্রথম সাক্ষাতেই বলেছিলেন, একটু বেশি বেশি, ঘনঘন আসবে। কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কালি লাগবেই।

স্বামীজী ছিলেন, Wide, ব্যাপক। তাঁর সব পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল Mass. একজন নয়, বহুজন। বহুজনহিতায়। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'তুই নিজের মোক্ষ চাইছিস? তুই স্বার্থপর হবি কেন? তুই হবি বিশাল বটবৃক্ষের মতো। তোর ছায়ায় এসে কত মানুষ বসবে।'

শরচ্চন্দ্র সেই স্বামী বিবেকানন্দকে পেয়েছিলেন। প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল। অসীম তেজ। শরচ্চন্দ্রকে একদিন বলছেন :

'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যে এই ideal ভুলে যায়, "বৃথৈব তস্য জীবনম্"। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তি দান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।

'"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" আমাদের জন্ম; কি করছিস সব বসে বসে? ওঠ—জাগ, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর, নরজন্ম সার্থক করে চলে যা। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"।'

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ একটি প্রজ্জ্বলিত হোমকুণ্ড। বিবেকানন্দ অগ্নি, রামকৃষ্ণ দ্যুতি। প্রায় পাঁচটি বছরের একটি দিনলিপি। স্বামীজী বলতেন, Practical Religion. শিষ্যকে একদিন বলছেন—মঠ প্রতিষ্ঠার পুণ্য দিনে। বহু পরিকল্পনা তাঁর। একটা International Religious Centre হবে। শিষ্য বললেন, 'মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা!' স্বামীজী বললেন, 'কল্পনা কি রে? সময়ে সব হবে। আমি তো পত্তন-মাত্র করে দিচ্ছি—এরপর আরও কত কি হবে! আমি কতক করে যাব, আর তোদের ভেতর নানা idea দিয়ে যাব। তোরা পরে সে-সব workout করবি। বড় বড় Principle কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে practical field-এ দাঁড় করাতে—প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথাগুলি কেবল পড়লে কি হবে? শাস্ত্রের কথাগুলি আগে বুঝতে হবে। তারপর জীবনে সেগুলিকে ফলাতে হবে। বুঝলি? একেই বলে Practical Religion.'

স্বামীজী তাঁর স্বল্প জীবনকালে ঝটিকার মতো বয়ে গেছেন। স্বদেশ বিদেশ, বিদেশ স্বদেশ, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। শরচ্চন্দ্র অসীম নিষ্ঠায়, গুরু-কৃপায় সেই মহাজীবনকে চিরস্পন্দমান করে রেখে গেছেন। অক্লান্ত নদী, সাগর মোহনায় বিশাল হয়েছে, চলার ছন্দে কিছু ক্লান্তি এসেছে। যা চেয়েছেন তা হয়নি। শিষ্যের জীবনের হতাশা কাটাতে প্রয়াণের কয়েকদিন আগে বলছেন, 'হবে বই কি। আকীট-ব্রহ্মা সব কালে মুক্ত হয়ে যাবে—আর তুই হবিনি! ও-সব weakness মনেও স্থান দিবিনি। শ্রদ্ধাবান্ হ, বীর্যবান্ হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর্, আর "পরহিতায়" জীবনপাত কর্—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।'

শিষ্য শরচ্চন্দ্র জানতেন না গুরুর সঙ্গে এই হবে তাঁর শেষ কথা। স্বামীজী বলছেন, 'আগামী রবিবার আসবি তো?'

শিষ্য বললেন—'নিশ্চয়'।

স্বামীজী—'তবে আয়, ঐ একখানি চলতি নৌকাও আসছে। রবিবারে আসিস।' শরচ্চন্দ্র নৌকো ধরার জন্যে ছুটছেন। স্বামী সারদানন্দ বলছেন, 'ওরে কলার ছুটো নিয়ে যা। নইলে স্বামীজীর বকুনি খেতে হবে।' শিষ্য বললেন, 'আজ বড়ই তাড়াতাড়ি, আর একদিন লইয়া যাব —আপনি স্বামীজীকে এই কথা বলিবেন।'

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ শেষ হচ্ছে এইভাবে: 'চলতি নৌকার মাঝি ডাকাডাকি করিতেছে, সুতরাং শিষ্য ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতেই নৌকায় উঠিবার জন্য ছুটিল। শিষ্য নৌকায় উঠিয়াই দেখিতে পাইল, স্বামীজী উপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। সে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নৌকা ভাটার টানে আধঘণ্টার মধ্যেই আহিরিটোলার ঘাটে পঁহুছিল।'

নদীর টান। আর সময়ের টানে আমরা ১৯০২ থেকে চলে এসেছি ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। জীবনের দুই সঙ্গী কথামৃত আর স্বামি শিষ্য-সংবাদ। ঐহিক কিছু সঙ্গে যাবে না। কি হল আর কি হল না, সে বিচারেও কাজ নেই। পরমপ্রাপ্তি হল কৃপা। স্বামীজীর সেই কথা—

'তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে, তাদের মন-বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হতে পারে না। কৃপার test কিন্তু হচ্ছে কাম-কাঞ্চনের অনাসক্তি। সেটা যদি কারও না হয়ে থাকে, তবে সে ঠাকুরের কৃপা কখনই ঠিক ঠিক লাভ করেনি।'

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই কানে বাজে মঠের প্রার্থনা সঙ্গীত, 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।' যেখানেই থাকি হুহু গঙ্গার বাতাস এসে লাগে গায়ে। আমার নিজের অনুভূতি, কথামৃত আর স্বামি-শিষ্য-সংবাদ —অনুপম, অনাবিল এক জ্যোতির্ময় জগতে প্রবেশের দুই বিশাল স্তম্ভ। ঢুকে যাও, ঢুকে যাও, সব ভুলে যাও। স্বামীজীর আদর্শে দাও নিজেকে ঝাড়া—সব weakness ঝরে যাক, আর ঠাকুরের আদর্শে বসে পড়—মনে, বনে, কোণে।

‘মন নিয়ে কথা’

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

বিগত ৩০ অগস্ট ১৯৬৭, দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনে আয়োজিত একটি ভক্ত-সমাবেশে প্রদত্ত লোকান্তরিত সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের ভাষণ থেকে গৃহীত।

একটা প্রশ্ন সবাই করেন, “আমি জপধ্যান করছি কিন্তু মন স্থির হয় না, জপ করতে ভাল লাগে না।” এটা কিছু নতুন প্রশ্ন নয়। যারা ধর্মজীবন যাপন করতে চায় এবং যারাই চেষ্টা করেছে, তাদের সবারই মনে এরকম প্রশ্ন জাগে। এমনকি গীতাতেও অর্জুনের মনে এই একই প্রশ্ন জেগেছিল, যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যোগের কথা বললেন, মনকে স্থির করার কৌশল শেখালেন। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলেছিলেন, “তুমি মনের লয় ও বিক্ষেপশূন্য অবস্থার কথা যা বললে, তা বুঝলাম। কিন্তু চঞ্চল মনে ঐ সমত্বভাব স্থায়ী হবে কেমন করে, তা বুঝে উঠতে পারছি না। বাতাসের গতিকে আবদ্ধ রাখা যেমন দুঃসাধ্য, আমার অতি চঞ্চল মনকে বিষয়-বাসনা থেকে নিবৃত্ত করাও তেমনই অসাধ্য।” তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, “তুমি যা বলছ ঠিকই—মন যে দুর্নিরোধ এবং চঞ্চল তাতে সন্দেহ নেই। তবে নিয়মিত অভ্যাস এবং বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা চঞ্চল মনকে আয়ত্তে আনা যায়।”

প্রথমে দরকার চিত্তশুদ্ধি। মনটা যখন শুদ্ধ হয়, তখন জপধ্যান ভালভাবে হয়। চিত্তশুদ্ধি করতে গেলে সর্বাগ্রে সাধন—আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম ভালভাবে, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে করতে হবে। সংসারে যে-সব কাজ আছে, সেগুলিকে যদি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে ও নিষ্কামভাবে করি আর নিষিদ্ধ কর্মগুলিকে ত্যাগ করি, তাহলে তা নিশ্চয়ই চিত্তশুদ্ধিকর হবে। আমার এটা চাই, ওটা চাই, এইরকম কামনাগুলিকেও বর্জন করে শুধু কর্তব্য হিসাবে যে-সব কর্ম সংসারে থাকলে করতেই হয়, মাত্র সেগুলিকে আন্তরিকতার সঙ্গে করে চললে চিত্তশুদ্ধি নিশ্চয়ই হবে। আর তা না হলে স্বামীজী যা বলেছেন—সংসারে যাদের সঙ্গে আমাদের লেন-দেন করতে হয়, তাদের সবাইর ভিতরে আমরা যদি ভগবানকে দেখি এবং সেই ভাব নিয়ে তাদের সেবা করে যাই, তাতেও আমাদের মন শুদ্ধ হবে ও জপধ্যানের সহায়ক হবে। আমরা সব সময় বলি যে, সংসারের ঝামেলাতে জপধ্যান করতে পারছি না; কিন্তু সংসারের ঝামেলার মধ্যেও যদি এমনভাবে মনকে তৈরি রাখি যে, কর্তব্য-বুদ্ধিতে সব কাজ করে যাব কিন্তু কোনরকম কামনা থাকবে না কর্তব্য পালনের মধ্যে, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে সব কর্ম করে যাব,—অথবা যদি সংসারে সবার ভিতরে ভগবানকে দেখে সেই তাঁরই সেবা-বুদ্ধিতে সব করে যাই, তাহলে এই সংসারের কোন ব্যাপারকেই খুব ঝামেলা বলে আর বোধ হবে না। আর যখন জপধ্যান করতে বসব, তখন ঠিক সেইভাবেই করব—কাজকর্ম করবার সময় যেভাবে ভগবানের পূজা-বুদ্ধিতেই সব করেছিলুম, এখনও সেই ভগবানকেই চিন্তা করতে বসেছি—এ-ও তাঁরই পূজা। এভাবে সংসারের কাজকর্ম এবং জপধ্যানের সঙ্গে বেশ একটা যোগাযোগ করে নেওয়া চলে। তাতে সংসারের ঝামেলা অতটা বোধ হবে না, বরং একটা সামঞ্জস্য বোধ হবে সব ব্যাপারে। এইরকম ভাব নিয়ে যদি কাজকর্ম করা যায়, তাহলে সহজে চিত্তশুদ্ধি হতে পারে।

চিত্তশুদ্ধি হলে মনের ভিতর বিচার জাগে যখন মনেতে বিচার জাগে, তখন আমরা ধরতে পারি যে সৎ-অসৎ কি। যদি আমরা বিচার

করতে থাকি যে, বাস্তবিক এই জগতে কোন্‌টা সত্য, তখন দেখব যে, একমাত্র ভগবানই হচ্ছেন সত্য, বাকী সবই হচ্ছে মিথ্যা। এক ঈশ্বরই বস্তু, আর সবই অবস্তু—শ্রীশ্রীঠাকুর এককথায় বলে দিয়েছেন। এরই নাম সদসৎ বিচার। এরকম বিচারের দ্বারা যখন দেখি যে, ভগবানই একমাত্র সত্য, অন্য সবই দুদিনের ব্যাপার, তখনই আমাদের ভগবানলাভ করার ইচ্ছা আন্তরিক হয়। আর ভগবানলাভ করার জন্য ঠিক ঠিক ইচ্ছা যখন হয়, তখন আমরা খুঁজে বেড়াই, কার কাছে গেলে তাঁকে পাবার পথের সন্ধান জানতে পারব। তখনই সে গুরুর কাছে যায় এবং গুরুর কাছে গিয়ে উপদেশপ্রার্থী হয়।

যদি সংসারের কাজগুলো এরকম একটা ভাব নিয়ে করতে করতে—শুদ্ধ নিষ্কামকর্মের ফলশ্রুতিস্বরূপ চিত্তশুদ্ধির পথেই চলা যায়, তাহলে জপধ্যানের পক্ষে সেটা অনেক সহায়তা করে। না-হলে বাস্তবিক সমস্ত দিন যদি মন কেবলই ঘুরে বেড়াতে থাকে, তখন জপধ্যানের জন্য শুধু বসামাত্রই হয়, আর কিছু হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "তুমি যে-কথা বলছ সেটা ঠিকই। তবে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশ করতে পারা যায়।" অভ্যাস মানে হচ্ছে—সব সময় লেগে থাকতে হবে,—ভাল লাগে কিনা সেটা অত ভাবার দরকার নেই। প্রথমেই কারও ভাল লাগে না, কিন্তু নিয়মিত অভ্যাসের ফলে ক্রমে আনন্দ পাওয়া যায়। সকাল-সন্ধ্যাতে জপধ্যানের অভ্যাসটি রাখতে হবে এবং করতে করতে মন স্থির হবে, আর তখন জপধ্যানও ভাল লাগবে। গোড়াতে মনে হবে যে, এটা ভয়ঙ্কর নীরস এবং কোনই আনন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু ওষুধ-গেলার মতো নিয়ম করে অভ্যাসটি রাখতে হবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী আমাদের কাছে বলতেন, "যা বলেছি তিন-চার বছর করে যাও, তারপর যদি কিছু না হয়, তবে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করো।" তিন-চার বছরের মধ্যে কোনরকম প্রশ্ন করতে গেলে তিনি কিছুই শুনতেন না। অন্ততঃ তিন-চার বছর না-হলে ঠিক ঠিক তুমি এগোচ্ছ কিনা বোঝা যায় না। সেজন্য গোড়াতেই এ-সব প্রশ্ন করতে গেলে মহারাজ পছন্দ করতেন না।

এইভাবে কিছুদিন লেগে থাকলে তখন অভ্যাস পাকা হয়। অভ্যাস বরাবর করে যেতে হবে। আর বৈরাগ্য মানে—বিচার করে তোমার মনে কি কি বাসনা আছে সেগুলিকে খুঁজে বের করতে হবে এবং বিচারের সাহায্যেই সেগুলিকে আগে ত্যাগ করতে হবে, যেগুলি আমাদের মনকে চঞ্চল করে তোলে। একটা পুকুরে যদি খুব শান্ত স্থির জল থাকে, চাঁদের প্রতিবিম্ব (reflection) তাতে ঠিক ঠিক দেখতে পাওয়া যায়। আর যদি জলে একটা ঢিল ছুঁড়ে দেওয়া হয়, জলে তখন ঢেউ খেলতে থাকে। সেই ঢেউতে কিন্তু আর চাঁদ ভাল দেখতে পাওয়া যায় না। মনেতেও ঠিক তাই। আমাদের মনে যদি বাসনা থাকে এবং তলা থেকে নানা কামনার বুদ্‌বুদ্‌ উঠতে থাকে, তখন মন চঞ্চল হতে বাধ্য। ঐ অবস্থায় মনে তরঙ্গ খেলতে থাকে, আর তাতে নিজ ইষ্টকে ভাল করে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। বিচার করে করে বাসনা-কামনাগুলিকে ক্রমে ত্যাগ করতে পারলে মন শুদ্ধ হবে এবং ইষ্টকেও ভাল করে দেখতে পাওয়া যাবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য হচ্ছে দুই উপায়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলে গেছেন, মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রেও ঠিক তাই-ই বলা আছে, "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।" মনকে স্থির করতে গেলে এই দুটো উপায় ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

আবার আর-একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়,

—মনে নানারকম, কত কি চিন্তা আসে। জপধ্যান করতে বসলেই এমনও সব কথা মনে ওঠে, যেটা আমি আগে কখনও কল্পনাই করিনি! ব্যাপারটি হচ্ছে যে, জপধ্যানের সময়ে যখন আমাদের মন একটু স্থির হয়ে আসে, তখন যে-সব জিনিস আমাদের মনের নিচের স্তরে থাকে সেগুলি বুদ্‌বুদের মতো উপরে উঠতে থাকে। আর তখনই তো বুঝা যায়, আমাদের মনের ভিতরে কি কি সব জিনিস আছে। সেটা বুঝলেই পারা যাবে সেগুলিকে বিচার করে করে ত্যাগ করতে।

আর-একটা কথা হচ্ছে যে, আমরা মনকে Suggestions দিতে পারি। আমরা যদি মনকে ক্রমাগত বলতে থাকি—যেরকম Psychiatrist-রা করে থাকে, যেন অনেকটা সেরকম—মনকে Suggestions দিতে থাকি, তাহলে মন সেগুলিকে মেনে নেয়। যদি আমরা বিচার করে মনকে বারবার বুঝিয়ে বলি, "দেখ, ভগবানলাভ করলে, তাঁর চিন্তা করলে তুমি আনন্দ পাবে, সংসারের দুঃখকষ্ট থাকবে না"—তাহলে ক্রমে মন সেটা স্বীকার করে এবং কিছুটা শান্ত হয়। তাতে জপধ্যানের পক্ষে সুবিধা হয়। অন্য আর-এক উপায় আছে—মনকে খুব করে শাসিয়ে বলতে হয়, "এই সময় তুমি ওসব চিন্তা করতে পারবে না। এখন তোমাকে ভগবানের চিন্তা করতে হবে।" মনকে এইভাবে জোর করে শাসালে সে একটু শান্ত হবে। সুতরাং এরকমভাবে শাসন করে, অথবা Suggestions দিয়ে মনকে বারবার বলতে বলতে মনের এটা পাকা সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, বাস্তবিকই ভগবানের চিন্তাতে বেশ আনন্দলাভ হয়, তাহলে কেন আর অন্য সব চিন্তা করা? এই দুই উপায় দ্বারাও মনে যে-সব আজেবাজে চিন্তা আসে সেগুলিকে আস্তে আস্তে দূর করা যায়।

সাধনা একদিনের ব্যাপার নয়, সমস্ত জীবন-ভোর করে যেতে হবে। সব সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, মনের উপর নজর রাখতে হবে—মন কি করছে না করছে। আর যেই দেখব যে, মন একেবারে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে, তখন তাকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে হবে। এইভাবে সব সময়েই সতর্ক থাকলে সাধন-ভজনের বিঘ্ন দূর করা সম্ভবপর হবে।

The Practice of the presence of God নামে একটি ছোট বই আছে,—ব্রাদার লরেন্স বলে একজন খ্রীষ্টান সাধুর কথা ও তাঁর কিছু চিঠিপত্র। তিনি ষাট বছর রান্নাঘরের কাজ করেছিলেন, কিন্তু তিনি ভগবানলাভ করেছিলেন। তিনি কাজের মধ্যেও সব সময় ভগবানের চিন্তা করতেন। মনে মনেই তাঁর শরণাগত হয়ে সদাসর্বদা তাঁর চিন্তা করতেন—কাজের ঝামেলার মধ্যেও তাঁর মনটি থাকত একমাত্র ভগবানের দিকে। আমরাও যদি আমাদের সংসারের কাজকর্মের মধ্যে সর্বদা ভগবানের চিন্তাটি বজায় রাখার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদেরও বা সেইভাবে হবে না কেন? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন অর্জুনকে, "তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।"—তুমি সর্বদা আমার চিন্তা কর এবং লড়াইও কর। আমাদেরও সংসারের লড়াই চলবে, কিন্তু সব সময় মনকে রাখতে হবে ভগবানের 'শ্রীচরণে'। এইভাবে যদি আমরা চলি তাহলে জপ, ধ্যান, এবং একাগ্রতা প্রভৃতি যা কিছু আমাদের সাধনার বিষয়, তা সার্থক ও সফল হবে। ■

ধ্যান ঃ সকল যোগের পূর্ণতাসাধক

স্বামী প্রেমেশানন্দ

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কৃপাধন্য বিশিষ্ট সন্তান—শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের লোকান্তরিত মহনীয় সন্ন্যাসী।
এতাবৎ অপ্রকাশিত নিবন্ধটি শ্রুত-লিখিত।

॥ ১ ॥

মামবজীবনের বিবর্তনের শেষ সীমায় তাহার চিত্তে বিবেক নামক বুদ্ধির বিকাশ হয়, তখন সে অন্তর্জগতের তত্ত্ব জানিবার জন্য কৌতূহল অনুভব করে। সৌভাগ্যবশতঃ কেহ কেহ বৈদিক ধর্মের আত্মবিজ্ঞানের কথা জানিতে পারে। তাহার ফলে ক্রমেই তাহাব বুদ্ধিতে সৃষ্টির সমস্ত রহস্য ধবা পড়ে। কিন্তু এই সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে ও বুঝিতে পারিলেও এই জগৎ হইতে নিজেকে সরাইয়া পূর্ণত্ব লাভ করা সম্ভব হয় না। প্রায়শঃ দেখা যায়, যাহারা ব্রহ্মবিজ্ঞানের বিষয় সব কথা জানেন, তাঁহারাও দেহমনের বন্ধন হইতে মুক্ত নহেন। যাঁহারা নিদিধ্যাসন করিয়া 'আমি যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত' তাহা বোধে বোধ করেন, মাত্র তাঁহারাই জন্মমরণের হাত হইতে মুক্তিলাভ করেন। নিদিধ্যাসনই মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ উপায়, জ্ঞানবিচার নহে। তাই যোগের পথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন না হইলে জ্ঞান ব্যথ হয়।

আমরা দেখিয়াছি, ধীমান মহৎ তত্ত্বজ্ঞানীরাও ব্যবহারে বিজ্ঞানীর মতো চরিত্রবল প্রায়ই দেখাইতে পারেন না। বিচার করিতে করিতে অনেকেরই মাথা খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু যাহারা নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যোগাভ্যাস করিয়া চিত্তকে ব্রহ্মাভিমুখী করেন, তাঁহারা পূর্ণজ্ঞানলাভ না করিলেও তাঁহাদের জীবনে অপূর্ব মাধুর্যের বিকাশ হইয়া থাকে।

॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বহুজন্ম পুণ্যকার্য করিলে মানুষের চিত্ত শুদ্ধ হয়। তাহার ফলে শেষজন্মে সাধকের মনে ভগবানলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়। 'যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্'—ইত্যাদি।

ভগবানের উপর মনের টান থাকিলেও, ভগবানের সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত দেহমনের প্রবৃত্তি নিরোধ করিতে পারা যায় না। সাক্ষাৎকার করিতে হইলে ভগবানের সৌন্দর্য মাধুর্য এবং ঐশ্বর্য নিয়া মাতিয়া থাকিলে মন 'প্রত্যক্‌চেতনাভিমুখী' নাও হইতে পারে; সাধারণতঃ দেখা যায়, ভক্তরা ভগবানের সেবাপূজা মহিমাকীর্তন ও ঘোষণা নিয়া মাতিয়া থাকায়, মন অন্তরের দিকে বেশি দূর অগ্রসর হয় না। কখন কখন অভিমান বশে অভক্তকে অবহেলা অবজ্ঞা করা, অন্য মতাবলম্বীদিগকে ঘৃণা করা প্রভৃতি তুষ্কার্যে ভক্তের চিত্ত অতি নিম্নগামী হইয়া পড়ে; এইরূপে আরও নানাপ্রকার অসংখ্য বাধা ভক্তকে ভগবানলাভের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাই ভগবানের চিন্তায় তন্ময় হইতে না পারিলে ভক্তিসাধনায় সিদ্ধি সম্ভব নহে। ভক্তিসাধনার পথেও তাই নিদিধ্যাসনই শেষ ধাপ। 'ঈশ্বর প্রণিধান' ব্যতীত ভক্তিপথে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে।

॥ ৩ ॥

মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকেও যোগের সহায়করূপে পরিণত করা যায়। তাহা করিতে হইলে কর্মের ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও মনকে কর্মমুক্তির দিকে টানিয়া রাখিতে হয়। যদি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে মুক্তি যে আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা বুঝিতে পারি এবং সর্বদা ঐ মুক্তিরূপ আদর্শের দিকে মনকে টানিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে কর্মের মধ্যেও মনে 'মৃদু নিদিধ্যাসনের' ভাব

থাকিতে পারে। মৃদু বলিবার কারণ এই যে, কর্ম সুসম্পন্ন করিতে হইলে মনের অনেকখানি কর্মের দিকে দিতেই হইবে, তখন মনের একটি অংশে মাত্র মুক্তির চিন্তা অবস্থান করিবে।

কর্মযোগের একটি সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ আছে, বড়মানুষের বাড়ির ঝি! ঝিটি নিজ সংসার পরিচালনে অক্ষম বলিয়া বাধ্য হইয়াই বড়মানুষের বাড়িতে ঝিগিরি করিতে আসে। সে নিশ্চিত রূপে জানে তাহার একটি স্বগৃহ ও কয়েকটি স্বজন আছে, যাহাদের জন্য সে খাটিতেছে এবং বাবুর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইলেই তাহাকে তাড়াইয়া দিবে। অবশ্য আমরাও সত্যসত্যই নিজ নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া দেহমনের 'ঝিগিরি' করিতেছি বাধ্য হইয়া। কিন্তু আমরা তো তাহা জানি না, জানিলেও বুঝি না, বুঝিলেও স্বগৃহে প্রত্যাগমনের আকাঙ্ক্ষা মনে আনিতে পারি না।

সুতরাং বড়মানুষের বাড়ির ঝি হইতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একটি ভাওতামাত্র। জ্ঞানবিচার করিয়া আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত জানিলাম, ভগবানের সৌন্দর্য মাধুর্যে মুগ্ধ হইলাম, তথাপি দীর্ঘকাল নিরন্তর পরম শ্রদ্ধার সহিত নিদিধ্যাসন না করিলে ঐ পথে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। আর কর্মের মধ্যে মনকে ছড়াইয়া দিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়া কি যে দুরূহ ব্যাপার তাহা কি আর বলিতে হয়?

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বজ্রদৃঢ় দেহ ও মন যাহাদের ছিল সেই ক্ষত্রিয় রাজগণ ঐ কর্মযোগ সাধন করিতেন। সুতরাং কর্মযোগ অত্যন্ত কঠিন সাধনা। 'ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।'

তবে অনন্ত জীবনের কর্মের অভ্যাস সহসা পরিত্যাগ করা একান্ত অসম্ভব বলিয়া সর্ব যোগ সাধনারই আদিতে নিষ্কামতা অভ্যাস করিবার জন্য কর্ম করা অপরিহার্য। সেইজন্যই আমাদের মতন অনধিকারীদিগকে স্বামীজী এত কর্মের প্রেরণা দিয়াছেন। কিন্তু নিষ্কামকর্ম করিতে হইলেই কর্মের উদ্দেশ্য মুক্তির নিদিধ্যাসনা সম্বন্ধে সতত সচেতন থাকিতেই হইবে। কর্ম করিতে করিতে মনের টান ঐ দিকে তো থাকিবেই এবং 'ফুরসৎ' পাইলেই নিদিধ্যাসনে মনকে তুলিয়া রাখিতে হইবে—যেমন ছুটি পাইলেই ঝিটি বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হয়।

তাহা হইলে কর্মযোগেরও শেষ সোপান ধ্যানযোগ।

॥ ৪ ॥

অসাধারণ ধীমান, ভাবুক ও পরার্থপর ব্যক্তিরা জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের সহায়ে মুক্তিলাভ করিতে পারেন; কিন্তু এইরূপ অধিকারী জগতে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। আমাদের মতন সাধারণ লোকের পক্ষে অনেক সময়ই খুব ফলপ্রদ হয় না। কুস্তিগীরেরা ব্যায়াম করিয়া খুব আনন্দ পায়; ঠিক তেমনি বুদ্ধিমান লোকেরা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিয়া বুদ্ধিচর্চার আমোদ লাভ করেন। ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য সব দেশেই কত দার্শনিক পণ্ডিত রহিয়াছেন, যাহাদের চিন্তাপ্রণালী অত্যন্তই চিত্তাকর্ষক। আমরা উপন্যাস পড়িয়া যে আনন্দ পাই, মানসিক কসরৎকারীরা ঐ সব গ্রন্থপাঠে ঠিক তেমনই আনন্দ পাইয়া থাকেন। তবে অবশ্য বেদান্তমতে চিন্তা করিলে মন বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায় ঠিকই, কিন্তু মনকে স্বস্বরূপে তন্ময় না করিতে পারিলে মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই।

ভক্তিশাস্ত্রে যে প্রেম-প্রীতির কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহা তো উপন্যাসে লিখিত মানুষের প্রীতি-মিলন-বিরহের আকর্ষণেরই একটি উচ্চতর রূপ। খুব একটি সুন্দর মূর্তির প্রতি ভালবাসায় হাসা-কাঁদা, নাচা-গাওয়াতে খুব সুখ লাভ হয়। অনেক স্থলে ভগবানের সৌন্দর্য মাধুর্য কীর্তন করিতে করিতে বহু ভক্তের সমাধি (ভাব) হইতে

দেখা যায়। ইহাও একপ্রকার মানসিক কসরৎ।

যথারীতি সাধন সহায়ে দেহাত্মবুদ্ধি দূর না করিলে মুক্তি অসম্ভব। যুগাবতার পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণাশ্রিত ভবনাথ, ছোট নরেন প্রভৃতি অনেকের ভাব হইত, কিন্তু তাহাদিগকেও পরে যথারীতি সংসার করিতে হইয়াছিল।

মোট কথা যথারীতি যোগাভ্যাস করিয়া ধাপে ধাপে মনকে উপরে তুলিয়া চিদাকাশে লইয়া না গেলে বিষয়-বাসনা দূর হয় না। শ্রীগীতা 'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ' ইত্যাদি হইতে পরবর্তী শ্লোক পর্যন্ত দুইটি মন্ত্রে এই কথাই স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। তাহার সারমর্ম এই যে, নিজের বোধশক্তিকে দেহমন হইতে ঊর্ধ্বে তুলিয়া স্বস্বরূপ বোধ না হওয়া পর্যন্ত শান্তিলাভ অসম্ভব। জ্ঞানবিচারে মুক্তির স্বরূপ বুঝা যায়, ভক্তিতে মুক্তির স্বরূপ ঈশ্বরের চিন্তায় রুচি হয়, নিষ্কামকর্ম বুদ্ধিকে মার্জিত করিয়া দেয়;—কিন্তু ধ্যানযোগই সর্বশেষে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করিতে পারে। ধ্যানযোগের সহায়তা না নিলে পূর্বোক্ত যোগত্রয়ের ফললাভ সুদূর পরাহত। সকল যোগেরই তো এক সুর, জীবকে ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া, সুতরাং মুমুক্ষুর প্রথম হইতেই ধ্যানাভ্যাস একান্ত আবশ্যক।

॥ ৫ ॥

হিন্দুদের নিয়ম ছিল প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা জ্যোতির্ময় সূর্যকে ধ্যান করিবে। ৭।৮ বৎসর বয়স হইতেই তাহা শিখানো হইত, এখনও ব্রাহ্মণদের মধ্যে কচিৎ কেহ প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন। সেই জাপকদের মধ্যে কচিৎ কেহ এক-আধটু ধ্যানও অভ্যাস করিয়া থাকেন। ধ্যানকেই হিন্দুরা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ লাভের প্রধান উপায় বলিয়া জানিতেন। মনঃসংযোগ অভ্যাস না থাকিলে সংসারের সামান্য কাজও সুসম্পন্ন হয় না; বড় বড় সকল কাজেই বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন দেখা যায়।

ধ্যানযোগের অভ্যাস উঠিয়া যাওয়ার পর ঈশ্বরের নাম জপ প্রবর্তন করা হইয়াছিল, তাহাও ধ্যানেরই একটি নিম্নস্তর। জপেও সিদ্ধিলাভ করা যায়। ('স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতাসম্প্রয়োগঃ।' —পাতঞ্জল সূত্র)

কিছুদিন পূর্বে আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিতগণ কোন কাজ করিবার পূর্বে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার রীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা যোগেরই ঈষৎ আভাস।

যোগাভ্যাস তিরোহিত হওয়ায় হিন্দুজাতির সব দিকে অবনতি হইয়াছে। যে ব্যক্তি দিনে অন্ততঃ তিনবার মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া জগতের ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিতে পারে, তাহার জীবনে আত্মার অনন্ত মহিমার একটু না একটু প্রকাশ হওয়াই স্বাভাবিক। আমার পিছনে যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান বিশ্বাস না থাকিলে মানবজীবনের ঊর্ধ্বগতি হইবার তো কোন উপায় নাই।

জগতের সব রহস্য, ব্রহ্মের সব তত্ত্ব জানিলেও মানুষ তো দেহ মনের 'খোয়াড়' হইতে মুক্তি পাইবে না। তাই তো হিন্দুরা শিশুকাল হইতে ঊর্ধ্বে উঠিবার একমাত্র পথ ধ্যান বা নিদিধ্যাসন শিক্ষা দিতেন।

॥ ৬ ॥

নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে করিতে সংসারে বিরক্তি হইল, জ্ঞানবিচার করিতে করিতে সর্বপ্রকার উপাধিবর্জিত আমিই সত্য—জ্ঞেয় জানিলাম এবং জ্ঞাতৃস্বরূপ মিথ্যা বুঝিলাম। ব্রহ্মের অনন্ত সৌন্দর্য মাধুর্যের আকর্ষণে মুগ্ধ হইলাম; কিন্তু দেহমনের দাসত্ব ঘুচাইতে না পারায় পূর্ণ শান্তি তো পাইলাম না।

তখন মহর্ষি পতঞ্জলি আসিয়া একটি অত্যাশ্চর্য

সরল সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিলেন—যে রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে পূর্ণ শান্তি লাভ নিশ্চিত। তিনি বলিলেন, শরীর-মনকে যম-নিয়মের দ্বারা ধুইয়া মুছিয়া নির্মল কর; তাহার পর বাহিরের সকল কর্ম বন্ধ করিয়া আসন করিয়া বসিবে। উপবিষ্ট থাকিয়া প্রাণশক্তির সাহায্যে মনকে নিষ্ক্রিয় কর। অতঃপর বুদ্ধির মধ্যে যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ আছে, তাহা 'বোধ' করিয়া বসিয়া থাক। এইরূপ থাকিতে থাকিতে সৃষ্টির সমস্ত রহস্য তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে। সৃষ্টির সৌন্দর্য মাধুর্য এবং ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যখন সম্পূর্ণ উদাসীন হইবে, তখন সৃষ্টির অতীত গুণাতীত 'চিৎ' বস্তুকে অনুভব করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারিবে।

ইহাই অধ্যাত্ম বিদ্যালাভের শেষ ধাপ। দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়া বসিয়া গেলে শান্তি লাভ সুনিশ্চিত; শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের জীবন ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

॥ ৭ ॥

ধ্যানযোগের বিঘ্ন বিষয়ে বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনে উল্লেখ আছে। যেমন সংসারে দেখা যায়, যে যত শিক্ষিত হয়, ভাল ভাল ভোগ সম্বন্ধে সে তত সচেতন হয়। একটি অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক পরম তৃপ্তির সহিত ডাল ভাত খায়, কিন্তু শিক্ষিত বাবুর বহু উপকরণ না হইলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না। অধ্যাত্ম সাধনার ফলেও মানুষের রুচি বাড়িয়া থাকে এবং রুচি অনুযায়ী অনুভবও আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সব সাধকদের মধ্যে যাহারা নিষ্কামকর্ম করিয়া দেখিয়াছেন যে, কর্ম কখন শেষ হয় না; উপাসনা করিয়া দেখিয়াছেন ভগবানের উপর তীব্র ভালবাসা না থাকিলে মনকে জগৎ হইতে ঊর্ধ্বপথে চালাইতে সব সময় ইচ্ছা প্রবল থাকে না; জ্ঞানবিচার করিয়া দেখিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর তত্ত্ব জানিতে পারিলেও প্রাণে শান্তি হয় না; তাঁহারা সাধন পথের কোন বিঘ্নতেই বিচলিত হন না এবং পরমানন্দে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে করিতে পূর্ণ শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীমায়ের একটি কথা

স্বামী ধীরেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের অন্যতম প্রবীণ বিদগ্ধ সন্ন্যাসী।

শ্রীশ্রীমা একটি ত্যাগী ভক্ত সন্তানকে বলিতেছেন (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।২৮৬): "যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসনা যদি হতে পার এক্ষুণি হয়।"

সংসার-বন্ধন-মুক্তি বিষয়ে পুনঃ একটি স্ত্রীভক্তকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: "স্বামী বল, পুত্র বল, দেহ বল—সব মায়া। এই সব মায়ার বন্ধন কাটতে না পারলে পার পাওয়া যায় না। দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে। কিসের দেহ, মা, দেড় সের ছাই বইতো নয়? তার আবার গরব কিসের? যত বড় দেহখানাই হোক্ না, পুড়লে ঐ দেড় সের ছাই। তাকে আবার ভালবাসা! হরিবোল, হরিবোল…।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১।১১৬)

শ্রীশ্রীমায়ের কথাগুলি অতি প্রসন্ন, সরল, মধুর, মর্মস্পর্শী ও সাবলীল কিন্তু উহার তাৎপর্য অতি গম্ভীর। তাই এই বিষয়ে বেদান্ত কি বলেন আমরা তাহাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীশ্রীমার বাণী—"ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।" ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা অর্থ—তত্ত্ববিচার। তত্ত্ব অর্থাৎ (তৎ ও ত্বম্) পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপবিষয়ক বিচার।

বেদান্তের ঘোষণা—"বিচারাৎ জায়তে জ্ঞানম্, জ্ঞানাৎ মোক্ষমবাপ্যতে।"—তত্ত্ববিচার-প্রভাবেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষ-প্রাপক।—বেদান্তের এই কথাটিরই সমর্থন বা ইঙ্গিত মায়ের কথাতে পাওয়া যাইতেছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিয়াছেন: "মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে'—ভাল করে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, 'আমি' বলে কোন জিনিষ নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি—এর কোন্‌টা 'আমি'? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে 'আমি' বলে কিছু পাইনে। শেষে যা থাকে তাই আত্মা—চৈতন্য। 'আমার' 'আমিত্ব' দূর হলে ভগবান দেখা দেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ, ১১)।—ঠাকুরের এই উপদেশটিতেও আমরা দেহাত্মবুদ্ধিত্যাগের সুন্দর বিচারধারা লক্ষ্য করিতেছি। ইহাও বেদান্তোক্ত বিচারধারারই প্রতিধ্বনি—ইহা আমরা পরে লক্ষ্য করিব।

বিচারই বেদান্তের একমাত্র মুখ্য সাধন। বেদান্ত বলেন, দেহেতে আত্মত্ববুদ্ধিই সর্ব বন্ধনের, সংসার দুঃখের মূল। মায়াপ্রভাবে আমরা নিজ পারমার্থিক নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপটি ভুলিয়া নিজেকে দেহমনবুদ্ধিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন জীব বলিয়া নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছি ও সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছি—ইহাই আশ্চর্য!

শ্রুতি বলেন, যিনি নিজেকে অভয় ব্রহ্মরূপে জানেন তিনি অভয় ব্রহ্মরূপ-ই হইয়া যান। গুরু সম্প্রদায়বিদ্ শ্রুত্যেকশরণ আচার্যগণ ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, শ্রুতিনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা উপায় অবলম্বনেই বিচার সহায়ে জ্ঞানোদয়ে জীবের মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রুতির মুখ্য উপদেশ—'নেতি, নেতি'। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য পদার্থ আমরা গ্রহণ করিতেছি উহার কোনটিই সত্য নহে। সর্বদৃশ্যপ্রপঞ্চ এইরূপে নিষিদ্ধ হইয়া গেলে সর্বশেষে নিষেধের (বা বাধের) অযোগ্য যে বস্তু থাকেন তাহাই ব্রহ্ম। তাহাই স্বরূপতঃ তুমি।

এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি প্রথম ব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-আদি কল্পনা করিয়া আত্মাতে ক্রিয়া কারক ফলাদির অধ্যারোপ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আত্মা (জীব) পুণ্য-পাপাদিকর্মের কর্তা ও হস্তপাদাদিমান শরীরধারী, এইরূপ আরোপ করিয়া থাকেন। পুনঃ বিচার সহায়ে ঐ আরোপিত বিশেষতাসমূহ নিষেধ অর্থাৎ 'অপবাদ' করিয়া জীবকে শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। যেমন কাগজ, কালি, রেখা প্রভৃতি সহায়ে অক্ষরজ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু কাগজ, কালি কোনটাই অক্ষর নহে। তদ্রূপ জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-আদির মূল কারণ এক ব্রহ্ম ইহা বুঝাইয়া কল্পিত সর্ববিশেষতার নিবৃত্তির জন্য 'নেতি, নেতি'—এই উপদেশ সহায়ে সর্ববস্তুর অপবাদ করিয়া থাকেন।

এই 'অধ্যারোপ-অপবাদ'-রূপ প্রক্রিয়াই বেদান্তোক্ত সর্বপ্রক্রিয়া বা বিচারধারার মূল। ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধ উৎপাদন করাইবার জন্য এই 'অধ্যারোপ-অপবাদ' ভিন্ন অন্য কোন উপায় বা প্রক্রিয়া বেদান্তে নাই। আচার্য শংকরও স্বকৃত ভাষ্যাদিতে ইহা বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন।

বেদান্তমতে ব্রহ্ম নিত্যপ্রাপ্ত ও সর্ববিশেষণ-রহিত। সর্বাত্মা ব্রহ্ম কোন সাধনদ্বারা প্রাপ্য না হইলেও শ্রুতি তাহাতে প্রাপ্যত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। সিদ্ধবস্তু ব্রহ্ম নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও অজ্ঞানবশতঃ ভ্রমে উহা অপ্রাপ্তের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ভ্রম, জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন সাধনদ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে না। ভ্রম নিবৃত্ত হইলেই ব্রহ্ম যেন

পুনঃ প্রাপ্ত হন। এইরূপে ব্রহ্মের প্রাপ্যত্ব অধ্যারোপিত ও জ্ঞান ভিন্ন অন্য সাধনের অপবাদ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলা হয়, ইহারও তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছু জ্ঞেয় নাই। ব্রহ্মে জ্ঞেয়ত্বের আরোপ ও ব্রহ্মভিন্ন সর্বপদার্থের জ্ঞেয়ত্বের অপবাদ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মে সর্বকারণত্বও আরোপিত, উহাদ্বারা কার্যত্বের নিষেধ অভিপ্রেত। এইরূপে কারণত্বও নিষিদ্ধ হইলে অবশেষে সর্ববস্তুর স্বরূপ এক ব্রহ্মই অবশেষ থাকেন।

বেদান্তোক্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা বিচারধারার একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) **সামান্যবিশেষ প্রক্রিয়া**: বৃহদারণ্যক উপনিষদে দুন্দুভি (ভেরী), শংখ ও বীণার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। ঐ সকলে আঘাতজন্য সামান্যধ্বনি ও বিশেসধ্বনির ভেদ থাকিলেও সামান্যধ্বনি হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষধ্বনিকে গ্রহণ করা যায় না, কারণ সামান্যধ্বনি হইতে অতিরিক্ত কোন বিশেষধ্বনি হইতেই পারে না। শব্দ সামান্য ও বহুবিধ হইতে পারে। পুনঃ ঐ সকল শব্দসামান্য একটি শব্দ মহাসামান্য হইতে পৃথক্ নহে। রূপরসাদি বিষয়েও এরূপ্ বোদ্ধব্য। পরিশেষে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হয় যে, এক সৎসামান্য হইতে ভিন্ন অন্য কোন সামান্যবিশেষভাব হইতেই পারে না। সর্ববস্তুতেই এক সত্তা অনুগত। উহাই আত্মা। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে এক আত্মারূপ সত্তা সর্বত্র সমভাবে একরূপে বিদ্যমান। এইরূপে দেখা যায় বিশেষ সত্তা কল্পিত ও এক সত্তাসামান্যই সত্য। বিশেষ সত্তার অপবাদ দ্বারা স্থাপিত এক সত্তাসামান্যভাবও কল্পিত বা অধ্যারোপিত, কারণ সুষুপ্তি প্রলয়াদিকালে এক আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও উহাতে সত্তাসামান্যভাব বলিয়া কিছু থাকে না। অতএব সত্তাসামান্য বলিয়া কিছু বিশেষ বস্তু নাই। উহাও একটা অধ্যারোপ মাত্র। এক আত্মাই আছেন। চিদ্‌বস্তুব্যতিরিক্ত সামান্যবিশেষভাব বলিয়া কিছু নাই। সামান্যবিশেষভাবরহিত চিদাত্মাতে বুদ্ধির প্রবেশ করাইবার জন্যই এই সামান্যবিশেষভাবের কল্পনা। ইহা 'অধ্যারোপ-অপবাদ' প্রক্রিয়ার একটি অবান্তর ভেদ, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

(খ) **দৃগ্‌দৃশ্যবিচার প্রক্রিয়া**: দৃশ্যত্ব নিষেধ করিবার জন্য আত্মাতে দ্রষ্টৃত্ব আরোপিত হয়। ইহাও দ্বৈতরাহিত্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যে একটি উপায় মাত্র। দ্রষ্টৃত্ব ব্রহ্মবোধ উৎপাদনের একটি উপায়। ব্রহ্মই একমাত্র দ্রষ্টা, ইহা জানা সুগম। ইহাও একটি অধ্যারোপ। সর্বশেষে এই আরোপিত দ্রষ্টৃত্বও নিষিদ্ধ হইয়া এক দৃগ্‌-মাত্র চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই অবশেষ থাকেন।

ইন্দ্রিয়াদি সহায়ে বাহ্যবিষয়সমূহ আমরা অনুভব করিয়া থাকি। এ স্থলে চেতন জীব দ্রষ্টা ও জড় বিষয় দৃশ্য। বিচার দ্বারা দৃশ্য বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া দ্রষ্টার স্বরূপ নির্ণয় করাকেই 'দৃগ্‌-দৃশ্যবিবেক' নামে বলা হইয়া থাকে। দ্রষ্টা সর্বদা 'অহং' বা 'আমি'—এই বোধের বিষয়, আর দৃশ্য 'ইদং' বা 'ইহা'—এইরূপ অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। দ্রষ্টা কখনও 'ইদং' অর্থাৎ দৃশ্যকোটির অন্তর্ভুক্ত হন না। যদি দ্রষ্টা কখনও দৃশ্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাহা গৌণ বা মিথ্যা দ্রষ্টা। যেমন বলা হয় যে, রাজা চররূপ চক্ষুদ্বারা দর্শন করেন। এখানে বস্তুতঃ চরই সব দর্শন করে। রাজার দ্রষ্টৃত্ব এস্থলে গৌণ, মুখ্য নহে। দেহেন্দ্রিয়াদি দর্শন করে, এখানে দেহেন্দ্রিয়াদির দ্রষ্টৃত্ব মিথ্যা, গৌণ নহে। দেহেন্দ্রিয়াদি সর্বথা দ্রষ্টা নহে। দ্রষ্টা হলেন চেতন আত্মা। দেহেন্দ্রিয়াদি জড়, উহারা দ্রষ্টা হইতে পারে না। চৈতন্যস্বরূপ আত্মার স্বভাবভূত জ্ঞান বা দৃষ্টিই

পারমার্থিক দ্রষ্টৃত্ব। লৌকিক ঘটপটাদির জ্ঞানরূপ দৃষ্টি অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপা বলিয়া উহা অনিত্য। বিষয়াকারা বৃত্তি উৎপন্ন হইলেই চৈতন্য ব্যাপ্ত হইয়া উহাতে চিদাভাস উৎপন্ন হওয়াতে সকলে উহাকেই জ্ঞান বা দৃষ্টি বলিয়া থাকে। অন্তঃকরণবৃত্তির আরোপের অপেক্ষাতেই লৌকিক দ্রষ্টৃত্ব হইয়া থাকে। দেহমন ইন্দ্রিয়াদিতে অভিমানবশতই আত্মচৈতন্যে প্রমাতৃত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব আরোপ হয়। লৌকিক দ্রষ্টা সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাতে থাকে না। তখন জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটী বিভাগরহিত সর্বব্যবহারাতীত এক জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন। উহাই পরমাত্মার অলুপ্তদ্রষ্টৃত্ব। এই জ্ঞান হইলে দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্যরূপ বিভাগ অপবাদ অর্থাৎ নিরাকরণ হইয়া যায়। জাগ্রৎ স্বপ্নে এক চৈতন্যজ্যোতিকেই উপাধিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি বা জ্ঞান বলা হয় মাত্র। উহা আত্মার পরিচ্ছিন্ন রূপ, মিথ্যারূপ, কারণ উহা ঔপাধিক। ভিন্ন ভিন্ন উপাধিবশতই আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ ও কর্মের আরোপ হইয়া থাকে। কেবল জ্ঞপ্তি বা নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই পারমার্থিক দ্রষ্টা।

(গ) **পঞ্চকোশবিচার প্রক্রিয়া** : উপনিষদে পঞ্চকোশবিচারের বিষয় বলা হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়াদি কোশে ক্রমশঃ আত্মত্ব অধ্যারোপ করিয়া পূর্বপূর্ব কোশের আত্মত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। এইরূপে বুঝানো হইয়াছে যে, আত্মা পঞ্চকোশাতীত ও সর্বদ্বৈতকল্পনারহিত। যথা : তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান, অনন্ত—এইরূপ লক্ষণ বর্ণন করিয়া তৎপর বলিয়াছেন যে,এই ব্রহ্মকে বুদ্ধিরূপ গুহাতে জানিতে হইবে। তদনন্তর ব্রহ্ম হইতে আকাশাদিক্রমে জগৎ ও দেহাদি সৃষ্টির বর্ণনা করিয়াছেন। অন্ন হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভৌতিক দেহকে অন্নরসময় বা অন্নময় কোশ বলা হইয়াছে। সাধারণ লোকে এই দেহকেই আত্মা বলিয়া জানেন।

এই আরোপের অনুবাদপূর্বকই শ্রুতি বলেন যে, ইহা আত্মা নহে। ইহা হইতে ভিন্ন ও আন্তর প্রাণময় কোশই আত্মা। এইরূপে অন্নময় কোশে গৃহীত স্বাভাবিক আত্মবুদ্ধি প্রাণময়ে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশরূপ আত্মা বর্ণন করিযা সর্বশেষে উহার পুচ্ছরূপ ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়াছেন ও উহাই সর্বান্তর আত্মা এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। বিচার্য এই যে, পুরুষের পাঁচটি আত্মা হয় না। বহিরঙ্গ কোশে আত্মবুদ্ধিকে, অন্তরঙ্গ কোশে ও সর্বশেষে সর্বান্তরতম ব্রহ্মে জীবকে পরিনিষ্ঠিত করাই এখানে শ্রুতির তাৎপর্য। এই প্রক্রিয়ায় উত্তর উত্তর কোশে আত্মবুদ্ধি আরোপ করতঃ পূর্বপূর্ব কোশের আত্মত্ববুদ্ধি অপবাদ করা হইয়াছে। সর্বশেষে এক ব্রহ্মেই আত্মবুদ্ধি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হওয়ায় এই পঞ্চকোশবিচারও ব্রহ্মাবগতির একটি উপায় বা প্রক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

আমরা দেখিয়াছি শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন : "দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীতেও আমরা এই কথাই লক্ষ্য করিয়াছি। উভয়বিধ বাণীতেই শ্রুত্যুক্ত 'পঞ্চকোশবিচারের' কথাই স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর কথিত স্থূলদেহ বা অন্নময়কোশ এই স্থলে পঞ্চকোশের উপলক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে।

(ঘ) **অবস্থাত্রয়বিচার প্রক্রিয়া** : জীবের তিনটি অবস্থা প্রসিদ্ধ,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। স্বপ্ন ও জাগ্রতে দর্শনাদি ক্রিয়া হয়, কিন্তু সুষুপ্তিতে তাহা হয় না। চৈতন্যরূপ আত্মার আশ্রয়েই এই তিন অবস্থার সত্তা ও প্রতীতি হইয়া থাকে। অবস্থাসমূহ পরিবর্তনশীল। কিন্তু অবস্থাগত ধর্ম হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্ ও উহাদের সহিত অসংবদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সর্বাবস্থাতে অনুগত

থাকেন। আত্মচৈতন্য বিনা উক্ত অবস্থাত্রয়ের ও তাৎকালিন প্রপঞ্চের উপলব্ধিই হইতে পারে না। অতএব এক আত্মাই সত্য তদ্ভিন্ন অবস্থাদি সব মিথ্যা। সুষুপ্তিতে জীব পরমাত্মাসহ একীভূত হইয়া অবস্থান করে। সুতরাং এক নিষ্প্রপঞ্চ সৎস্বরূপ আত্মাই জীবের যথার্থ স্বরূপ—ইহা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায়।

জ্ঞানস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্নরূপে স্বপ্ন বা জাগ্রতের কোন পদার্থের অনুভবই হইতে পারে না। ঐ সকল বস্তুসমূহ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। উহা জ্ঞানস্বরূপই। সুষুপ্তিকালে জীব সৎসহ এক হইয়া যায়। ঐকালে স্ব-লীন হইয়া যায় বলিয়াই ঐ অবস্থার নাম 'স্বপিতি'। যদিও সর্বাবস্থাতে আত্মা নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপেই অবস্থান করেন, তথাপি অবস্থাসমূহ পরস্পর একে অপরটিতে থাকে না। এজন্যই অবস্থানগুলি রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় মিথ্যা আর জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সর্বাবস্থাতে অব্যভিচরিতরূপে বিদ্যমান থাকেন বলিয়া সত্য।

স্বপ্নে কল্পিত দেহাদিতে ও জাগ্রদবস্থাতে স্থূল দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানী বলিয়া জীবের প্রমাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব প্রতীত হয়। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতে ঐ অভিমান না থাকাবশতঃ প্রমাতৃত্বও থাকে না। এজন্যই শ্রুতি বলেন যে, সুষুপ্তিকালে জীব আপনস্বরূপে লয় হইয়া যায়। স্বরূপ হইতে বিচ্যুতি কাহারও হইতে পারে না। অতএব স্বপ্ন ও জাগ্রতের প্রমাতৃত্ব একটা আভাস বা প্রতীতিমাত্র। স্বপ্নাবস্থার প্রমাতৃত্ব যে একটা মিথ্যা প্রতীতিমাত্র এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ। ইহা সর্বসম্মত যে, স্বপ্নাবস্থায় শরীর ইন্দ্রিয়াদিসহ আত্মার কোন বাস্তব সম্বন্ধ হয় না। তথাপি জাগ্রতের ন্যায় সে অবস্থায় জীবের শ্রোতৃত্ব, জ্ঞাতৃত্বাদি সবই প্রতিভাত হয়। অতএব স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রতের প্রমাতৃত্বাদিও মিথ্যা উপাধিকৃত। উভয় অবস্থাই সর্বতোভাবে তুল্য। স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্ন জাগ্রতের মতোই মনে হয়।

সুষুপ্তিতে জীব সদাত্মাসহ এক হইয়া যায়—এই শ্রুতি জীবের স্বাভাবিক অবস্থাবোধক। জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে অবিদ্যাকল্পিত প্রমাতৃত্ব ও অন্যরূপপ্রাপ্তি মিথ্যা। ইহার সহিত তুলনা করিয়াই সুষুপ্তিতে স্বরূপপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। এই জন্যই এই স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি ও পররূপ প্রাপ্তির কথা 'অধ্যারোপ-অপবাদ' প্রক্রিয়ার অনুসারেই বলা হয়। উহার উদ্দেশ্য ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধ উৎপাদন ছাড়া আর কিছুই নহে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় উপাধিসম্বন্ধবশতঃ আত্মার যেন পররূপপ্রাপ্তি হয়। উহার অপেক্ষাতেই সুষুপ্তিতে স্বরূপপ্রাপ্তি বলা হয় মাত্র, কারণ এই অবস্থাতে আত্মার কোন উপাধিসম্পর্ক থাকে না। বস্তুতঃ সর্বাবস্থাতেই আত্মা স্বরূপতঃ নিরুপাধিক নির্বিশেষ চৈতন্যরূপেই বিদ্যমান থাকেন। স্বপ্নে দেহেন্দ্রিয়াদি কিছু না থাকিলেও মুহূর্তমধ্যে যেমন কল্পিত দেহেন্দ্রিয়াদি ও তজ্জনিত ব্যবহারাদি অনুভব হইয়া থাকে, জাগ্রতেও তদ্রূপ।

অবস্থাত্রয়-প্রক্রিয়া সহায়ে বিচার দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, আত্মা সর্ব অবস্থা হইতে বিলক্ষণ বা পৃথক্। এই পৃথকত্বকেই তুরীয় বলা হয়। তুরীয় কোন অবস্থাবিশেষ বা অজ্ঞাত বস্তুবিশেষ নহে। অবস্থাত্রয় হইতে পৃথকত্বই আত্মার তুরীয়ত্ব। তিন অবস্থার বর্ণন, এই তিন অবস্থাসহ আত্মার মায়িক সম্বন্ধজ্ঞাপন (ইহাই অধ্যারোপ) ও পুনঃ উহার নিষেধ (অপবাদ) দ্বারা ঐ সমূহ অবস্থার অতীত সর্ব অবস্থাবিহীন আত্মার প্রতিপাদন উদ্দেশ্যেই করা হইয়া থাকে।

এইরূপে দেখা যায়, শ্রুতি নানা উপায়ে ব্রহ্মস্বরূপ অববোধ করাইবার উদ্দেশ্যে প্রথম দেহেন্দ্রিয়াদি যাবতীয় দৃশ্যপ্রপঞ্চ অধ্যারোপ

করিয়া তৎপর উহার অপবাদ (নিরসন বা নিষেধ অর্থাৎ মিথ্যাত্ব) প্রতিপাদন করিতেছেন। এই প্রক্রিয়াসমূহের যে কোন একটির বিচার করিলে অবশেষে বুদ্ধি সর্বপদার্থের অভাবদ্বারা উপলক্ষিত একমাত্র শুদ্ধ-প্রকাশ, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপেই থাকিয়া যায়। 'অধ্যারোপ-অপবাদ' প্রক্রিয়া ব্যতীত ব্রহ্মাববোধের আর অন্য কোন উপায় নাই।

দেহাত্মবুদ্ধির ত্যাজ্যতা অর্থাৎ অপবাদ ঘোষণা করিয়া শ্রীশ্রীমা বেদান্তোক্ত 'অধ্যারোপ-অপবাদ' রূপ প্রক্রিয়ার কথাই সাক্ষাৎ ব্যক্ত করিলেন না কি? শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীতেও আমরা উহাই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম সকলের আত্মা। উহা সদা অপরোক্ষ স্বভাব হইলেও অবিদ্যাবশতঃ জীবের নিকট আচ্ছাদিত বা ব্যবহিত হইয়া আছে। এই অবিদ্যানিবৃত্তির একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ নিজেকে ব্রহ্মরূপে জানা। ইহাই তত্ত্বজ্ঞান—যাহার বিষয় প্রারম্ভে শ্রীশ্রীমার কথায় উল্লেখ করা হইয়াছে। জীবের স্বরূপ-বিস্মরণকারী অবিদ্যার নাশ করিবার আর অন্য কোন সাধন বা উপায় নাই। তত্ত্ববিচারই এই জ্ঞানলাভ করিবার একমাত্র সাধন।

কিন্তু যাহাদের চিত্ত বিষয়-ভোগবাসনার দ্বারা কলুষিত, তাহাদের পক্ষে বেদান্তের এই শুদ্ধ বিচারমার্গ পর্যাপ্ত নহে। বিচারের গভীর প্রদেশে তাহাদের মন প্রবেশই করিবে না। তাই তাহাদের চিত্তশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ চিত্তকে প্রত্যগাত্মাভিমুখী করিবার জন্য নিষ্কামকর্ম, বিবিধ উপাসনা, যোগাভ্যাসাদি নানা উপায় শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে। দুশ্চরিত্র, দুষ্ট আচরণ হইতে নিবৃত্ত না হইলে ধর্মলাভ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানলাভ সে ব্যক্তির পক্ষে শুধু সুদূরপরাহত নহে, একান্ত অসম্ভব।—"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ"—শুদ্ধ আচরণবিহীন পুরুষের কখনও জ্ঞানলাভ হয় না। 'কঠ' উপনিষদ্‌ও এই কথাই বলিয়াছেন: "নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ···।" (১।২।২৩)

অন্তঃকরণের মল, বিক্ষেপ ও আবরণ এই ত্রিবিধ দোষের জন্যই তত্ত্ববিচারে মন নিবিষ্ট হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ও হয় না। মল (পাপাদি ও বিষয়-ভোগবাসনার সংস্কার), বিক্ষেপ (বিষয়চিন্তাজনিত চাঞ্চল্য) ও আবরণ (অজ্ঞান) এই তিনটিই প্রধান প্রতিবন্ধক। মলবিক্ষেপরহিত শুধু আবরণমাত্রাবশিষ্ট সাধকই বেদান্তোক্ত বিচারমার্গের অধিকারী।

নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানে যাহার চিত্ত মলদোষরহিত হইয়া কথঞ্চিৎ শুদ্ধ ও অন্তর্মুখ হইয়াছে, তাহারই উপাসনাতে অধিকার, কারণ উপাসনা মানস-সাধনা। বিষয়বিক্ষিপ্ত চিত্ত দ্বারা উপাসনা হয় না। কথঞ্চিৎ শুদ্ধচিত্ত ও অন্তর্মুখ পুরুষের পক্ষেই উপাসনা সম্ভবপর। উপাসনা দ্বারা বিক্ষেপ দূর হইয়া চিত্ত একাগ্র হইয়া থাকে। একাগ্রচিত্ত পুরুষই বেদান্তবিচারসমর্থ। ঐরূপ অন্তর্মুখ সাধকের জন্য শ্রুত্যুক্ত শমদমাদি (মুণ্ডক উপনিষদ্, ১।২।১৩) ও স্মৃত্যুক্ত অমানিত্বাদি (গীতা, ১৩।৭—১১) তত্ত্বজ্ঞানের সাধনরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ সাধন। নিষ্কামকর্ম বাহ্য প্রতিবন্ধক দূর করে মাত্র। শুদ্ধচিত্ত সাধকের পক্ষে শমদমাদি সাধন অতি সুলভ। পূর্বজন্মানুষ্ঠিত নিষ্কাম-কর্মাদির দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষের আর বর্তমান জন্মে নিষ্কামকর্মাদি অবশ্য অনুষ্ঠেয় নহে। কর্ম জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক বলিয়া পরম্পরাক্রমে মোক্ষের সাধন।

উত্তমাধিকারীর উপদেশবাক্য শ্রবণমাত্রই জ্ঞান ও কৃতার্থতা হইয়া থাকে। তাহার আর কোন কর্তব্য অবশেষ থাকে না। একবার বেদান্তবাক্য শ্রবণমাত্র যাহার বাক্যার্থানুভব হয়

না, তাহার পুনঃ পুনঃ বাক্যশ্রবণ ও চিত্তগত সংশয়াদিদোষ দূর করিবার জন্য মনন অর্থাৎ তত্ত্বানুকূল বিচার প্রয়োজন, যে পর্যন্ত জ্ঞানোদয় না হয়। মন্দপ্রজ্ঞ অধিকারীর এইরূপ অভ্যাসবলেই জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়টিই শ্রীশ্রীমা সুন্দর দৃষ্টান্ত সহায়ে বলিয়াছেন: "যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে সুগন্ধ বের হয়, তেমনি তত্ত্ববিচার করতে করতেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।"

শ্রবণ ও মনন দ্বারা তত্ত্বানুভবে অসমর্থ পুরুষের নিদিধ্যাসন প্রয়োজন। শমদম, অমানিত্বাদি শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত সাধন সকলের অভ্যাস যাবজ্জীবন প্রয়োজন, কারণ উহা দ্বারা জ্ঞান পরিপক্ক হইয়া থাকে। সদা আত্মৈকপরতাই জ্ঞাননিষ্ঠার লক্ষণ। জ্ঞানমার্গে নিদিধ্যাসন অর্থ অন্য বস্তু হইতে মনকে ব্যাবৃত্ত করিয়া বস্তুদর্শনার্থ প্রযত্নমাত্র। উহা যোগশাস্ত্রসম্মত ধ্যান নহে। রত্নপরীক্ষক যেমন বারবার রত্ন নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, নিদিধ্যাসনাভ্যাসীও তদ্রূপ বস্তুতত্ত্বনিশ্চয়ার্থ একাগ্রতাসহকারে বস্তুতেই চিত্ত স্থাপিত করিয়া বস্তুনিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। বস্তুবিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া যাওয়ার নামই জ্ঞান। জ্ঞানোৎপত্তির পর আর কোন কর্তব্য অবশেষ থাকে না। তখনই জীবের পরমানন্দস্বরূপপ্রাপ্তি বা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হইয়া থাকে। রোগী দুঃখী জীব যেরূপ রোগনিবৃত্তির পর স্বস্থতা অনুভব করে তদ্রূপ দুঃখদ দ্বৈতপ্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইলে অর্থাৎ উহা একান্ত মিথ্যা একটা সত্তাহীন প্রতীতিমাত্র ইহা নিশ্চিত হইলে জীবের দেহাধ্যাসমূলক যাবতীয় সংসারদুঃখ চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই জ্ঞানের প্রয়োজন। তখন জীব জানে যে তাহার দুঃখ কোনকালেই ছিল না। ভ্রান্তিবশতই সে এতকাল নিজেকে দুঃখী, কর্তা, ভোক্তা মনে করিয়া নিজের যথার্থ পরমানন্দস্বরূপটি ভুলিয়া ছিল। এরূপ অবস্থাকেই স্বরূপাবস্থান বা পরপ্রাপ্তি বা ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয়।

এই অপূর্ব স্থিতির বিষয়টিই শ্রীশ্রীমা তাঁহার কথার শেষে ব্যক্ত করিলেন "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া। অর্থাৎ প্রলয়ে যিনি সর্বজগতের হরণ বা উপসংহার নিজেতে করিয়া থাকেন, কার্যপ্রপঞ্চের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের সেই একমাত্র কারণ হরি বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, আর সব মিথ্যা। এই সত্য বস্তু ব্রহ্মকে জানা ও তাঁহাতে স্থিতিই জীবের একমাত্র কাম্য। এত সাধের নিজ দেহটিও কতকগুলি ছাই ছাড়া আর কিছুই নয়। লৌকিক ব্যবহারে ছাই শব্দ তুচ্ছতা বা অভাববোধক। শ্রীশ্রীমা তাহাই ইঙ্গিত করিলেন যে, দেহাদি সর্বপদার্থ একান্তই মিথ্যা, উহা বস্তুতঃ নাই। উহা মরুমরীচিকা, স্বাপ্নপদার্থ বা ভ্রান্তিদৃষ্ট রজ্জুসর্পের ন্যায় একটা সত্তাবিহীন প্রতীতিমাত্র।

তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ পূর্ব ভ্রান্তিজ্ঞানের অনুবর্তন হইলেও অর্থাৎ তিনি পূর্ববৎ আমি সুখী, আমি দুঃখী এরূপ ব্যবহার করিলেও তাহা দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের কোন হানি হয় না। লোককল্যাণার্থ কর্ম করিলেও তাঁহার কোন কর্মবন্ধন হয় না। মুমুক্ষুদের উপদেশাদি প্রদান কালেও তাঁহার কোন বাস্তবিক কর্তৃত্ববুদ্ধি থাকে না। ইহাই জীবন্মুক্তের স্থিতি। জীবন্মুক্ত জ্ঞানী শরীরে বিদ্যমান থাকিয়াও বস্তুতঃ অশরীরী, কারণ তাঁহার দেহে আত্মবুদ্ধি নাই। দেহাত্মবুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া তিনি এখন অমৃতস্বরূপ। তাই শ্রীশ্রীমা বলিলেন:

"দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে।" "কিসের দেহ মা! দেড় সের ছাই বই তো নয়?—তার আবার গরব কিসের? যত বড় দেহখানাই হোক্ না, পুড়লে ঐ দেড় সের ছাই। তাকে আবার ভালবাসা! হরিবোল, হরিবোল…।" এক হরি বা সর্বকারণ ব্রহ্মই চিন্তনীয়। তাঁর কথাই বলা, তাঁকে জানাই কর্তব্য। তাহা হইলেই মানবজীবন সার্থক হইবে, জীবন মধুময় হইবে। ইহাই শ্রীশ্রীমায়ের কথার অভিপ্রায়।

প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে যুবমানসে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রভাব

ডক্টর শিশির কর

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও শিশু-সাহিত্যিক—আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তাবিভাগের সহসম্পাদক। প্রবন্ধটি উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে লেখক কর্তৃক পঠিত (তারিখ, ৬ এপ্রিল, ১৯৮৫)।

গোড়ার কথা: জাতীয়তার স্রষ্টা বিবেকানন্দ : স্বামী বিবেকানন্দ একবার (১৮৯৯) নাগ মহাশয়কে (শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তশ্রেষ্ঠ দুর্গাচরণ নাগ) বলেছিলেন: "আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই, শব্দ নেই। সনাতন ধর্মভাবে একে কোনরূপে জাগাতে পারলে বুঝব ঠাকুরের ও আমার আসা সার্থক হল। কেবল ঐ ইচ্ছাটা আছে—মুক্তি-ফুক্তি তুচ্ছ বোধ হয়েছে।" [যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০৭]

স্বামীজী চেয়েছিলেন দেশবাসীকে জাগাতে, বিশেষ করে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে দেশপ্রেমে। তাদের মধ্যে রুদ্রের প্রকাশ হোক—এই ছিল তাঁর কামনা। রুদ্রস্তুতিটি স্বামীজীর তাই খুব প্রিয় ছিল। তিনি প্রায়ই তা আবৃত্তি করতেন।

আদর্শভ্রষ্ট ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে মত্ত তাঁর দেশের যুবকদের উদ্দেশে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন: "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?…"

স্বামীজীর প্রভাব কীভাবে যুবকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদা জাগিয়ে তুলেছিল, সেকথা আছে অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' বইয়ে: "বিবেকানন্দ তারপর ভারতবর্ষে এলেন, সশরীরে নয়, সংবাদের রথে চড়ে—এবং ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত কাঁপতে লাগল সেই বার্তা-শিহরণে। ঐ সংবাদগুলি পরাধীন পতিত ভারতবর্ষকে তার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিল—আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস। ভারতবর্ষে তখন দেশনেতা বা সমাজসংস্কারকের অভাব ছিল না; ভারতীয় সমাজের দোষের চেহারাটা দেশী-বিদেশী সকলের কল্যাণে বে-আব্রু হয়ে পড়েছিল পুরোপুরি, রোগের নিদান কাগজপত্রে লিখিত হয়ে, বক্তৃতামঞ্চে কথিত হয়ে, ভারতভূমিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল—আত্মাবমাননার সেই বিপুল আয়োজনের মধ্যে নির্বাসিত মর্যাদাকে নিজের মধ্যে আহ্বান করে বিবেকানন্দ যেন ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ'—জাতিপ্রাণ সহর্ষে তখন সাড়া দিয়েছিল, বন্দনা গেয়েছিল সেই মানুষটির যিনি লজ্জিত করতে আসেন নি, উদ্বুদ্ধ করতে এসেছেন, ক্ষুণ্ণ করতে আসেন নি, এসেছেন পূর্ণ করতে।" [বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮]

এদেশের যুবচিত্তকে স্বামীজী কীভাবে জাগিয়েছিলেন, সেকথা লিখেছেন তাঁর সমকালীন রবীন্দ্রনাথও: "আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের

মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি,—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে··· ।" [বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৭৯/রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড]

স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে নিবেদিতার তো অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। 'বিবেকানন্দের কাজ হিসাবেই তিনি রাজনীতি গ্রহণ করেন।'

বিবেকানন্দের প্রভাব সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রবেশ করেছে ভারতের মর্মকেন্দ্রে, বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের এই মন্তব্য। তিনি বলেছিলেন : বিবেকানন্দের প্রভাব এখনও বিপুলভাবে কাজ করছে আমরা দেখতে পাই···যা এমন কিছু, যা সিংহপ্রতিম, বিরাট, সম্বোধিদীপ্ত, যা সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রবেশ করেছে ভারতের মর্মকেন্দ্রে এবং তা দেখে আমরা সোচ্ছ্বাসে বলে উঠি, ঐ দেখ, বিবেকানন্দ এখনো জেগে মাতৃমর্মে, মাতৃ-সন্তানদের মর্মলোকে। [বিবেকবাণী, পৃঃ ১৬৬]

মনীষী ও ঐতিহাসিকদের মন্তব্য : বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্বাধীনতাসংগ্রামীদের লেখা ও মন্তব্য থেকে প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে তরুণদের উপর স্বামীজীর কী বিপুল প্রভাব, তার অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে ব্রিটিশ আমলা ও গোয়েন্দাদের নানা মন্তব্য ও উক্তিতেও। কখন গোপন মন্তব্য বা কখন প্রকাশ্য প্রতিবেদন।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন : "As a student in one of the classes, in Matriculation or so, the letters of Sri Vivekananda used to be circulated in manuscript form among us all. The kind of thrill which we enjoyed, the kind of mesmeric touch that those writings gave us etc.···" [বিশ্ব-বিবেক, সম্পাদনা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শংকর ; পৃঃ আট (গ্রন্থপঞ্জী)]

দেখা যাচ্ছে, প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে স্বামীজীর বাণী হাতে লিখে ইস্তাহারের মতো যুবকদের মধ্যে বিলি করা হত। স্বামীজীর কর্মযোগ, ভারতীয় পত্রাবলী, মুক্তিসংগ্রামীদের কাছে অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। স্বামীজীর লেখার প্রভাব কী তীব্র ছিল, সেকথা লিখেছেন স্বাধীনতাসংগ্রামের একাধিক ইতিহাসকার : "···বিপ্লবের যুগে পুলিশ যেখানেই বিপ্লবীদের বাসা তল্লাস করিয়াছেন সেইখানেই বিবেকানন্দের গ্রন্থরাজি দেখিতে পাইয়াছিলেন। শেষ ও শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রও বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর একান্ত অনুরক্ত পাঠক ছিলেন।" [বিশ্ববিবেক, পৃঃ ২৫৮]

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ ও ঐতিহাসিক বিমান-বিহারী মজুমদারের ওই মন্তব্য, তিনি তাঁর Militant Nationalism in India বইয়ে লিখেছেন : "In every gymnasium, i.e, exercise cult of the Revolutionary party of Bengal, His work entitled, 'From Colombo to Almora' was read." সমকালে ও পরবর্তী অনেক ঐতিহাসিক তরুণদের উপর স্বামীজীর প্রভাবের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন, মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসকার এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা কালীচরণ ঘোষ তাঁর The

Roll of Honour গ্রন্থে লিখেছেন: "Swamiji's message influenced the minds of young Bengalee with a spirit of burning patriotism and created in some a tendency for stern political activity.··· "[The Roll of Honour, p 30]

স্বামীজী যুবকদের বলেছিলেন, মাতৃভূমির সেবায় আত্মনিয়োগে ও দেশের স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হতে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর History and Culture of Indian people গ্রন্থে একথা লিখেছেন: "বিবেকানন্দ ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে পাঁচস্তর প্রস্তরের উপর স্থাপন করেছিলেন। যথা—রাজনৈতিক মুক্তির জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা, অতীত গৌরব ও ভারতের মহত্বের জন্য গৌরববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শে ভারতের ঐক্য, গণজাগরণ এবং শারীরিক শক্তি ও শৌর্যের বিকাশ। একদল যুবককে, যাঁরা তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশ ও আশীর্বাদ চেয়েছিলেন, তিনি বলেন, আমার জীবনের মিশন হচ্ছে মানুষ তৈরি। আমার মিশন তোমরা কাজে ও বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা কর। মাতৃভূমির সেবাই হবে তোমাদের কর্তব্য। প্রথম চাই ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি।

"অন্যত্র তিনি বলেছেন: আগামী পঞ্চাশ বছর মাতৃভূমি তোমাদের আরাধ্য দেবতা হউক। অন্য সব অকেজো দেবতা এই কয়েক বছর ভুলিলে ক্ষতি নাই।" [Ibid, Vol. X, p. 493]

মুক্তিযোদ্ধাদের কথা: প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে তরুণদের উপর স্বামীজীর লেখার প্রভাবের কথা লিখেছেন বহু ঐতিহাসিক। তবে এ সম্পর্কে উদ্ধৃতি না বাড়িয়ে সেযুগে মুক্তিসংগ্রামী তরুণরা স্বামীজীকে কী চোখে দেখতেন তা দেখা যাক। প্রথমেই আসি সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে। কারণ বাংলা তথা ভারতের তরুণদের তিনিই সবচেয়ে প্রিয় নেতা ছিলেন। তিনি চিরতারুণ্যের প্রতীক আমাদের দেশে। তাঁর কথায় তাঁর জীবনে বিবেকানন্দের সাহিত্যের প্রভাব: "হঠাৎ নজর পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলির উপর। কয়েকপাতা উল্টেই বুঝতে পারলাম এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। বইগুলো বাড়ি নিয়ে গিয়ে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয় মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। আমাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র ও বক্তৃতা। তা থেকে তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়'—মানবজাতির সেবা ও আত্মার মুক্তি—এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ।"

স্বামীজীর পথই হল সুভাষচন্দ্রের পথ। পরবর্তী কালের নেতাজীর পথ: "বিবেকানন্দের আদর্শকে যে সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম, তখন আমার বয়স পনেরও হবে কিনা সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের বিশালতাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার মত ক্ষমতা তখন আমার ছিল না—কিন্তু কয়েকটা জিনিস একেবারে গোড়া থেকেই আমার মনে চিরকালের জন্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। চেহারায় ও ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দই ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তাঁর মধ্যে আমার মনের অজস্র জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম।"

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, যুগান্তর দলের হরিকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন: "বিপ্লব আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব? উত্তরে একটা কথাই যথেষ্ট—তাঁর প্রভাব ও প্রেরণা সর্বাধিক। তাঁর বাণীর উদ্দীপনা ছাড়া বিপ্লব

আন্দোলন ঐভাবে হত কিনা সন্দেহ।"

বিপ্লবী ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়: "একদিকে বঙ্কিমের আনন্দমঠ এবং অন্যদিকে স্বামীজীর উৎসাহবাক্য নতুন ভোরের খবর দিতে লাগল। 'পত্রাবলী', 'ভারতে বিবেকানন্দ', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,' 'বর্তমান ভারত', 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতাগুলিও—যেমন **Lectures from Colombo to Almora**—পড়তাম। স্বামীজীর অবদানহিসাবে এসব তো গেল গৌণ (**indirect**) প্রভাব। আমাদের মনে তার চেয়েও মুখ্য (**direct**) প্রভাব বিস্তার করল অনুশীলনেব স্থাপয়িতা সতীশ বসুর উক্তি।…স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল জাগ্রত, সমুন্নত, একযোগে যুক্ত স্বাধীন ভারত।" [বিশ্ববিবেক, পৃঃ ২৫৪]

অহিংস স্বাধীনতাসংগ্রামীদের উক্তি ঃ প্রাক্স্বাধীনতা যুগে তরুণদের উপর স্বামীজীর লেখার দুর্নিবার প্রভাবের উল্লেখ পাই অসংখ্য মনীষী, লেখক, মুক্তিসংগ্রামীর লেখায়। শ্রেষ্ঠ অহিংস যোদ্ধা মহাত্মা গান্ধীর ভাষায়: "**I have gone though his work very thoroughly and after having gone through them, the love that I had for my country became a thousand-fold.**" [ঐ, ১৪৬]

যুবকদের উপর স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে প্রাক্স্বাধীনতা যুগে জননায়ক, মুক্তিসংগ্রামীদের অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। আর-একজনের কথাই উল্লেখ করব যিনি মুক্তিসংগ্রামে যেমন ছিলেন প্রথম সারিতে, নবভারতের রূপায়ণেও ছিলেন এক নম্বর ব্যক্তি। সেই জওহরলাল নেহেরুর সশ্রদ্ধ মন্তব্য: "যদি আমাকে বালক ও যুবকদের নিকট একজন আদর্শ পুরুষের নামোল্লেখ করিতে হয় আমি প্রথমেই স্বামী বিবেকানন্দের নাম করিব। তিনি ছিলেন শক্তি ও তেজের প্রতীক।—স্বামীজী যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন তাহা ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত; তাঁহার বাণী ও কার্য লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।" (বিবেকবাণী, পৃঃ ১৯৪)

পদস্থ সরকারী ব্যক্তিদের মন্তব্য ঃ স্বামীজীর লেখা ও বাণী আমাদের দেশের তরুণদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। মুক্তি-সংগ্রামে, বিশেষ করে বিপ্লব আন্দোলনে সবচেয়ে শক্তিশালী বারুদ ছিল স্বামীজীর লেখায়। তাই বিপ্লবীদের যে-কোন ঘাঁটিতে তল্লাসীর সময় কোন না-কোন স্বামীজীর বই পাওয়া গেছে। তাই সমকালে এবং পরবর্তিযুগে তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর লেখা সম্পর্কে, তাঁর প্রতিটি সংস্থা সম্পর্কে রাজশক্তির বিরূপতা কমেনি। বরং যতই দেশে মুক্তিসংগ্রাম সক্রিয় হয়েছে, ততই তা বেড়েছে। ব্রিটিশ সরকার বুঝেছিলেন, এদেশে মুক্তিসংগ্রামে কী বিপুল প্রেরণা যোগাচ্ছে স্বামীজীর জীবন [illegible] বাণী। একাধিক পদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ একথা লিখেছেন। আর্ল অব রোলাণ্ডস্ আটক বিপ্লবীদের কাছ থেকে জেনেছিলেন, কে এইসব মুক্তি যোদ্ধাদের প্রেরণা দিচ্ছেন। তিনি তাঁর 'দি হার্ট অব আর্যাবর্ত' গ্রন্থে লিখেছেন যে, তরুণদের বিপ্লবীদলে আনার জন্য স্বামীজীর পত্রাবলী পড়তে দেওয়া হত।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বিচারপতি রাউলাটের নেতৃত্বে গঠিত রাউলাট কমিটি বা সিডিসন কমিটির রিপোর্টেও অনুরূপ তথ্য আছে:

"নিজেদের মতে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁদের পাঠ্যসূচীর মধ্যে ছিল: ভগবদ্গীতা, বিবেকানন্দের রচনা, এবং ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডির জীবনকথা।"

স্বামীজীর এই প্রভাবের কথা বারবার পাই

সিডিশান কমিটির প্রতিবেদনে : "Vivekananda died in 1902 , but his writings and teachings survived him, have been popularised by the Ramkrishna Mission and have deeply impressed many educated Hindus. From much evidence before us it is apparent that this influence was perverted by Barindra and his followers in order to create an atmosphere suitable for the execution of their projects." [Sedition Committee Report, 1918]

স্বামীজীর লেখার ও স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত সংস্থার প্রভাব তাঁর মৃত্যুর পর আরও বাড়তে থাকে। শাসকসমাজ স্বামীজীর লেখা সম্পর্কে এত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে যে, তাঁর লেখার যাতে প্রচার না হয়, সেদিকে ছিল তাদের সতর্ক দৃষ্টি। তল্লাসীর সময় অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে স্বামীজীর বইপত্র পেলে পুলিশ আটক করত। তাঁর বই নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবও ওঠে।

গোয়েন্দা রিপোর্টে[1] দেখা যায়, স্বামীজীর পত্রাবলী বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাবও উঠেছিল। স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল এস. আর. দাসের ভিন্ন মত না থাকলে পত্রাবলী বাজেয়াপ্ত হতই। মূল্যবান সেই গোপন নথিটি এই : "In the middle of 1915 Government of Bengal proposed to take action against the printer and publisher of 'Patrabali', Part I, 4th edition of Swami Vivekananda for contravening Sec 4 (c) of Press Act, 1910, Accordingly English translation of the alleged objectionable passages of the book was sent to Sri S. R. Das, Standing Councel for legal opinion. Sri Das after going through the whole book, gave a seven pages opinion. In which he said :

'I am strongly of opinion after going through the whole book that it does not contravene Sec. 4 (C. O. of the Act I of 1910)'

"On receipt of the said opinion and on the ground that the author of the book is dead, the Government dropped the matter". [FI. No 1068/12, 1912, Home (Pol) cong. B. Govt.]

গোপন সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামীজীর নিবন্ধও রাজরোষে পড়ে :

"During his life time Swamiji published a fortnightly journal from Belur Head quarter of Ramkrishna Mission called 'Udbodhon'. In one of its issues, which was subsequently considered highly objectionable as it appeared from a report D/December 1907, Swamiji wrote, 'You have all been hyponotized, [?] your ruler tell you that you are low, subjucated [?] and week [?] and what you believe to be true. I am made of earth of this country but I have not learnt to think of myself like that, so those people who used to look down upon us, by God's will, respecting me like god, peping [?] cannot lead man into salvation. What is wanted is a keenaged [?] sword and war to death.' [Fl No 1068/12, Home (cong.) Beng. Govt.]

---

[1] গোয়েন্দা ও পুলিশের রিপোর্টে যে ভাষা আছে, হুবহু তাই রাখা হয়েছে—ভাষার উৎকর্ষতার জন্য কোনরকম পরিমার্জন বা সংশোধন করিনি।

শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে বিশ্বজয়ের পর স্বামীজী দেশে ফিরলে কলকাতায় তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা (২৬ ফেব্রুআরি, ১৮৯৭ খ্রীঃ) জানানো হয়, তার উত্তরে তিনি যে ভাষণ দেন, সেটিও গোয়েন্দাদের ফাইলে বন্দী আছে। স্বামীজীর ওই ভাষণ ব্রিটিশ গোয়েন্দারা ভাল চোখে দেখেননি।

স্বামীজীর ওই ভাষণ তরুণ মুক্তিসংগ্রামীদের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। সেকথা টেগার্টের রিপোর্টে (22/4/1914) আছে :

"In reply to an address of welcome presented to him at his arrival in Calcutta, as referred to above, Swami Vivekananda urged hearer to wake up. 'Awake', he cried, 'arise and stop not till the desired end is reached'."…

তারপর টেগার্টের মন্তব্য :

"It might be noted here that the highly revolutionary liberty leaflets which have been circulated broad-cast over the greater part of India during the last year commence with this watch-word of Vivekananda—Arise, awake and stop not till the goal is reached."

বিপ্লবীদের উপর স্বামীজীর লেখার প্রভাবের কথা সরকারী নথিপত্রে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। গোপন সরকারী ফাইলের এক জায়গায় আছে : 'In the Anusilan Samity-System Vivekananda's Work were considered as text books to be used to gather recruits. Libraries in the name of Vivekananda's were also found in the house of revolutionaries. Ramkrishna Kathamrita and Vivekananda's Karmajoga were favourite books. [Freedom Fighter Papers No 45, State Archives Writers Buildings].

স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের তরুণরা দলে দলে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সে তথ্য বারবার গোপন গোয়েন্দা-রিপোর্টেও পাই :

"Swamiji did not concern himself much with practical politics as such, but many of his followers were afterwards found connected with the revolutionary movements of Bengal."

গোপন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে : "Ramkrishna Mission itself had been used in the past as a revolutionary agency under the guise of religion and philanthropy and the greatest danger in the present time lies in the unaffiliated Ashram which had grown up like mushroom in affected areas in East Bengal.

"Vivekananda commended [?] to go out and preach the gospel of Ramkrishna and found branch Ashrams throughtout [?] India. This command had been taken up by the revolutionaries of Bengal to such a good effect, that in spite of best intentions, the Belur Math were unable to control them.

"Vivekananda advised to his followers to tour the villages and attract the attention of the masses by the means of magic lantern lectures."

গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বামীজীর

গঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং বাংলার বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল।

"There are indications that the Mission and its followers were connected with revolutionary upheaval in India which has convulsed the student community in Bengal and extended its influence in Punjab and Native States."

অভিযোগ, বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংবাদ আদান-প্রদানের কেন্দ্র ছিল এই বেলুড় মঠ :

"Of all centres of Ramkrishna Mission in India Belur Math alone seems to have been used as rendezvoes [?] of the revolutionaries. Persons holding revolutionary views visited the Math from time to time and it is believed that political Sannasis received training and instruction there."

গোয়েন্দাদের উক্তির সমর্থন পাই প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর মন্তব্যে :

"When we found that recruitment is at a stand-still we had recourse to disseminating political nostrums in the guise of religion with the assistance of the Ramkrishna Mission." [An Account of Revolutionary movement in Bengal.]

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জানুআরি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ৫০তম জন্মোৎসবেও বিপ্লবীরা সক্রিয় অংশ নেন। সে-সম্পর্কে সরকারী গোপন রিপোর্ট :

"On the occassion of Swamiji's 50th anniversary held at Belur on 29. 1. 12 several members of now defunct Anusilan Samity done the work of feeding the visitors present. After the function was over a secret political meeting was reported to have been held but not confirmed." [Ibid.]

রামকৃষ্ণ মিশনের অন্য আশ্রমেও বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল বলে গোপন গোয়েন্দা-রিপোর্টে আছে :

"During 1913—14 important political suspects had been unearthen in Ramkrishna Mission—Baldeo Roy at Kankhal Ashram and Beneras Ashram, Satish Dasgupta at Beneras Ashram." [Ibid.]

স্বামীজীর শিক্ষাকে তরুণ বিপ্লবীরা কীভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য রূপায়ণে কাজে লাগাতেন, সেকথা টেগার্টের গোপন প্রতিবেদনে পাই :

"From the paper seized at the search mentioned above it also appears that a party of students went to Belur by boat for the celebration of Swami Vivekananda's birth anniversary in 1908, the river passage on this occassion called forth the following remarks from one of them, by name Harendra Chandra Pal, as recorded in his diary : 'To-day we all seek to cross over to the other bank of this small river Ganges. When we shall be able to unfurl the banner of independence on the other side of thraldom and make all sides resound with the throbbing of triumphant drum and the cries of "Bande Mataram" then we should be so very happy. To think of it even in imagination the mind becomes filled with energy and joy.'

"Another prominent member of Calcutta Anushilan Samity, who was about this time closely connected with the Belur Math, was Jogendra Nath Tagore, alias Jogen Thakur, a prominent member of Jugantar and Jubak-Mandali—Sarathi organisation."

পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশ্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সি. এ. টেগার্টের ওই রিপোর্টটি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল লেখা। এতে আরও আছে :

"Another incident illustrative of the method by which the members of the revolutionary party seized upon the teaching of Swami Vivekananda and adopted them to suit their own end, also came to notice about this time. Vivekananda advised his followers to tour in the villages, and attract the attention of the masses by means of magic lantern lectures. Indra Nandi, referred to above, made an extensive tour in Bengal on behalf of Maniktola gang, in the course of which he used a magic lantern to attract the attention of his hearers, on the lines laid down by the Swami. Since that time several other similar instances have been reported."

স্বামীজীর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া অন্য যেসব বিশিষ্ট বিপ্লবীর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগ ছিল সরকারী ফাইলে তাঁদের নাম আছে। যেমন, আলিপুর বোমার মামলায় দেবব্রত বসু। ইনি পরে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ হন। আলিপুর বোমার মামলার শচীন সেন ও কৃষ্ণলাল সাহা। মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভবভূষণ মিত্র। এছাড়া আছেন : যোগেন ঠাকুর (সারথি গোষ্ঠী), তারাপদ বসু (বাঙলা ষড়যন্ত্র মামলা), পুলিন মুখার্জী, সতীশ বসু (কলকাতা অনুশীলন সমিতি), নগেন্দ্রনাথ বসু (ঢাকা), বীরেন বসু (আর্যসমাজ), ফণীভূষণ ঘোষ (চন্দননগর), যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (আর্যসমাজ), উমাশংকর সরকার (পূর্ণদাস সমিতি, ঢাকা), রসিকচন্দ্র সরকার (গোপালপুর ডাকাতি)।

স্বামীজীর লেখা প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে দেশের তরুণদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। স্বামীজীর বইপত্র, চিঠি পড়েই তরুণরা আকৃষ্ট হয়েছিল মুক্তিসংগ্রামে। তারা অনুপ্রেরণা পাবার জন্য বার-বার যেতেন স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠেও। স্বামীজীর উত্তরসূরীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও গুরুতর। সরাসরি 'স্বরাজ' প্রচারের অভিযোগ আছে সরকারী গোপন ফাইলে। স্বামীজীর নির্দেশে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি হন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। এই সময় মিশনের ভূমিকা সম্পর্কে গোপন গোয়েন্দা-রিপোর্টে গুরুতর অভিযোগ আছে :

"These Missionaries are suspected of praeching Swaraj and Brahmananda alias Rakhal Ghose has been described as leader of these men."

রুশ বিপ্লবের অনেক আগেই, এমন কি বলশেভিক দল গড়ে ওঠারও আগে স্বামীজী চেয়েছিলেন নতুন ভারত গড়ে উঠুক এদেশের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে।

স্বামীজী সর্বাত্মক বিপ্লব চেয়েছিলেন—মুক্তি-সংগ্রামীরা তার সামান্যই সফল করেছিলেন—তিনি চেয়েছিলেন : "নূতন ভারত বেরুক…চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে।…" [বাণী ও রচনা, ৬/৮১ দ্রষ্টব্য] মহত্তর ভারত গড়তে তরুণদের প্রতি স্বামীজীর সেই ডাক আজও সফল হয়নি :

"Our ancestors were great. We must first recall that. We must learn the elements of our being, the blood that courses in our veins; we must have faith in that blood, and what it did in the past; and out of that faith and consciousness of past greatness, we must build an India yet greater than what she has been." [Lectures From Colombo to Almora, p. 184]

চরিত্রগঠনে সাহিত্য

শ্রীআনন্দ বাগচী

বিশ্রুত কবি ও প্রাবন্ধিক—বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজের বাংলা সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

ছেলেবেলায়, খুব ছেলেবেলায়, যখন ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ফের মনের চৌকাঠ পেরোনোর চেষ্টা চলেছে মায়ের কোলের কাছে বসে, হাতে খড়ির স্লেটে অক্ষরমালার আদল পেকে উঠেছে, আর সেই সঙ্গে জীবনের সবচেয়ে হালকা বইয়ের রহস্যময় কাগজের কবাট খুলে স্বরে অ-কে সাথী করে অজগর মুখ বাড়িয়েছে—প্রতিটি অক্ষরকে অর্থের সঙ্গে যুক্ত করে সেই নতুন পরিচয় মনের মধ্যে এখনও রোমাঞ্চকর হয়ে আছে। এ যেন এক হিসেবে জীবনের শুধু বর্ণ-পরিচয়ই নয় রূপরসগন্ধেরও পরিচয়। অর্ধস্পষ্ট, প্রায় পাঁজির ছবির মতো কাঠের ব্লকে (?) ছাপা সেই ছবিগুলোই সেদিন আমাদের মন মাতিয়ে তুলেছে। আজকের দিনের মতো রঙচঙের হৈচৈ ছাড়াই। আসলে মনের কল্পনাকে স্বাভাবিক বাতাস আর সুতোর টানে আকাশে ওড়াতে ঘুড়ির মতো সামান্য যেটুকু ধরতাই দরকার তাই যুগিয়েছে সেই পয়লা পাঠ্য কেতাবের ছবি। লেখায় এবং রেখায় মনের স্বতঃস্ফূর্তিকেই উসকে দিয়েছে সেদিন। ছাপা অক্ষর সেদিন থেকেই আমাদের বিশ্বাস আর অন্তরঙ্গ নির্ভরতা অর্জন করেছে। সেদিনের সেই ম্যাক্সি সাইজের বোল্ড অক্ষরের স্বর আর ব্যঞ্জনবাহিনী উত্তর-কালে কলেবর কমিয়ে ছোট হয়েছে কিন্তু তার মুখের আদল একটুও বদলায়নি। ফ্রেণ্ড ফিল-জফার অ্যাণ্ড গাইড এই বর্ণমালা আমাদের যেন হাত ধরে নিয়ে গেছে জ্ঞানের আর অভিজ্ঞতার জগতে। আমাদের শিক্ষার আদিপর্ব এইরকমই ছিল। সেই একান্নবর্তী পরিবারে অভিভাবক খুব মুষ্টিমেয় ছিলেন না। সকলেই শাসনে অনুশাসনে আমাদের পদে পদে বেঁধে রাখলেও তাঁরা কিছু গায়ে গায়ে থাকতেন না। একটা দূরত্ব ছিলই। অলিগলির মতো আলো-হাওয়া বয়ে যাওয়ার পরিখা বা পরিসর থাকত। যারা সময়ের দিক থেকে এই ফাঁকটুকুর সেতু বন্ধন করে চলেছিল তারা ছাপা অক্ষরের বই, তবে পাঠ্য বই নয়। অপাঠ্যও নয় অবশ্যই। বলা ভাল বিশেষ রকমে পাঠ্য, দ্রুত এবং নিঃশব্দ পাঠ্য কেতাব। যেগুলো আমরা গোগ্রাসে গিলতাম এবং কখন কখন গুরুজনের চোখের আড়ালে গোপনে। আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যাওয়া, কামুফ্লেজের ভেকধারী সেই সব বইগুলো গৃহ-বিধানে সে-বয়সে আমাদের পক্ষে কুপথ্য বলে গণ্য হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কারণ অধ্যয়ন-রূপী তপশ্চর্যার মাঝখানে 'নাটক নবেল গপ্পো' নিষিদ্ধ। ফলে পাঠ্য বইয়ের মলাট চাপিয়ে অনেক সময় পড়ার টেবিলেই খরগোশের মতো কান দুটো সজাগ রেখে রুদ্ধনিঃশ্বাসে দৃষ্টিভোজন চলত। কখন চিলেকোঠার ঘরে নিজেরাই নাগালের বাইরে চলে যেতাম।

সেযুগে বই ছিল আমাদের কাছে দুষ্প্রাপ্য বস্তু। কারণ গল্পের বইয়ের, ছোটদের রকমারি বইয়ের তখন এত ছড়াছড়ি ছিল না। অভিভাবকরাও ছিলেন বইকুণ্ঠ, আজকের মা-বাবা-কাকার মতো দরাজহস্ত ছিলেন না। ফলে আমাদের—যাদের ছিল বই পড়ার নেশা, তাদের ছাগলের দশা হয়েছিল। বাছ-বিচার ছিল না। মুখের সামনে যা পেতাম তাই চিবিয়ে যেতাম। তৎকালীন জ্ঞানবুদ্ধিতে হয়তো তার সবটা হজমও হত না। বঙ্কিমবাবু-শরৎবাবুর উপন্যাস থেকে

শুরু করে কিশোরপাঠ্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী কিছুই বাদ যায়নি। কিন্তু এখন ভেবে অবাক হই, গুরুপাক লঘুপাক যাই হোক না কেন সেই বইগুলো আমাদের চরিত্র নষ্ট করেনি। লেখাপড়ায় কিছুটা ক্ষতি ঘটিয়েছে বটে কিন্তু উচ্ছন্নে ঠেলে দেয়নি বরং অন্যভাবে আমাদের পুষ্ট করেছে, পুষিয়ে দিয়েছে, পরিণত করে তুলেছে। কিছুটা পাকিয়েছে হয়তো, কিন্তু সেই অকালপক্কতা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরকচা মেরে যায়নি, সাবালক মনের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। আমাদের ছেলেবেলায় বাইরের জগতের সঙ্গে বহির্বাণিজ্য হয়েছিল এই গল্পের বই মারফত। আর তাতে আমরা আখেরে লাভবানই হয়েছিলাম।

পাশাপাশি তুলনা করলে আজকের দিনের চালচিত্র আলাদা। শিশু এবং কিশোর সাহিত্যে আপতবিচারে এখন আমরা স্বয়ংভর হয়েছি। প্রতিবছর ছোটদের জন্যে রাশিরাশি বই বেরোচ্ছে। রকমারি চরিত্রের বই। রঙ-বেরঙের পত্রপত্রিকা। কত বেরোচ্ছে আবার বন্ধও হয়ে যাচ্ছে। মোট কথা পাঠ্য বইয়ের বাইরে গল্পের বইয়ের এমন একটা খোলা বাজার তৈরি হয়ে গেছে, যেখানে ট্যাকশেসন্ নেই, নিষেধের গণ্ডী টানা নেই, হুমড়ি খেয়ে পড়ার মধ্যে উদ্বেগ-উত্তেজনা নেই। অনায়াসে হাত বাড়ালেই বই পাওয়া যায় এখন।

শুধু হাত বাড়ানোর ইচ্ছেটাই মরে আসছে ধীরে ধীরে। এই বইকুণ্ঠাকে বইরাগ্য (বৈরাগ্য) বলে ঠাট্টা করছিলেন একজন। আসল ব্যাধিটা বোধ হয় অন্যত্র। আমাদের নাগরিক জীবনে যেমন পায়ে হাঁটার চল ক্রমে উঠে যাচ্ছে, তেমনি অক্ষরে-অক্ষরে চোখ ফেলে চোখে হাঁটার ক্লেশ নিবারণের চেষ্টাও চলেছে। রাশি রাশি কমিকস্ বেরোচ্ছে এই জন্যে। আগে গল্পের অনুচিত্রণ বা ইলাসট্রেশন হত। গল্প-কাহিনীকে আরও স্বাদু এবং প্রত্যক্ষ করে তোলার জন্যে এই নির্বাচিত ছবির সংযুক্তি। কিন্তু এখন ব্যাপারটা উলটো। গল্প এখন আর কাউকে পড়তে হয় না, ছবি নিজেই গল্প বলে দেয়। শুধু তার সঙ্গে দু-চারটি কথা, না ঠিক কথাও নয় সংলাপ, ফুটনোটের মতো জুড়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ বর্ণনা ব্যাপারটাকে কাহিনী থেকে তুলে দেওয়ার পরোক্ষ প্রচেষ্টা। সেই সঙ্গে যেন ছবির নির্বাক যুগে ফিরে যাবার চেষ্টা। যা ছিল এতকাল অলংকরণ, ছোটদের এই ধরনের বইতে তাই হয়ে উঠল অবলম্বন। ছবির সাহায্যে লেখাপড়া শেখানো থেকে শুরু করে এই গল্প বলার ব্যাপারটা ছোটদের কল্পনা, প্রবণতাকে যে অনেকখানি খেয়ে দিচ্ছে এমনই মনে হয়। আমাদের সবচেয়ে বড় পাকস্থলীটা যে মস্তিষ্কে তাতে সন্দেহ নেই। এবং এই পরিপাককর্মের শুরুতে এবং শেষে আরও দুটি বাড়তি কাজ হয় সেখানে। চর্বণ এবং রসায়ন দুটোই। তাই মগজ বা মন তার যাবতীয় খাদ্যবস্তুকে গ্রহণ করে, তাকে গুঁড়িয়ে গলিয়ে মিশিয়ে পুষ্টিসাধক রসে এবং রক্তে পরিণত করে দেয়। এই সমস্ত ব্যাপারটাই অবশ্য বিমূর্ত বা মানসিক। আক্ষরিক বা শারীরিক অর্থে রস-রক্ত নয়।

চিত্রকাহিনী বা এই কমিকস্গুলি শিশুদের সেই বৃহৎ পাকস্থলীটিকে রিলিফ বা বিশ্রাম দেবার নামে ক্রমশ অকেজো করে দিতে থাকে। তাকে স্মার্ট অর্থাৎ দ্রুতগামী করে তুলতে গিয়ে তার নিজস্ব চলচ্ছক্তিকে ক্রমশ পঙ্গু করে তোলে। শিক্ষাবিদ্ এবং মনোবিজ্ঞানী কি বলবেন জানি না, তবে ব্যক্তিগতভাবে এই আমার আশঙ্কা, এই আমার বিশ্বাস। চিরকালীন প্রথায় আমরা যদি খাদ্য গ্রহণ না করে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পরিমাণ ভিটামিন মিনারেল ইত্যাদি আমরা ক্যাপসুলে,

ট্যাবলেটে আর ইন্‌জেক্‌শনে আজীবন গ্রহণ করে যেতাম তাহলে পরিণতিটা যেমন হত অনেকটা সেইরকম আরকি !

ফলে পরিপাক ও রসাস্বাদন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে শিশু বয়স থেকেই। সেই সঙ্গে দ্রুতপঠনের ক্ষমতাও। আখ চিবিয়ে যে শিশু আখের রস গ্রহণের আনন্দ পেল না, ফিডিংবট্‌লের নির্যাস পান করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগল, তাদের জন্য দুঃখ হয়।

এত কথা বললাম এই কারণে যে, সাহিত্য আমদের চরিত্রগঠনের অন্যতম উপকরণ। সস্তা মনোরঞ্জনী পণ্য নয়, অলস বিলাসের সামগ্রী নয়। শিশুসাহিত্য বিশেষ করে। চরিত্র ও জীবন গঠনের আদিপর্বে তার গুরুত্ব অসাধারণ। তাকে খেলনা কিংবা ফেলনা কিছু ভাবলে এবং পাঠক হিসেবে ছোটদের ছোট ভাবলে অসংশোধ্য ভ্রান্তি ঘটবে।

যেহেতু ইদানীং ছোটদের বইয়ের রীতিমত বাজার আছে এবং অনেক প্রকাশকই নতুন করে ছোটদের জন্য প্রকাশনায় নেমে পড়েছেন বা নামছেন, সেহেতু ছোটদের লেখকের সংখ্যাও খুব নগণ্য নয়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সাহিত্য-জগতে যাঁরাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বা যাঁদেরই বই বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছে তাঁরাই রাতারাতি ছোটদের লেখার দিকে সাড়ম্বরে ঝুঁকে পড়ছেন। পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন বাইপ্রোডাক্ট বলে একটা কথা আছে, এঁদের অনেকেরই কলমে শিশুসাহিত্য তেমনি বাইপ্রোডাক্ট; অথচ এই লেখাই তো সব চেয়ে কঠিন। শুধু ভাষার উপর দখল আর গল্প তৈরির নাটুকে কৌশল জানা থাকলেই হয় না, একটা বিশেষ মন চাই। ছোটদের জন্যে লেখা আর ছোটদের মতো করে লেখা এই দুটো ব্যাপার এক নয়। ছোটদের ফাঁকি দেওয়া শক্ত, মন পাওয়া কঠিন, তবে তাদের নষ্ট করা সহজ। শিশু খাদ্যে এবং সাহিত্যে ভেজাল দেওয়া সমান অপরাধ বলেই মনে করি।

আমাদের ছেলেবেলায় চিরকালীন সাহিত্য বা বিভিন্ন ভাষার ক্লাসিকগুলোর শিশু বা কিশোর সংস্করণের পাশাপাশি, জীবনী বা ঐতিহাসিক কাহিনীর গায়ে গায়ে অন্য ধরনের বইও চালু ছিল। ভূতপ্রেত রহস্য রোমাঞ্চ অ্যাডভেঞ্চার কি গোয়েন্দা কাহিনীর রমরমা যে একেবারে ছিল না তা নয়। এগুলোকে প্রকৃত অর্থে নিশ্চয় সাহিত্যও বলা যেত না, কিন্তু নাটক নভেলের সমান লেবেল যুক্ত হয়ে কোন কোন ঘরে সেগুলো সামগ্রিকভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনেক অভিভাবকের কেমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, ওই সব খুনজখম ডাকাতির কাহিনী আর উদ্ভট কল্পনাবিলাস ছোটদের অধ্যয়নস্পৃহাকে নষ্ট করে দিবাস্বপ্ন বা খোয়াব দেখতে সাহায্য করবে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা সেরকম কখনই ঘটেনি। গল্পের সম্মোহনে দিন কয়েক আবিষ্ট হয়ে থাকলেও এবং ছাপা অক্ষরের বিবরণকে নির্ভেজাল সত্য জ্ঞান করলেও আমাদের আদতে কোন ক্ষতি ঘটে যায়নি।

যায়নি যে তার একটা বড় কারণ তখনকার ছোটদের জন্যে লেখাগুলোর বিষয় যাই হোক সেই রচনার মধ্যে সকলেই একটা আদর্শকে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতেন। প্রথম কথা লেখাগুলো ছিল আন্তরিক এবং ছোটদের প্রতি ভালবাসা থেকেই জাত। নিজের ঘরের ছেলেটিকে পাঠক কল্পনা করেই অনেক লেখক সে সময় কলম ধরতেন। গল্পবস্তু যাই হোক, তার ভেতর দিয়ে মন্দের ভেতর থেকে ভালটুকুকে স্পষ্ট করে চেনাবার সঙ্গে সঙ্গে বালক ও কিশোর মনকে উদ্দীপ্ত করে তুলতেন সৎ ও সাহসিক কর্মের দিকে। বাঙালীসুলভ হীনম্মন্যতা দূর করে তাদের ভেতর আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস

জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে যেতেন সাধ্যমত। সেটা ছিল স্বাধীনতাপূর্ব পরাধীনতার যুগ। তাই একটা আদর্শ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কাহিনীর মধ্যে উপস্থিত থাকতই। ফলে নিজের দেশকে ভালবাসা এবং দশের কল্যাণ করার ইচ্ছে আমাদের ভিতরে কখন যে কীভাবে সংক্রামিত হয়ে গেছে বলতে পারব না।

কিন্তু শিশু বা কিশোর সাহিত্য দিয়ে শুরু হলেও চরিত্রগঠনে এবং নিয়ন্ত্রণে সাহিত্য মাত্রেরই যে একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং আছে তা শুধু অনুমানসাপেক্ষ নয়, বহুবার বহুভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বয়স্ক পাঠক-পাঠিকার ক্ষেত্রেও চরিত্র সংশোধনের প্রেরণা যুগিয়েছে সৎ সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্র নবীন লেখকের প্রতি নিবেদনে একটা মোক্ষম শর্ত এই দিয়েছিলেন যে, যদি কেউ মনে করেন লিখে তিনি দেশের এবং দশের কল্যাণ সাধন করতে পারবেন, তবেই যেন তিনি লেখেন। আসল কথা তাই, নিজে উদ্বুদ্ধ হলে তবেই অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা যায়। নিজে ধর্মাচরণ করে তবেই অপরকে শেখানো যায়। ধর্মে এবং জীবনে নীতিশিক্ষার প্রয়োজন আছে। আমাদের সমস্যায় সঙ্কটে পতনে প্রলোভনে, আমাদের পথভ্রষ্ট কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সাহিত্যের দৃষ্টান্ত এবং পরামর্শ অনেক সময়েই পরিত্রাণ লাভের উপায় হয়ে ওঠে। জীবনের সবক্ষেত্রেই ধর্মবুদ্ধির জরুরী প্রয়োজন আছে। আমাদের বিবিধ আচার-আচরণ এবং তজ্জনিত কর্মফলকে ফলিতরূপে দেখতে পেলে আমাদের চোখ ফোটে, আমাদের কর্মকাণ্ডজ্ঞান এবং প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হয়। রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রগুলি তাঁদের জীবনসন্ধির উপসংহার দিয়ে, তাঁদের দুর্মর বিশ্বাস, অসামান্য আত্মত্যাগ, বিচিত্র জীবনদর্শন দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ ব্যর্থপ্রায় মানুষ জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। পেয়েছে আরোগ্য লাভের উপায়, রক্তাক্ত হৃদয়ের নিবিড় শুশ্রূষা এবং দিব্যজ্ঞান। গীতার শ্লোকগুলি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সঞ্জীবনী মন্ত্রের মতো কাজ করেছে। রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কেবল সাহিত্যের রস যুগিয়ে যাননি। জীবনযুদ্ধের রসদ এবং দুর্লভ পাথেয় যুগিয়ে আসছেন অদ্যাবধি। কথামৃতের অন্তরদীক্ষা ও সরল সমীকরণ, বিবেকানন্দের ওজস্বী উদ্বোধন, জীবনের সুরকার রবীন্দ্রনাথে ঔপনিষদীয় নিষাদ তো সার্বজনীন প্রাপ্তি। কিন্তু বাইরেও গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ পাঠক যে অভিভূত অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত হয়েছেন তার নজির আছে। শরৎচন্দ্রের পথের দাবী, বঙ্কিমের আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী, সীতারাম ইত্যাদি উপন্যাস বহু বিপ্লবীকে যে অভাবিত শক্তি যুগিয়েছে সে-কথা কালক্রমে জানা গেছে।

জীবনদায়িনী তথা প্রেরণাদাত্রী হিসেবে সাহিত্যের ভূমিকা বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের পরেও এক প্রজন্মব্যাপী অন্য লেখকদের হাতে চলমান ছিল। তারপর দিনকাল বদলে গেল, সাহিত্যের পালা বদল হয়ে গেল দেখতে দেখতে। চতুর্দিকে অবক্ষয় আর হতাশা, খুনজখমের রাজনীতি আর চরিত্রহনন। জীবনে নেমে এসেছে নিরাপত্তাহীন অনিশ্চয়তা, আর্থিক নিম্নচাপ এবং মূল্যবোধের বিকৃতি। ফলে অসুস্থ মানসিকতার অন্ধকার গ্রাস করে নিচ্ছে মানুষের যাবতীয় শুভবুদ্ধিকে।

এ অবস্থায় স্বভাবতই সাহিত্য তার চারিত্রিক ঐতিহ্য থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে এবং পড়ছে। মুনাফাই এখন তার মোক্ষ, তাই মনোরঞ্জনের দ্রুততম এবং সহজতম পথটিই খুঁজে নিতে চেষ্টা করছে সাহিত্য। বেস্টসেলার হয়ে ওঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গ্রন্থবাণিজ্যের গূঢ়সূত্র। প্রকাশক

চাইছেন, লেখকও চাইছেন, দুপক্ষই এই লক্ষ্যভেদের নিশানায় একাগ্র একচক্ষু হয়ে রয়েছেন। দেহ-মনের সস্তা আনন্দ, আরাম এবং উত্তেজনা ঠিকমতো পাক করে পরিবেশন করতে পারলে যে হট্ কেকের মতো বিক্রি হয়, হাতে-কলমে এ অভিজ্ঞতা সাহিত্যবণিকদের ইতিমধ্যেই হয়েছে। সর্বাধিক বিক্রীত হতে গেলে যে সর্বাধিক বিকৃত হবারও সমূহ সম্ভাবনা সেকথা বোধ হয় খেয়াল থাকে না। কেবলই অর্থের জন্য এই অর্থহীন সাহিত্যকণ্ডূয়ন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

অনেক লেখকেরই কৈফিয়ৎ তৈরি। সমাজে এবং জীবনে যা ঘটছে একজন নিষ্ঠাবান সাংবাদিকের মতো তার সত্য চিত্র তিনি নাকি তুলে ধরতে বাধ্য। বাস্তবিকতাবর্জিত রোমান্সে বুঁদ হয়ে থাকার দিন চলে গেছে। চলে গেছে স্বপ্ন দেখার দিন। এই গন্ডময় জীবনে উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে থাকলে কি প্রলয় বন্ধ থাকবে? থাকবে না। তাই রক্ষণশীলতার গোঁড়ামি ছেড়ে ভালমন্দ সব কিছুকেই সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। সাহিত্য যেহেতু জীবন তথা সমাজের দর্পণ সেহেতু শ্লীল-অশ্লীল নির্বিশেষে বাস্তবে যা ঘটছে তাই তুলে ধরতে তাঁরা বাধ্য।

আপাতবিচারে যুক্তিটা উড়িয়ে দেবার মতো মনে হয় না। সাহিত্য দর্পণ ঠিকই, তবে হুবহু প্রতিবিম্বনই দর্পণের একমাত্র কাজ নয়। অন্তত যাকে বলি ফটোগ্রাফিক ট্রুথ তা প্রকাশ করেই তার দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। আয়না হচ্ছে ক্রিটিসীজম অফ্ লাইফ—জীবন সমালোচনা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা নিজের মুখশ্রীর তারিফ খুঁজি হয়তো, কিন্তু আয়না স্তাবকতা করে না, আমাদের ভুলত্রুটি অসঙ্গতি ধরিয়ে দেয়, শুদ্ধি সংশোধনের সুযোগ দেয়।

সাহিত্যও তাই করে। আমাদের অন্যায় এবং পাপবোধকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। স্খলন-পতনের সম্ভাবনার চিহ্নগুলো দেখিয়ে দেয়। যেমন করে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল কিংবা শরৎচন্দ্রের একাধিক উপন্যাস আমাদের অভিজ্ঞতা চিনিয়েছে। সেই সঙ্গে জীবনদর্শন, জীবনের আদর্শ আমাদের সামনে মেলে ধরে পথের নির্দেশ দেয়।

সাহিত্য তাই জীবনকে অনুসরণ না করে ভগীরথের মতো তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে নতুন দিগন্তের দিকে, নতুন জীবনের দিকে। এই অবক্ষয়, হতাশা এবং বিনষ্টির যুগে সাহিত্য নতুন বোধ ও বিশ্বাসের ছোঁয়া এনে দেবে, আমাদের চরিত্রকে এক নিয়ন্ত্রিত রূপ দেবে।

সু এবং কু সকল প্রকার ভাব উপলব্ধি করিলেও, মানুষ তাহার অন্তরের আদর্শবিশেষকে প্রকাশ করিতে সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছেন। আদর্শবিশেষের উপলব্ধি ও প্রকাশ লইয়াই মানবদিগের ভিতর যত তারতম্য বর্তমান। দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদি ভোগসকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বদা জীবনোদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে,—They idealise what is apparently real. পশুদিগের সহিত তাহাদিগের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাত-নিত্য ভোগসুখাদিলাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শসকল অন্তরে অনুভব করিয়া বাহিঃস্থ সকল বিষয় সেই ছাঁচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে,—They want to realise the ideal.—ঐরূপ মানবই যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

'দেবীমাহাত্ম্য'-তত্ত্ব ও উপাখ্যান

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী—অভিজ্ঞ লেখক।

হিন্দুদের নিত্য-আবৃত্ত অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে 'দেবীমাহাত্ম্য' অন্যতম, গীতা যেরূপ মহাভারতের একটি অংশ 'দেবীমাহাত্ম্য'ও সেরূপ মহর্ষি বেদব্যাস রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি অংশ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩—এই তেরটি অধ্যায় নিয়ে 'দেবীমাহাত্ম্য'। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানিতে যে দেবী মহামায়ার লীলামাহাত্ম্য বর্ণিত ও কীর্তিত হয়েছে 'দেবীমাহাত্ম্য' নামেই তার ইঙ্গিত রয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্য' অংশের মন্ত্রসংখ্যা সাতশত। তাই গ্রন্থখানিকে 'সপ্তশতী'ও বলা হয়। তবে 'চণ্ডী'-ই গ্রন্থখানির সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং সুপ্রচলিত নাম। 'চণ্ডী' নামে প্রসিদ্ধ এই গ্রন্থখানি শক্তিসাধকদের অত্যন্ত প্রিয় এবং অবশ্য-পাঠ্য। এই পুণ্যগ্রন্থের আরাধ্যা দেবী চণ্ডী। তাই 'চণ্ডী' বলতে গ্রন্থ বিশেষ এবং দেবী উভয়কেই বোঝায়।

ভগবানকে মাতৃভাবে আরাধনা হিন্দুধর্মের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই আরাধনার বিরামহীন ধারা চলে আসছে বৈদিক যুগ থেকে। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বেদ এবং তন্ত্র এই দুইকে নিয়েই ভারতীয় সংস্কৃতি। পরব্রহ্মের বৈদিকী আরাধনার সঙ্গে পরাশক্তির তান্ত্রিকী আরাধনার ধারাও সমান্তরালভাবে বয়ে আসছে পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষে। শক্তিসাধনার অপ্রতিহত এই ধারা বৈদিকযুগ থেকে প্রবাহিত হয়ে বিবর্তিত আকারে ক্রমে পৌরাণিক এবং তৎপরবর্তী যুগে আরও বিস্তার লাভ করে এবং ব্যাপকভাবে সাধনার অবলম্বনরূপে অগণিত পাঠককে পরাশক্তি মহামায়ার আরাধনায় উদ্বোধিত করে এবং আজও করে আসছে। ভগবানকে মাতৃভাবে আরাধনা করে বহু সাধক যে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, শক্তিসাধনার ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। স্থান কাল ও পাত্রভেদে সাধকের সাধনার বৈচিত্র্যে মহাশক্তি প্রকটিতা হয়েছেন বিভিন্ন যুগে বিভিন্নরূপে। বৈদিক যুগের ঋষিকন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী যুগসমূহের বিভিন্ন শক্তিসাধকদের জীবন-ইতিহাসই এই ধারার বিরামহীনতা এবং গতিশীলতা প্রমাণ করে। সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামাক্ষেপা, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ মাতৃসাধকদের জীবনে মাতৃশক্তির সঙ্গে সাধকের একাত্মতা এবং শক্তিরূপিণী মহামায়ার চৈতন্যময় ও আনন্দময় সত্তায় সাধকের আত্মলয়ের বিস্ময়কর সাধন-ইতিহাস আজও শক্তিসাধককে সমানভাবে আকর্ষণ করে, অনুপ্রাণিত করে সাধনপথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

বেদ-উপনিষদে অভিহিত পরব্রহ্ম এবং তন্ত্রের পরাশক্তি স্বরূপতঃ অভেদ, যেন একই টাকার এপিঠ-ওপিঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়: "ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক্ নয়, তেমনি।"[১] শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাস-গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকট পরাশক্তি জগন্মাতার অস্তিত্ব ছিল অলীক। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্যে শ্রীমৎ তোতা কালে বুঝতে পেরেছিলেন যে, একভাবে মহামায়া যিনি তুরীয়া-নির্গুণা, অপরদিকে তিনিই সাধকের প্রতি অনুগ্রহ-

---

[১] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুভাব—পূর্বার্ধ, (১৩৭৭), পৃঃ ২৬৩

বশতঃ নানামূর্তিতে বিভাসিতা। অনুভব করতে পেরেছিলেন: "এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা! শিব-শক্তি একাধারে হর-গৌরী মূর্তিতে অবস্থিত। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ।"[২] সে এক বিচিত্র ইতিহাস, আলোচনার স্থানও স্বতন্ত্র।

রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধির উপাখ্যান দিয়ে চণ্ডীর অবতারণা। রাজা সুরথ রাজোচিত সর্বগুণসম্পন্ন আদর্শ নৃপতি। কিন্তু একদা প্রবল বহিঃশত্রু দ্বারা তাঁর রাজ্য আক্রান্ত হলে দুর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজা কিছুটা হীনবল হয়ে পড়লেন। তাঁর এই হীনবলতার সুযোগ নিয়ে নিজ মন্ত্রী এবং অমাত্যগণ তাঁকে প্রতারিত করল। বঞ্চিত করল রাজসুখ উপভোগে। অতি আপনার জন বলে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এতদিন যাদের তিনি প্রতিপালন করে আসছিলেন তাদের নিকটই হলেন তিনি প্রতারিত ও লাঞ্ছিত। আত্মজন কর্তৃক এভাবে লাঞ্ছিত এবং রাজসুখ থেকে বঞ্চিত রাজা একদিন মৃগয়া ছলে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আশ্রয় নিলেন গভীর বনে, মেধস্ ঋষির আশ্রমে। সংসারকোলাহল থেকে দূরে নির্জন আশ্রমের শান্ত পরিবেশ রাজাকে মুগ্ধ করল। কিন্তু মুগ্ধ হলে কি হবে। আসক্তির বন্ধন থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারছেন না। স্বজন-মোহ তাঁকে পিছন থেকে টানছে। তাদের প্রতি তাঁর বিনিদ্র উৎকণ্ঠার শেষ নেই। হৃতগৌরব, ফেলে আসা পরিজন, ধনরত্ন ও রাজসুখ উপভোগের স্মৃতি তাঁর মনকে অহরহ পীড়া দিচ্ছে। মনের এই অস্থিরতা নিয়ে যখন তিনি আশ্রমে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করছিলেন তখন সাক্ষাৎ হল স্ত্রীপুত্রাদি কর্তৃক ধনৈশ্বর্যাদি থেকে বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত বৈশ্য সমাধির সঙ্গে। অদৃষ্টের পরিহাস! যেসব মানুষ তাঁদের এই দুর্গতির মূলে তাদেরই মঙ্গলচিন্তায় রাজা ও বৈশ্য উভয়ই আজ শোকক্লিষ্ট! পরস্পর ভাব বিনিময়ের পর অকৃতজ্ঞতার বলি রাজা এবং বৈশ্য উপস্থিত হলেন মেধস্ মুনির সম্মুখে, জানতে চাইলেন তাঁদের এই দুর্দশার কারণ। রাজা বললেন: "হে মুনিবর, আমার চিত্ত আমার বশীভূত নয় বলে হৃতরাজ্যাদিতে আমার মমতা এখনও আছে। আর এই মমতাই যে আমার দুঃখের কারণ তাও আমি জানি। কিন্তু তা জানা সত্ত্বেও হৃতরাজ্যের প্রতি আমার যে এই মমতা রয়েছে, তার কারণ কি? দেখুন, এই বৈশ্যও স্ত্রীপুত্রাদি কর্তৃক বঞ্চিত, অমাত্যাদি কর্তৃক বর্জিত এবং আত্মীয়সকল কর্তৃক পরিত্যক্ত। তথাপি তাদের প্রতি তাঁর আসক্তির শেষ নেই।"[৩] উত্তরে ঋষি বললেন: তুমি যথার্থই বলেছ। "মানবগণ প্রত্যুপকারের লোভে পুত্রাদির প্রতি অনুরক্ত হয়, সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহগর্তে এবং মমতারূপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়—ইহা সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। এই মহামায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। এই শক্তি জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। কাজেই এ বিষয়ে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই। বিবেকীদের কী কথা? দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকিগণেরও চিত্তসমূহ বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহাবৃত করেন। সেই মহামায়া এই সমগ্র চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। আবার প্রসন্ন হলে তিনিই মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন।"[৪]

---

[২] ঐ, পৃঃ ২৮৯

[৩] শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৩৯—৪৩

[৪] ঐ, ১।৫২—৫৮

"রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে যাচ্ছেন। বনের সরু পথ, একজনের বেশী যাওয়া যায় না। রাম ধনুকহাতে আগে আগে চলছেন; সীতা তাঁর পাছু পাছু চলছেন; আর লক্ষ্মণ সীতার পাছু পাছু ধনুর্বাণ নিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্মণের রামের উপর এমনি ভক্তি-ভালবাসা যে, সর্বদা মনে মনে ইচ্ছা নবঘনশ্যাম রামরূপ দেখেন; কিন্তু সীতা মাঝখানে রয়েছেন, কাজেই চলতে চলতে রামচন্দ্রকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বুদ্ধিমতী সীতা তা বুঝতে পেরে, তাঁর দুঃখে কাতর হ'য়ে চলতে চলতে একবার পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই ভাখ।' তবে লক্ষ্মণ প্রাণভরে একবার তাঁর নিজ ইষ্টমূর্তি রামরূপ দেখতে পেলেন!"[৫]

রাজা সুরথের তখন জিজ্ঞাসা—"ভগবন্, আপনি যে দেবী মহামায়ার কথা বলছেন, সেই দেবী কে? তাঁর স্বরূপই বা কি, তাঁর উৎপত্তির ইতিহাস এবং কার্যই বা কি?"[৬] বিস্তারিত আমাদের জানতে ইচ্ছা হয়। উত্তরে ঋষি মেধস্ সেই মহাশক্তি মহামায়ার নানা মন্বন্তরে নানারূপে অবতরণের বিস্ময়কর কাহিনী একের পর এক বর্ণনা করতে লাগলেন।

অনন্ত শয্যায় যোগনিদ্রামগ্ন ভগবান বিষ্ণু। তাঁর কর্ণমল থেকে হঠাৎ উৎপন্ন হল ভীষণাকৃতি দুই দানব—মধু এবং কৈটভ। উদ্ভূত হয়েই তারা বিষ্ণুর নাভিকমলে সমাসীন প্রজাপতি ব্রহ্মার জীবননাশে উদ্যত হল। যোগনিদ্রার আবরণ সরিয়ে নিয়ে বিষ্ণুকে জাগরিত করবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হল যোগনিদ্রারূপিণী মহাকালিকার স্তুতি। স্তবে তুষ্টা মহাকালিকা শরণাগত ব্রহ্মাকে রক্ষা করবার জন্য অপসারিত করলেন নিদ্রার আবরণ, জাগরিত হলেন ভগবান বিষ্ণু। কিন্তু সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ করেও পরাস্ত করতে পারলেন না দুর্ধর্ষ দানবদ্বয় মধু-কৈটভকে। দেবী মহামায়ার মায়ায় মোহিত হয়ে অতিবলগর্বিত দানবদ্বয় তখন বিষ্ণুকে বর দিতে চাইল। বিষ্ণু বললেন: "তোমরা যদি আমার যুদ্ধে সন্তুষ্ট হয়ে থাক, তবে তোমরা দুজন এখনই আমার বধ্য হও। এটাই আমার একান্ত অভিপ্রায়। অন্য বরের এখন প্রয়োজন কি?"[৭] তাই হোক। কারণ—আপনার যুদ্ধকৌশলে আমরা প্রীত হয়েছি। তবে আমাদের বধ করতে হবে একটি শর্তে। জলহীন কোন স্থানে আমাদের মৃত্যু ঘটাতে হবে—"আবাং জহি ন যত্রোর্বী সলিলেন পরিপ্লুতা।"[৮] ভগবান বিষ্ণু তখন নিজের ঊরুর উপর রেখে দানবদ্বয়ের মস্তক ছেদন করলেন। মহামায়ার প্রসাদে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা দুর্ধর্ষ দানবদ্বয়ের দ্বারা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেলেন।

কালান্তরে মদমত্ত দৈত্যাধিপতি মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবলোক আবার বিপর্যস্ত। পরাজিত ও লাঞ্ছিত দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে মর্ত্যে বিচরণ করতে লাগলেন। ব্রহ্মার বরে দানবরাজ মহিষাসুর অমর। কাজেই দেবতারা নিরুপায়। অনন্যোপায় দেবতারা ব্রহ্মাকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন গরুড়বাহন বিষ্ণুর সম্মুখে, বর্ণনা করলেন দৈত্যরাজ মহিষাসুরের অত্যাচারে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার করুণ কাহিনী। শুনতে শুনতে ক্রোধদীপ্ত বিষ্ণুর মুখমণ্ডল থেকে নির্গত হল সুমহৎ তেজোরাশি। তার সঙ্গে মিলিত হল লাঞ্ছনাক্লিষ্ট দেবগণের পবিত্র দেহ থেকে নির্গত সমুজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ। দিগ্ দিগন্ত পরিব্যাপ্ত

---

[৫] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃ (১৩৭৭), পৃঃ ২৫৭—৫৮

[৬] শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৫৯—৬১

[৭] ঐ, ১।৯৭—৯৮

[৮] ঐ, ১।১০১

প্রজ্বলিত অনলসদৃশ সেই জ্যোতিঃ থেকে সহসা আবির্ভূ́তা হলেন দিব্য লাবণ্যবতী অপরূপা এক জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি। শম্ভুর তেজে সেই দেবীমূর্তির মুখ, যমের তেজে তাঁর বাহুসমূহ উৎপন্ন হল। এভাবে বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন তেজের দ্বারা দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল উৎপন্ন হল। তারপর দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্র থেকে বিভিন্ন অস্ত্রাদি উৎপন্ন করে দেবীকে উপহার দিয়ে তাঁকে রণসাজে সজ্জিত করলেন। দেবগণ কর্তৃক অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্রাদিতে বিভূষিতা মহাদেবী অট্টহাস্য সহকারে ভীষণ হুঙ্কারে দশদিক কম্পিত করে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে অসংখ্য দানব এবং তাদের অনেক সেনাপতি দেবীকর্তৃক নিহত হল। তারপর দেবী চণ্ডবিক্রমে যুদ্ধ করে শাণিত খড়্গের দ্বারা মহিষাসুরের শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। পরাক্রান্ত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে নির্যাতিতের সংঘবদ্ধ অভিযানের জয় ঘোষিত হল।

শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যদ্বয়ের অত্যাচারে দেবলোক আবার বিপর্যস্ত। ইন্দ্র, সূর্য, কুবের, যম ও বরুণ প্রভৃতি প্রধান দেবতাগণ বলগর্বী অসুরদ্বয়ের দ্বারা স্ব স্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। "বিপদকালে আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাদের সর্ববিধ বিপদ তৎক্ষণাৎ নাশ করব"[৯]—দেবী মহাশক্তির এই পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণপূর্বক দানবভয়ে ভীত স্বর্গচ্যুত দেবতারা অপরাজিতরূপিণী মহামায়ার শরণাপন্ন হলেন, নিবেদন করলেন তাঁদের মহাবিপদের কাহিনী সবিস্তারে। শরণাগত দেবতাদের দুঃখ-কাতর অবস্থা দেবীকে বিচলিত করল। শত্রুনাশ করে এই মহাবিপদ থেকে দেবতাদের উদ্ধার করবার জন্য দেবী দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধে একে একে শুম্ভনিশুম্ভ দানবযুগলের পার্ষদ ধূম্রলোচন, চণ্ড-মুণ্ড এবং রক্তবীজ প্রমুখ অসুরগণকে ধ্বংস করে পরিশেষে দেবী নিহত করলেন শুম্ভ-নিশুম্ভকে; ঘোষণা করলেন তাঁর চিরন্তন প্রতিশ্রুতি, বিশ্বমানবের পরম আশ্বাস—"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি ॥ / তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥"[১০]—এভাবে দানবদের প্রাদুর্ভাববশতঃ যখনই কোন বিঘ্ন উপস্থিত হবে তখনই আমি আবির্ভূ́তা হয়ে দেবশত্রু বিনাশ করব।

উপসংহারে ঋষি মেধস্ বললেন: "হে রাজন্, তিনিই (বিষ্ণুমায়াই) তোমাকে, এই বৈশ্যকে এবং অন্যান্য বিবেকাভিমানী পণ্ডিতগণকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন ও করবেন। হে মহারাজ, এই পরমেশ্বরীর শরণাগত হও। ভক্তিপূর্বক তাঁর আরাধনা কর। তিনি ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ও মুক্তি প্রদান করবেন।"[১১]

মেধস্ মুনির মুখে জগন্মাতার অপূর্ব মহিমা ও লীলাকাহিনী শ্রবণ করে রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি খুব সন্তুষ্টি লাভ করলেন। মুনির উপদেশানুসারে তাঁরা মহামায়ার আরাধনার্থ নদীতীরে গমন করলেন এবং দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণপূর্বক ভক্তিসহকারে কখন নিরাহারী, কখন বা স্বল্পাহারী থেকে সমাহিত চিত্তে পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, স্বদেহ-রক্তসিঞ্চিত বলি ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণে দেবীর পূজা করলেন। তিন বৎসর এভাবে আরাধনা করার ফলে তাঁরা জগদম্বা চণ্ডিকার প্রসন্নতা লাভে সক্ষম হলেন। পরিতুষ্টা দেবী প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের সম্মুখে

---

[৯] ঐ, ৫।৬

[১০] ঐ, ১১।৫৪—৫৫

[১১] ঐ, ১৩।১—৫

আবির্ভূতা হয়ে বললেন : "হে রাজন্ ও বৈশ্যকুল-নন্দন, তোমরা আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করবে সন্তুষ্টা হয়ে আমি তোমাদিকে তাই প্রদান করব।"[১২]

সুরথ ও সমাধির মানসিক রুচি ও সংস্কারের বিভিন্নতাহেতু তাঁদের প্রার্থিত বরও হল বিভিন্ন। সংসারসুখাভিলাষী রাজা চাইলেন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার এবং জন্মান্তরে চিরস্থায়ী রাজ্য। অপরপক্ষে সংসার-বৈরাগ্যসম্পন্ন সমাধির প্রার্থনা সেই পরমবস্তুর, যা লাভ করলে সর্বপ্রকার দুঃখের হবে আত্যন্তিক নিবৃত্তি, সুদীর্ঘ সংসারবর্ত্মে গতায়াতের চির অবসান। শ্রীশ্রীজগন্মাতার কৃপায় সুরথ ও সমাধি—উভয়েরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল, স্ব স্ব প্রার্থিত বর লাভ করে তাঁরা কৃতার্থ হলেন।

সুরথ ও সমাধি দুটি নিছক কাল্পনিক চরিত্র মাত্র নয় বা তাঁদের প্রয়োজনও শেষ হয়ে যায়নি। তাঁরা আজও জীবিত আছেন এবং অনন্তকাল ধরে জীবিত থাকবেন। যতদিন মানুষ আসুরিক সম্পদ এবং শক্তিতে প্রমত্ত থেকে দৈবী চেতনা থেকে বিচ্যুত ও অশান্ত থাকবে; যতকাল জগতে নির্যাতন ও দলনকারী দানবশক্তি অন্তরে-বাইরে বর্তমান থাকবে, ততকাল রাজা এবং বৈশ্য চরিত্র মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে দানবশক্তির বিনাশ করে দৈবীশক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে।

চণ্ডীতে বর্ণিত দেবাসুর সংগ্রাম দৈবীশক্তির সঙ্গে আসুরিক শক্তির, নিঃশ্রেয়সের সঙ্গে অভ্যুদয়ের, আন্তঃশত্রুর সঙ্গে বহিঃশত্রুর চিরন্তন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি।

মানুষের জীবনে নানা দ্বন্দ্ব। ধর্ম ও অধর্মের, বস্তুপরতান্ত্রিকতা ও আধ্যাত্মিকতার, ধনী ও দরিদ্র প্রভৃতির দ্বন্দ্বে মানবিক মূল্যবোধ ক্ষয়িষ্ণু ও বিপর্যস্ত। মাতৃশক্তির অবহেলা এবং অপরপক্ষে ভোগশক্তির প্রমত্ততায় সভ্যতা সংকটাপন্ন। এই যুগসংকটে মহামায়া মহাশক্তির আরাধনার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। তাঁকে প্রসন্ন করতে পারলে, তাঁর বলে বলীয়ান হয়ে বাহ্য ও আন্তর শত্রু পরাভূত করে আমরা অভ্যুদয় ও আধ্যাত্মিক জাগরণ লাভ করতে সক্ষম হব, সন্দেহ নেই। মহামায়ার কাছে আমাদের কাতর প্রার্থনা—অরি সংহারপূর্বক বারবার তিনি যেমন দেবতাদের রক্ষা করেছেন ও করছেন, আমাদেরও সেরূপ রক্ষা করুন। আসুরিক শক্তির বিনাশ করে দৈবীসত্তায় আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করুন। দেবতাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও প্রার্থনা করি : "হে সর্বকার্য ও কারণ-রূপিণি, সর্বেশ্বরি, শক্তিময়ী দুর্জ্ঞেয়া দেবি, আপনি আমাদিকে সকলপ্রকার আপদ থেকে, সর্বপ্রকার ভয় থেকে রক্ষা করুন। আপনাকে নমস্কার।"[১৩]

---

[১২] ঐ, ১৩।১৪—১৫

[১৩] ঐ, ১১।২৪

বহুরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ভূতেশানন্দ

রামকৃষ্ণ [redacted] ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ। কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ২ জানুয়ারি, ১৯৮৪-র ধর্মসভায় প্রদত্ত ভাষণ থেকে গৃহীত।

ঠাকুরের কথাগুলি চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন। পুরাণ শব্দটির একটি অর্থ করা হয়—'পুরাপি নব এব'। প্রাচীন হয়েও নূতন। তত্ত্বগুলি প্রাচীন কিন্তু আমরা যখনই শুনি, চর্চা করি, আমাদের কাছে যেন নূতন রূপে প্রতিভাত হয়। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের মাধুর্য এত প্রগাঢ় যে, সেই মাধুর্যকে যখনই আস্বাদন করা যায় তখনই যেন নূতন মনে হয়। সেই পুরাণ পুরুষ বহুবার বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ইদানীংকালে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে তাঁর যে-প্রকাশ, তারই আলোচনা এখন দেশে দেশে চলছে। আমরা যেন তার ভিতর থেকে একটা নূতন আলোর সন্ধান পাচ্ছি, দীর্ঘ বিস্মৃতির অন্ধকার ভেদ করে যে-আলোক নূতন চেতনা সঞ্চার করে আমাদের জাগ্রত করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন আমাদের জন্য। আমরা যারা মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন, যারা স্বভাবতই স্বীয় স্বরূপকে ভুলে থাকি, ভুলে থাকি জীবনের লক্ষ্য কি এবং সেই লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায়ই বা কি। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-তত্ত্বকথা বলেছেন, তা নূতন নয়, বহুশাস্ত্রে বহুবার বলা হয়েছে—কিন্তু বারংবার পড়লেও সে-শাস্ত্র ঠিক এমনভাবে আমাদের বোধগম্য হত না, অন্তরকেও এত আকৃষ্ট করত না। অবতারের বৈশিষ্ট্য এখানেই।

ভাগবতে আছে—একবার ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করবার জন্যে তাঁর সহচর রাখাল বালকদের এবং গোবৎসগুলিকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। তিনি দেখতে চান যে, ভগবান এখন কি করেন। ভগবান প্রথমে আত্মবিস্মৃত ছিলেন। তাই চিন্তিত হলেন, ধেনুসহ সখারা গেল কোথায়? তারপর দিব্যদৃষ্টিতে সব দেখলেন। তিনি মনে মনে একটু হেসে রাখাল বালক এবং গোবৎসগুলি যেমন ছিল ঠিক সেইরকম করে আবার তৈরি করলেন। তারপর গোষ্ঠ থেকে ফিরে রাখালবালকেরা নিজেদের বাড়িতে চলে গেল এবং বাছুরগুলিও যে-যার মায়ের কাছে ফিরে গেল। এইরকম দিনের পর দিন চলছে। তাদের ব্যবহারে কোথাও কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না, কেবল দেখা গেল যে, বৎসদের জন্যে গাভীরা আরও বেশি ব্যাকুল এবং গোপবালকদের প্রতিও তাদের মায়েদের স্নেহ আরও বেশি। অন্য কারো নজরে না পড়লেও বলরাম কিন্তু এই পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন যে, এই রাখাল ছেলেগুলি সাধারণ রাখাল নয় এবং এই বাছুরগুলিও সাধারণ বাছুর নয়, এরা সব শ্রীকৃষ্ণেরই এক-এক রূপ। আত্মার প্রতি সর্বজীবের পরম আকর্ষণ। তিনিই এদের রূপ নিয়েছেন বলে তাদের প্রতি গোমাতা এবং গোপীদের আকর্ষণ শতগুণে বেড়ে গিয়েছে। এই যে স্নেহের বৃদ্ধি, শ্রদ্ধার বৃদ্ধি, একটা চেতনার নবজাগরণ—এটাই হল ভগবানের আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য। তিনি যখন আসেন মানুষ নিজেকে, তার পারিপার্শ্বিককে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে শেখে। এই দৃষ্টিই হল তাদের নব চৈতন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচনায় আমরা দেখেছি, জন্মাবধি তাঁর প্রতি আবালবৃদ্ধবণিতার একটা অপূর্ব আকর্ষণ। এই আকর্ষণ সকলকে তাঁর দিকে টানছে। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ কর্ষণ বা আকর্ষণ

করেন যিনি। শ্রীরামকৃষ্ণও ঠিক সেইরকম। মানুষ সবচেয়ে বোঝে এই আকর্ষণকে। বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা যায় না, শাস্ত্র পড়ে যার সন্ধান পাওয়া যায় না, এমন কি সদাচারপরায়ণ হয়েও যে তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না, সেই তত্ত্বটি হল ভগবানের বস্তুমাহাত্ম্য। তিনি যখন আবির্ভূত হন তখন সকলে তাঁর প্রতি এইরকম একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে। আমাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে দেখব তাঁর পরিপূর্ণ স্বরূপকে বোঝা বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়, কিন্তু এই আকর্ষণটুকু সকলেই বুঝতে পারে। যেখানে তাঁর কথা হচ্ছে সে-স্থানটি যে আমাদের টেনে আনছে, সে ঐ আকর্ষণের বলে। তাঁর নাম পর্যন্ত শোনেনি অথচ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অনভিজাত নির্বিশেষে এই আকর্ষণটি চারিদিকে প্রসারিত হচ্ছে। স্বামীজী যেমন বলেছেন, 'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেম প্রবাহঃ'—যাঁর প্রেমের প্রবাহ চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের প্রতি অপ্রতিহত বেগে চলছে।

এই কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর তাঁর কতিপয় ভক্তকে বলেছিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক'; সেই আশীর্বাণী কেবল তৎকালে উপস্থিত কয়জন ভক্তের জন্যই নয়, আমরা যে যেখানে আছি সকলের জন্য। এমনকি যারা অনাগত তাদের জন্যও। সকলের জন্য তাঁর এই আশীর্বাদ 'চৈতন্য হোক'।

আমাদের মনে হয় 'চৈতন্য হোক' কথাটুকুকে একটু গভীরভাবে ভাবতে হবে। কিসের চৈতন্য? আমরা তো জড় নই, চেতন আছিই এবং চেতনের ধর্মই হল চৈতন্য। তাহলে নূতন করে চৈতন্য হোক বলছেন কেন? তার কারণ আমাদের যে-চেতনা আছে সেই চেতনাটি নিম্নগামী। কখন সেটা আমাদের দেহের সঙ্গে যুক্ত, কখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, কখন বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত—এইরকম চারিদিকে ছড়ানো আছে। যখন তিনি প্রার্থনা করছেন বা আশীর্বাদ করছেন যে, আমাদের চৈতন্য হোক—তার অর্থ আমাদের এই নিম্নগামী চৈতন্যকে ঊর্ধ্বগামী করতে চাইছেন। আমাদের যে-চৈতন্য বহির্মুখী তাকে অন্তর্মুখী, যে-চৈতন্য ভোগপ্রবণ তাকে ত্যাগময় করতে চাইছেন, আমাদের যে-চৈতন্য অনাত্মাতে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে তাকে আত্মবস্তুর দিকে আকর্ষণ করতে চাইছেন। এই আত্মবস্তুর দিকে আকৃষ্ট চৈতন্য মানুষকে পরম কল্যাণলাভে সাহায্য করবে। আমরা হয়তো বলব, তার জন্য ভগবানের দেহধারণ করে আসার দরকার কি? তিনি তো ইচ্ছামাত্রই জগৎটার রূপ বদলে দিতে পারেন! কেন তা করেন না? শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উত্তরে বলবেন যে, তিনি কি করবেন না করবেন সে তাঁর ইচ্ছা। তিনি লীলাময়। যদি সব মনগুলো বদলে যায়, তাহলে আর লীলা চলে না। চোর চোর খেলায় কেউ চোর হতে রাজী না হলে খেলা চলে না। কাজেই তাকে চোর হতে হবে, আবার পুলিশও হতে হবে। যখন অবতার আসেন তখন তাঁর এই খেলাটাকে একটা নূতন রূপ দিয়ে যান। যেমন ঠাকুর বলেছেন, খেলার সময় যখন কোন ছেলে কিছুতেই বুড়ী ছুঁতে পারছে না, ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, বুড়ী তখন হয়তো হাতটা বাড়িয়ে দেয় যাতে বিনা পরিশ্রমে সে ছুঁতে পারে। এইরকম আমরা যারা খেলায় শ্রান্ত-ক্লান্ত, তাদের জন্যে তাঁর হাত না বাড়িয়ে উপায় নেই।

মানুষের এইজন্যে ভগবানকে কাছে পাওয়া দরকার এবং কাছে তখনই পায় যখন সে খেলায় ক্লান্তিবোধ করে। ভগবান এই খেলা খেলছেন আমাদের নিয়ে বা আমাদের হয়ে। কিন্তু খেলার ভিতর দিয়ে আবার আমাদের সেই বোধটুকু

জাগিয়ে দিচ্ছেন যে, আমরা তাঁর থেকে ভিন্ন নই। অনেক সময় ঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গদের উদ্দেশে বলেছেন,—তোমাদের এইটুকু জানলেই হবে যে, তোমরা কে, আমি কে এবং আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ কি? এইটুকু জানাবার জন্য যেন তাঁর দেহধারণ করে আসা।

এই খেলা যে বড় অদ্ভুত ভাবে চলছে তা আমরা স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও বুঝতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন মুষ্টিমেয় কয়জন ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন। আবার আপাত দৃষ্টিতে যাঁরা কাছে ছিলেন, তাঁরাও তাঁর প্রতি উদাসীন ছিলেন। কাজেই তাঁর খেলা যেন তাঁর খেলুড়েদের পছন্দ করে নেওয়া। মনের মতো খেলুড়ে না হলে তাঁর খেলা জমে না। এইজন্য ঠাকুর বলতেন, কলমির দল, একটিকে টানলে সব আসে। তেমনি ভগবান যখন আসেন তাঁর খেলুড়ে সাথীরূপে বহুজন আসেন। তাঁরা পৃথক্ নন, তাঁরই বিভূতি। তিনিই বহুরূপে ভিন্ন ভিন্ন আধারের ভিতর দিয়ে নিজেকে আস্বাদন করেন। জগৎরূপের সৃষ্টি এইজন্য—তাঁকে অনেকে আস্বাদন করবে বা তিনি অনেকের ভিতর দিয়ে নিজেকে আস্বাদন করবেন। তাঁর মাধুর্য যেমন অফুরন্ত, খেলারও তেমনি বিরাম নেই। পণ্ডিতদের গুণবিভাগ অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—বহুরূপে তিনি নিজেকে প্রসারিত করে খেলছেন। যিনি দুর্গতি ভোগ করছেন, তিনিও তিনি, আর যিনি পরমতত্ত্ব আস্বাদন করে আনন্দে পরিপূর্ণ তিনিও তিনি। ফড়িং-এর পশ্চাতে কাঠি গুঁজে দেওয়ার মতো দুর্গতিও তাঁর ভিতর দিয়ে হচ্ছে, সুগতিও তাঁর ভিতর দিয়ে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মুশকিল হচ্ছে আমরা তাঁর থেকে নিজেদের বিযুক্তরূপে ভাবছি, সেইজন্যে এই অবস্থা।

ভগবান থেকে বিচ্যুত হয়ে যে দূরে সরে রয়েছে তার বিপর্যয় এই, সে জগতের ভিতরে তাঁকে না দেখে জগৎটাকে ঈশ্বর-ভিন্ন রূপে দেখছে। এইজন্য তার স্মৃতি ম্লান হয়ে গিয়েছে, সে তার স্বরূপকে ভুলে গিয়েছে। ভাগবতে বলেছেন কেন এমন হয়: 'তন্মায়য়া'—তাঁরই মায়া দ্বারা। ভাগবতে বলেছেন, 'তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা'—(১১।২।৩৭), অতএব যে জ্ঞানীব্যক্তি একান্ত ভক্তি সহকারে তাঁকে ভজনা করেন, তিনি হলেন গুরুদেবতাত্মা। গুরু এবং ইষ্ট যাঁর আত্মাস্বরূপ।

এইরকম শ্রীরামকৃষ্ণের খেলা চলছে এবং এ-খেলা কত বৈচিত্র্যপূর্ণ কত নিপুণভাবে তিনি খেলছেন তা তাঁর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীটিকে দেখলে বুঝা যায়। একদিকে তিনি স্বামীজীকে তৈরি করলেন বিরাট ব্যক্তিত্ব দিয়ে, আর-একদিকে তিনি নাগমহাশয়কে তৈরি করলেন একেবারে অহমিকাশূন্যরূপে। কবি গিরিশচন্দ্রের কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা: মহামায়া স্বামীজীকে জাল দিয়ে বাঁধতে গেলেন, কিন্তু তিনি এতবড় যে জালে কুলোয় না, আর নাগমহাশয়কে বাঁধতে গেলেন, তিনি এত ছোট যে জালে আটকায় না। দুটির বৈপরীত্য আত্যন্তিক। এইরকম কত বিচিত্র খেলা। খেলোয়াড়দেরও কত বৈচিত্র্য। হয়তো এখনও এগুলি ভাল করে বুঝবার আমাদের সময় হয়নি। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের আলোচনাতেই অন্ত পাচ্ছি না, এর উপর তাঁর সুবিশাল পরিবারের সকলের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ আমাদের সীমিত জীবনের সাধ্যায়ত্ত নয়। প্রত্যেকের ভিতরেই আমরা অনন্যবিত্তর বিশিষ্টতা দেখতে পাই।

ঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের (রাখাল মহারাজের) বৈশিষ্ট্য—ভাবতন্ময়তা। স্বামীজীর ক্ষুরধার বুদ্ধি,—প্রবল বিবেক, যার উপর মায়া প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না, তাঁকেও দেখাচ্ছেন; গিরিশের মতো অপূর্ব বিশ্বাসী, তাঁকেও

দেখাচ্ছেন। কিন্তু গিরিশ কি নিজেই গিরিশ, না শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় গিরিশ? আমরা পূর্বোক্ত সূত্র অনুসারে মনে করি যে, দুটি ভিন্ন বস্তু নয়। গিরিশ তিনি নিজেই হয়েছেন তাঁর ভিতরে বিশ্বাসরূপ যে-ধর্ম সেটিকে প্রকট করবার জন্যে। প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি গিরিশের ভিতরের যে-তত্ত্ব আমাদের অজ্ঞাত ছিল সেইটিকে লক্ষ্য করে বলছেন, ভৈরবের অবতার। কারণ তিনি লম্পট, মদ্যাসক্ত বর্তমানের গিরিশকে লক্ষ্য করছেন না, তিনি লক্ষ্য করছেন ভাবী গিরিশকে, যাঁকে তিনি তাঁর নিপুণ হাতে তৈরি করবেন। এইজন্যই তার সম্পর্কে ঠাকুর এত উচ্চভাব পোষণ করছেন। বলছেন, গিরিশের পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস, তার বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যাবে না। গিরিশ তাঁর শেষ জীবনে বলছেন, তাঁর মহত্ত্বকে যদি বুঝতে চাও তো আমাকে দেখ, আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি। অহঙ্কারশূন্য গিরিশ স্পষ্টভাবে নিজের কথা বলছেন। বলছেন, যা কিছু পরিবর্তন তা ভগবানের অশেষ কৃপায়, এ miracle—অলৌকিক ঘটনা জগতে অনেক ঘটে কিন্তু গিরিশকে নিয়ে যে-খেলা ঠাকুর খেলেছেন এটি অসাধারণ। গিরিশ নিজেকে দেখছেন শ্রীরামকৃষ্ণের হাতের একটি যন্ত্ররূপে। প্রথমে অশুদ্ধ অমার্জিত গিরিশরূপে এবং তারপরে শুদ্ধ পবিত্র গিরিশরূপে, গিরিশ নিজেকে দেখছেন, আর অবাক হয়ে যাচ্ছেন।

শুধু গিরিশ নয়, স্বামীজী তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়েও বলছেন, আমাদের মতো এই নব্য ইংরেজী শিক্ষিত অবিশ্বাসী তরুণদের মনকে তিনি কাদার তালের মতো তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ভাঙছেন, গড়ছেন, এর চেয়ে অলৌকিক শক্তি আর কিসে দেখা যায়? বলছেন, জড় জগতে একটা পরিবর্তন ঘটানো এমন কিছু বেশি কথা নয়, কিন্তু আমাদের মতো অবিশ্বাসী, সংশয়শীল, তর্কপ্রবণ মনকে নিয়ে তিনি কি খেলাই খেলছেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে একমুঠো রাস্তার ধুলো নিয়ে লাখ বিবেকানন্দ তৈরি করতে পারতেন।

আমরা অবাক হয়ে যাই যে, একি সম্ভব! কিন্তু স্বামীজীর এ-উক্তি অতিশয়োক্তি বা গুরুভক্তির আতিশয্য নয়। কারণ স্বামীজী বলেছেন যে, আমার মতো সংগ্রাম তাঁর সঙ্গে আর কেউ করেনি। আমি যতবার তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি ততবার পরাজিত হয়েছি। এই পরাজয়ের পরম্পরার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত যে বিবেকানন্দটি তৈরি হল তিনি বলছেন, আর একটি বিবেকানন্দ যদি থাকত তাহলে তাকে বুঝতো।

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অচিন বৃক্ষটিকে যেমন চিনি না, তার শাখা-প্রশাখাকেও তেমনি চিনি না। তিনি যে ডালপালা নিয়ে, পার্ষদ পরিজনবর্গ নিয়ে খেলা করেন সে-খেলাটি বুঝতে হলে প্রত্যেক জায়গায় দেখব তাঁদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি সর্ব ঐশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান দেহধারণ করে অবতীর্ণ এবং তাঁর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মতো। ভাগবতে বলেছেন, মায়ামনুষ্য হরি—মায়ার দ্বারা তিনি মানবরূপ ধারণ করেছেন, অবতার হয়েছেন। দেবকী বলেছিলেন যে, প্রলয়ের পর এই বিরাট বিশ্বের সকল বস্তুকে পরস্পরের দূরত্ব রক্ষা করে যিনি এই সমস্ত বিশ্বটাকে নিজের ভিতরে ধারণ করেন তিনিই আবার আমার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন, লোকের কাছে এটি একটি বিড়ম্বনা। লোকে কি করে বিশ্বাস করবে? অসম্ভব ঘটনা! যিনি সর্বব্যাপী ঈশ্বর, অসীম, অনন্ত, তিনিই আবার এতটুকু একটি শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভাগবতে এ-কথাটি বেশ বলেছেন যে, তিনি জন্মগ্রহণ করলেন তাঁর স্বরূপ দেখিয়ে, তার পরেই আত্মসংবরণ করলেন, ওদের ভুলিয়ে দিলেন। ভুলিয়ে

না দিলে খেলা চলবে না, যাকে আমরা সন্তানরূপে ভালবাসব তাঁকে যদি সর্বৈশ্বর্যশালী ভগবান বলে জানি তাহলে তাঁকে সন্তানরূপে নেওয়া যায় না, তাই মায়াতেই ভুলিয়ে দিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর আকর্ষণ অব্যাহত রইল। ভগবানের লীলা এইভাবে হয়। একদিকে তিনি জ্ঞান দিচ্ছেন আবার সেই জ্ঞানকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করে আপনজনরূপে ব্যবহার করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের ভিতরে এই ভাবই ছিল। তাঁরা কেউ বলেননি, শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁরা চিনে ফেলেছেন। আবার কেউ এ-কথাও বলেননি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের অজ্ঞাত, নাগালের বাইরের একটি বস্তু।

যাঁরা নাস্তিক, ঈশ্বর মানেন না, ভগবান সম্বন্ধে তাঁদের উদাসীনতা অবজ্ঞা সম্পর্কে গীতায় (৯।১১) ভগবান বলছেন :

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥'

মোহাচ্ছন্ন হয়ে মানুষ আমাকে অবজ্ঞা করে মানবদেহধারী বলে। 'পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্'—সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর যে নিয়ন্তা আমি, আমার এই পরম তত্ত্বকে তারা জানে না। কিন্তু ভগবানকে যারা অবিশ্বাস করে, তারাও তাঁর আওতার বাইরে চলে যায় না। আমরা লৌকিক বিচার দিয়ে বুঝতে পারি যে, মানুষের আত্মার প্রতি যে অনুরাগ সেটা হল স্বাভাবিক। কোন কারণবশত নয়। আত্মাকে, নিজেকে আমরা সবাই ভালবাসি। অন্য বস্তুকেও ভালবাসি আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধের জন্য। এখন এই আত্মবস্তু যে আচ্ছাদনের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছেন অনেক সময় সেই আচ্ছাদনটি এত স্থূল হয়ে যায় যে, আমরা তার ভিতরের বস্তুটিকে বুঝতে পারি না। না পারলেও কিন্তু সেই আকর্ষণটি কম প্রবল নয়। তিনি আকর্ষণ সকলকে করছেন তবে ছদ্মবেশ থাকার জন্য আমরা এই আকর্ষণ কোথা থেকে আসছে তা হয়তো বুঝতে পারছি না। এইজন্য যখন ভক্ত বহির্মুখ তখনও কিন্তু সেই বাহ্য বস্তু যা তাকে আকর্ষণ করছে তা বাহ্য নয়।

ঠাকুর অদ্ভুত নট। যে যেমন তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার। গিরিশ ঠাকুরের স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা না রেখেই অনেক সময় কথাবার্তা বলতেন, সব সময় ভাষার শালীনতাও থাকত না। তাই দেখে একজন ভক্তের মনে হল যে, হয়তো এইরকম ব্যবহার করলেই ঠাকুর খুশি হন। সেভাবেই ঠাকুরের প্রতি একদিন ব্যবহার করতে গিয়েছেন। ঠাকুর বুঝলেন, সে ভুল করছে। হেসে বললেন, ওরে তোর ও ভাব নয়। সাবধান করে দিচ্ছেন। যার যেমন ভাব তাকে সেইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এ আর কেউ পারে না। কারো কাছে তিনি সন্তান, কারো কাছে তিনি মাতা বা পিতা, কারো কাছে তিনি শাসক, কারো কাছে সখা। 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।' এগুলি সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছাঁচ। ধোপার গামলায় সব রঙ গুলে রাখা আছে—লাল, নীল, হলুদ, সবুজ। যে যে-রঙ চাইছে সে সেই রঙে ডুবিয়ে দিচ্ছে, এই নাও তোমার রঙ। ঠাকুর ঐরকম বলছেন যে, কার কি চাই এখানে এস, এখানে পাবে। একজন বলেছিল, আপনি গামলায় যে-রঙ গুলেছেন সেই রঙ দিন। এ-রঙ তিনি দিতে পারেন না বা দেন না, কারণ যাকে দেবেন সে তখন তাঁরই স্বরূপ হয়ে যাবে, পৃথক্ থাকবে না। এইজন্যে কত রকম রঙ নিয়ে তিনি খেলা করছেন। একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের সম্বন্ধে। তিনি তখন ভুবনেশ্বরে আছেন, আত্মভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। কলকাতার তিনটি নব্য যুবক, সকলকে শিক্ষা

দেবার জন্য তাঁদের যেন দৈবদত্ত অধিকার আছে এই ভাব নিয়ে তাঁরা ঘোরেন। তাঁরা যে হোটেলে উঠেছেন তার মালিকের কাছে জানতে চাইছেন সেখানকার দ্রষ্টব্য কি কি। মালিক বলল, লিঙ্গরাজ আছেন, এই সব মন্দির আছে ইত্যাদি। তারপরে মনে পড়ল যে, আর-একটি দ্রষ্টব্য বস্তু আছে এখানে—বেলুড়মঠের একটি শাখা আছে, সেখানে একজন সাধু আছেন, অদ্ভুত মানুষ, রাজার মতো একেবারে। সোনার গড়গড়ায় তামাক খান, আর রাজকীয় আচরণ। সেই যুবক তিনটি স্বভাবতই উগ্র হয়ে বললে, 'আপনারা তাঁকে কিছু শিক্ষা দেন না?' 'আরে মশাই কত বড়লোক তাঁর পিছনে, আমরা কি করে শিক্ষা দেব।' 'দাঁড়ান, আমরা দেখে আসি একবার।' তাঁরা যখন মঠে গেলেন মহারাজ তখন বৈঠকখানায় বসে গল্প করছিলেন সেবকদের নিয়ে। আগন্তুকদের দেখে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন যে, তোরা ভিতরে চলে যা, আর ভিতরের দিকের দরজাগুলি সব বন্ধ করে দে। সেবকেরা বাইরে থেকে খুব কৌতূহলী হয়ে ভাবছে, আমাদের সরিয়ে দিলেন কেন? শুনতে পেল ঘরের ভিতরে হাসির হুল্লোড় চলছে। কিছুক্ষণ পরে যুবকরা বিদায় নিলে মহারাজ দরজা খুলতে বললেন। ব্যাপারটা হল তারা মহারাজকে শিক্ষা দিতে এসেছিল। মহারাজ তাদের সঙ্গে ধর্মকথা নয় খালি ফষ্টিনষ্টি করতে লাগলেন। আর তার থেকে অত হাসির উচ্ছ্বাস। তারা হোটেলে ফিরে গেলে মালিক বললেন, কেমন দেখলেন? তারা বলল, আনন্দময় পুরুষকে দেখলাম। অত অহঙ্কার,অভিমান, ঔদ্ধত্য নিয়ে গিয়ে তাঁর আনন্দময় রূপ দেখে তাদের মন শান্ত হয়ে গেল। এই হল ঠাকুরের সন্তান, তাঁরই বিভূতি, তাঁরই প্রকাশ এঁদের ভিতরে।

ঠাকুরের কাছে কেউ এলে তিনি তাকে নানারকম পরীক্ষা করতেন। তাকে প্রশ্ন করে, তার চালচলন, দেহের গঠন দেখে বিচার করতেন। তারপর ঊর্ধ্বভূমিতে উঠে ভাবদৃষ্টিতে তাকে দেখতেন। আর যে যেমন আধার সেই-ভাবে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। ঠাকুরের একটি কথা যা স্বামীজীকে বলেছিলেন, দেখ্, কারো ভাব নষ্ট করতে নেই, যে যে-ভাবের তাকে সেই ভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হয়। স্বামীজী এই শিক্ষাটিকে সমস্ত জীবনে কখনও ভোলেননি। বারবার স্বামীজী বলেছেন, কারো কল্যাণ করতে হলে তোমার ভাব তার উপরে চাপিয়ে দিও না। তাকে তার ভাবে বাড়তে সাহায্য কর। প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে তিনি দাঁড়াচ্ছেন তার চরম গন্তব্য রূপে, চরম লক্ষ্য রূপে। কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁর নিজের নিজের দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখছেন।

প্রত্যেককে নিয়ে ঠাকুর খেলা করছেন। এতগুলি ঘুঁটি কিন্তু এমন খেলোয়াড়—জানেন কোন্ ঘুঁটিকে কিভাবে চালাতে হবে। ঠাকুর নিজে বলেছেন এ-কথা। তাঁর মধ্যে সর্বভাবের সমন্বয় আমরা বলি, শুধু সমন্বয় নয় প্রত্যেকটি ভাবের পরাকাষ্ঠা একমাত্র তাঁর ভিতর দিয়ে সকলে পাচ্ছেন। প্রত্যেকে দেখছেন তাঁকে পরাকাষ্ঠারূপে, পরম লক্ষ্যরূপে, গন্তব্যরূপে। 'সর্বাসাম্ অপাং সমুদ্র একায়নম্'—উপনিষদ্ বলছেন—সমুদ্র যেমন সকল জলের একমাত্র গন্তব্য।

আমরা দেখব—আমরা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করলে আমাদের জীবনে পূর্ণতা আনতে পারব। সকলের জন্য সব সম্ভার নিয়ে যেন তিনি বসে আছেন, যে যা চায় তাকে তাই দেবেন। এই কথারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হল 'তোমাদের চৈতন্য হোক'। যাকে স্পর্শ করছেন, তার অনুভূতি হচ্ছে। আর-একজনের সঙ্গে তুলনা করে বলা যাবে না। তার নিজের যা লক্ষ্য তাতে সে উন্নীত হচ্ছে। এইজন্য স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে বলেছেন, কল্পতরু মানে যে যা চায় তাকে তা দেওয়া,—তা নয়, তিনি সকলকে পূর্ণত্বে নিয়ে যাবার জন্য যা প্রয়োজন তা দিয়ে দিচ্ছেন এবং 'চৈতন্য হোক' এইটি তাঁর সেই আশীর্বাণী।

সে-আশীর্বাণী আজও এই কাশীপুরের আকাশে বাতাসে সর্বদা ধ্বনিত হচ্ছে। আমরা সেই পুণ্যভূমিতে বসে আজ তাঁর চরিত্রের সামান্য যে-আলোচনা করলাম, তাতে আমাদেরই জীবন ধন্য হবে। আমরা হয়তো তাঁর কৃপা আর-একটু বেশি করে বুঝতে সমর্থ হব। তাঁর কৃপায় আমাদের সকলের চৈতন্য হোক।

এযুগের অসুখ

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

'পদ্মশ্রী' বিভূষিতা প্রবীণা লেখিকা—জ্ঞানপীঠ, রবীন্দ্র, লীলা, সাহিত্য আকাদেমী প্রভৃতি পুরস্কারে সম্মানিতা।

মানুষ যতই সভ্য হচ্ছে, শিক্ষিত হচ্ছে, বিজ্ঞানের দুরন্ত গতিতে ধরাকে সরাজ্ঞান করছে, এবং শুধু এই পৃথিবীখানাকেই নয় পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশকেও কব্জা করে ফেলতে পারছে বলে অহংকৃত হচ্ছে, ততই যে, সে উত্তরোত্তর দুঃখী বনে যাচ্ছে এতে কি সন্দেহ আছে ?

সভ্য দুনিয়া থেকে 'সুখ' শব্দটা ক্রমশই নির্বাসিত। নির্বাসিত অতএব সুখের পার্ষদগণও, 'স্বস্তি শান্তি, নিরাপত্তা নিশ্চিন্ততা'। নিশ্চিন্ততাহীন এই পৃথিবীতে 'সুখ' জিনিসটা কোথায় আশ্রয় পাবে ?

তাই আজকের দুনিয়া 'সুখহীনতার' অসুখে ভুগে চলেছে। যে দেশ যত ঐশ্বর্যশালী, সে দেশ ততো অ-সুখগ্রস্ত। মহাশক্তিশালী বিজ্ঞান অনবরত তার হাতে 'সুবিধে' আর 'স্বাচ্ছন্দ্য' নামের রঙিন খেলনাগুলি এগিয়ে দিয়ে দিয়ে তলে তলে কেড়ে নিচ্ছে তার অনেক শুভ !

আজকের বিজ্ঞানের শক্তির যে শেষ নেই, তাতে তো সন্দেহ নেই। সে যে কী করতে পারে আর কী করতে না পারে, তার দৃষ্টান্ত ওই সব ঐশ্বর্যশালী দেশগুলির জলে, স্থলে, আকাশে অন্তরীক্ষে প্রতিটি ধূলিকণাতেও বিধৃত। হয়কে নয়, নয়কে হয়, রাতকে দিন, দিনকে রাত করে কেনা তার কাছে কিছুই নয়।

এই ময়দানবীয় কাণ্ডের জন্যে বিজ্ঞান তার চতুর বিদ্যার কৌশলে জননী ধরিত্রীর বক্ষকোটরে সঞ্চিত লক্ষ লক্ষ বছরের তৈলসম্পদ শুষে তুলে নিচ্ছে, নিঃশেষ করে উপড়ে বার করে নিচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা খনিজ সম্পদগুলি। অনায়াসে কেটে সাফ্ করে ফেলছে কত শত বছর কালের নিবিড় গভীর অরণ্যছায়া, গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে কালের প্রহরী পর্বতমালাকেও। ক্ষমতার মদমত্তে যেন পৃথিবীটা দেউলে করে ফেলতেও পিছপা নয় সে !

ব্যাপরটা অনেকটা এইরকম, যেন বড়লোকের 'হঠাৎ নবাব' ছেলে সাতপুরুষের বিষয়-আশয়ের অধিকারটা হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়ে, তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছে। পরবর্তী বংশধরেদের কি থাকল না থাকল, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

প্রকৃতি অনন্ত ঐশ্বর্যময়ী ! 'অপব্যয়ের ভয় নাই তার পূর্ণের দান স্মরি !' তবু তারও একটা নিয়ম আছে ! নিয়মছাড়া সৃষ্টিছাড়া অপচয়ের কাণ্ড ঘটাতে থাকলে, কত জোগান দিতে পারবে প্রকৃতি ?

মাঝে মাঝে অবশ্য এই উড়নচণ্ডেপণার প্রতিক্রিয়ায় প্রতিকারের চেষ্টায় প্রায় উচ্ছেদ হয়ে আসা বন্যপ্রাণীদের পুনর্বাসন দেবার শুভবুদ্ধিতে 'ব্যাঘ্রপ্রকল্প' 'হাতী-সিংহ সংরক্ষণ' ইত্যাদি ছেলেখেলার আয়োজন হয়। বনমহোৎসবের আয়োজন করে পোঁতা হয় কিছু চারা গাছ। যার বেশির ভাগই হয়তো রক্ষার ভারপ্রাপ্তদের অবহেলায় গরু-ছাগলে মুড়িয়ে খায়।

যদিবা বাঁচে, তাতে ওই হাজার হাজার বছরের অরণ্যের ক্ষতির কতটুকু কী সুরাহা হবে ?

লোভ বড় ছোঁয়াচে রোগ। একবার যারা

জেনে ফেলেছে 'মরাহাতী লাখটাকা' 'কাঠের দাম সোনার তুল্য' তারা কি আর পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ভেবে লোভের হাত গুটিয়ে নেবে? চির নির্লোভ অরণ্যচারী আদিবাসীদের মধ্যেও লোভের সঞ্চার ঘটিয়ে চোরাকারবারীরা সাফ্ করে চলবেই বন আর বন্যপ্রাণী!

মানুষ ক্রমশই প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ঈশ্বরের সান্নিধ্যের অনুভূতিলাভের পরিবেশ হারাচ্ছে। যন্ত্রসভ্যতার ক্রমোন্নতিতে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, জল, বায়ু, শব্দ, স্পন্দন সব দূষিত হয়ে উঠছে, অথচ সেই সভ্যতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকা ছাড়া গতি নেই আজকের পৃথিবীর। এই জীবন তাকে বিজ্ঞানের ক্রীতদাস করে তুলেছে।

এই অবস্থা আশঙ্কা করেই একদা দূরদ্রষ্টা ঋষি কবি বলে উঠেছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।' আর লিখেছিলেন, 'মুক্তধারা'। রূপকের মধ্য দিয়ে অশনি সঙ্কেত!

কিন্তু কবির কথা শুনতে কার দায় পড়েছে? প্রকৃতিকে পরাজিত করে করে মানুষ বিজয় গর্বে উল্লসিত হচ্ছে, খেয়াল করছে না, তিলে তিলে দিনে দিনে দাস বনে যাচ্ছে নিজের হাতেগড়া দৈত্যের! তাই ক্ষমতালোভী প্রভুত্বপ্রিয় পৃথিবীর সব ঐশ্বর্যশালী দেশগুলির—গোপন ছত্রছায়াতলে বিজ্ঞানের ভূমিকা হচ্ছে বিশ্বধ্বংসী খুনে গোঁয়ারের।

সেই ছায়ার তলায় সে তৈরি করে চলেছে—মারণাস্ত্রের পর মারণাস্ত্র! ভয়ঙ্করের পর আরও ভয়ঙ্কর! স্বস্তি নেই, বিশ্রাম নেই! আরও কত বীভৎস নৃশংস অস্ত্র তৈরি করা যায়, তার মহলা চলেছে অবিশ্রাম গতিতে।

উপায় কী? বিজ্ঞান একদিকে যেমন ভেবে পুলকিত হচ্ছে এই সুন্দরী ধরণীকে মুহূর্তে ধ্বংস করে ফেলবার মতো শক্তি তার হাতে মজুদ, তেমনি সর্বদাই সশঙ্কিত হয়ে থাকছে, সেই রাক্ষসী শক্তি আর কারও ঘরে মজুদ আছে কিনা, থাকলে কতখানি?

তাসখেলায় যেমন তাসের পিঠে তাস মেরে হারজিৎ, এও প্রায় তেমনি! ত্রাসের পিঠে সন্ত্রাস, আর সন্ত্রাসের পিঠে ত্রাস বসিয়ে বসিয়ে হারজিতের অঙ্ক কষে, মরণ খেলার হারজিতের প্রস্তুতি! তবে শক্তিমানেরা অবশ্য ঠিক করে রেখেছেন, বিশ্বধ্বংস হয় হোক, তাঁর আসনটি অটুট থাকবে। ঈশ্বর-সংস্পর্শহীন সাধনার এটাই পরিণতি!

প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর লড়াইয়ে আজকের এই যন্ত্রবিজ্ঞান যেমন এক-একসময় জয়ের উল্লাসে স্ফীত হতে থাকে, তেমনি এক-একসময় প্রকৃতির প্রচণ্ড আক্রোশ ফেটে পড়ে তাকে তচ্‌নচ করতেও ছাড়ে না। তাতে বিনষ্ট হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ প্রাণ।

কিন্তু মহাশক্তিশালী বিজ্ঞান, যে নাকি তার শক্তির সিংহভাগটাই মারণাস্ত্রের পিছনে আর মহাকাশ বিজয়ে ব্যয় করে চলেছে। সে কি আজ পর্যন্ত পেরে উঠতে পেরেছে, একটি 'মৃত'কে প্রাণ দিতে?

একথা অবশ্য বলা হচ্ছে না জগতের কল্যাণকার্যে, মানবহিতার্থে, বিজ্ঞানের অবদান কিছু কম? সেখানে তো অভাবনীয় অত্যাশ্চর্যের নিত্য নমুনায় বিস্ময়ের পর বিস্ময়। তবু মনে হয়, তার 'জীবনদায়িনী' অবদানেব থেকে জীবনঘাতিনী অবদান বুঝি বেশি!

বুঝিবা ব্যাপক 'কল্যাণ কর্মের' আর 'অবশ্য প্রয়োজনীয়ের' উপকরণের থেকে বেশি আবিষ্কৃত হচ্ছে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার আর আরাম আয়েস সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণের!

কিন্তু না হয় তাই হল।

অতি ঐশ্বর্যশালী দেশগুলি সেইগুলির উপসত্ত্ব ভোগ করুক, আর সুখহীনতার অসুখে ভুগে মরুক! কী করা যাবে? কিন্তু ভাবনা এই, আমাদের এই দরিদ্রদেশেও যে, পাল্লা দেবার তাল চলছে, সেই সব দেশের সঙ্গে!

আজও আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে, আজও শতকরা ষাটজন নিরক্ষর, আজও পাঁচ বছরের শিশুও জীবিকা-অর্জনের তাড়নায় 'শ্রমিকের' পাতায় নাম লেখায়, মানুষ রোগে যত না মরে তার থেকে বেশি মরে চিকিৎসার অভাবে (যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞান আজ উন্নতির তুঙ্গে), আমাদের হাসপাতালে একখাটে দু-তিনজন রোগী গাদাগাদি করে শুতে বাধ্য হয়, এবং আরও কী হয় আর না হয় তা অবর্ণনীয়। তবু আমাদের ঘরে ঘরে রঙিন টি. ভি., ভি. ডি. ও., ফ্রীজ, জেনারেটর, রেকর্ড চেঞ্জার, টেপ্ রেকর্ডার, টেলিফোন এবং আরও অনেক কিছু!

অপর দেশের দেখাদেখি আমাদের চাহিদার তালিকা ক্রমবর্ধমান। অথচ সেই সব দেশের মতো সত্যিকার সমৃদ্ধি নেই। সমৃদ্ধির চেষ্টাই কি আছে? আমাদের মজ্জাগত অপরিসীম আলস্য, বিনাশ্রমে মুফতে সব পেতে চায়। কাজেই দিনে দিনে বেড়ে চলেছে দুর্নীতির অসংখ্য উপায়। চুরি করতে পারলেই যদি কাজ মিটে যায়, তো খেটে মরতে যাবে কোন্ নির্বোধ?

তাই আজ সমাজের শিরায় শিরায় 'ক্যানসারের' বিষের মতো ছড়িয়ে পড়েছে লোভ দুর্নীতি অন্যায় অসংযম!

দেশের উন্নতিকল্পে যে-টাকা বরাদ্দ হবে,—ধরেই নেওয়া হবে, তার সিংহভাগটি উঠবে রাঘব বোয়াল কর্মকর্তাদের পকেটে পকেটে! তার পর ঝড়তি পড়তি যা দিয়ে তৈরি হবে সেসব প্রকল্প, তার ওপরও হানা দেবে চুনোপুঁটি ছিঁচকেরা। তারা খুলে নিয়ে যাবে জলের পাইপ, বিদ্যুতের তার, পার্কের রেলিং, ম্যানহোলের ঢাকনি, রাস্তার আলোর বাল্‌ব, ট্রেনের গদি, বেসিন, শাওয়ার অসংখ্য ইত্যাদি—তালিকা দিতে গেলে মহাভারত!

এককথায় লোভের তাড়নায়, চাহিদার তাড়নায় সমাজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত অধিকাংশই তলিয়ে যেতে বসেছে নীতিহীনতার অতল গর্ভে।

তাই আজ আমাদের 'সব' থেকেও কিছু নেই!

অনেকটা যেন দোয়াত আছে কালি নেইয়ের মতো। অর্থাৎ 'ব্যবস্থা' আছে 'অবস্থা' নেই। নিষ্ঠাহীন বিশ্বস্ততাহীন সততাহীন কর্মকাণ্ডের ফলে আমাদের অনেক চেষ্টায় জমিয়ে তোলা আধুনিক জীবনের সমস্ত অবদানগুলি শুধু ঘরের শোভা মাত্র!

আমাদের দূরভাষণ আছে তাতে ভাষণ নেই! দূরদর্শন আছে 'দর্শনের' স্থিরতা নেই। আমাদের ঠাণ্ডা আলমারী আছে, ঠাণ্ডা নেই। সিলিণ্ডার আছে গ্যাস নেই, হীটার আছে আগুন নেই, গীজার আছে গরম নেই। শীততাপনিয়ন্ত্রণ করে রাখতে ঘরে মেশিন আছে, তাকে চালু রাখার উপায় নেই। নেই নেই, আরও কত কিছু নেই। কারণ সর্বশক্তির মূলাধার 'বিদ্যুৎ' নেই।

কেন নেই? সে প্রশ্ন করার মতো লোক নেই! অন্য সব দেশগুলিতে কী করে 'ময়দানবী-লীলা' অনাহত নিয়মে চলে, আর আমাদের এমন দশা কেন, এর জবাব দেবার লোকও নেই। তাই আশা আর বিশ্বাস করবার মতো ঠাঁইও নেই।

এই 'নেই' রাজ্যের বাসিন্দা আমরা! তবুও আমাদের মধ্যে চাহিদার শেষ নেই। কাজে লাগাতে পারি না পারি, তবু থাকুক। নইলে স্ট্যাটাস থাকে না।

এই চাহিদার পিছনে রয়েছে সেই আদি ও অকৃত্রিম তৃতীয় রিপু। সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য আরাম আয়েসের লোভ। অথচ সর্বদাই দেখছি সে গুড়েবালি। বস্তুপুঞ্জ জমিয়ে তোলাই সার। বেশির ভাগ সময়ই 'অচলে'র কারবার! তবু আছে তো! লোকে দেখছে তো আমি অভাগা নই।

অতএব আমরাও ক্রমশঃ 'সুখহীনতার অসুখে'র শিকার হয়ে চলেছি। প্রতিনিয়ত মানুষের মধ্যেকার মনুষ্যোচিত গুণগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে, আমরা আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি না, ভালবাসতে পারছি না, আপন ভাবতে পারছি না। তিলে তিলে নিঃসঙ্গ হয়ে চলেছি, আর দাসত্ব করে চলেছি সেই সভ্যতার। যে-সভ্যতা এখনও আমাদের কাছ থেকে বহু যোজন দূরে।

সেই যান্ত্রিক সভ্যতার কথাই বলছি—যা মানুষকে অবিরত উত্তেজনার মুখে ঠেলে দিয়ে দিয়ে উন্মত্ত করে তুলছে। সেই উন্মত্ততাটি আমাদের ঘরের উঠোনে এসে গেছে, অথচ অর্থনৈতিক অবস্থাটি আসেনি। যাওবা যতটুকু আসতে পারত, তাও আমরাই আমাদের হিতাহিতজ্ঞানহীন, দেশের মঙ্গলচিন্তাহীন, দেশাত্মবোধহীন, 'ব্যক্তিস্বার্থ'টিকে বড় করে দেখতে শিখে, তাকে আসতে দিচ্ছি না।

জানি না অন্য কোন সভ্য দেশে, কেউ ভাবতে পারে কিনা দাতব্য চিকিৎসার কেন্দ্র থেকে রোগীর পথ্য, শিশুর খাদ্য চোরাচালানের পথে চলে যায় ধনবানকে আরও ধনী করতে। জীবনদায়িনী ওষুধ চলে যায় কালো বাজারে। আস্ত সুস্থ শিশুকে বিকলাঙ্গ করে দিয়ে ভিক্ষুক বানানো হয়।

এতটা নৈতিক অবনতি কি ছিল দেশে? যখন আমাদের দেশে তথাকথিত সভ্য জীবনের চাহিদা ছিল না।

বলছি না যে আগে ঘুষ খাওয়া ছিল না, চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম ছিল না। ছিল সবই। কিন্তু এমন মহামারীর মতো ব্যাপক ছিল না।

এই ব্যাপকতার মূলে যা রয়েছে সেই 'অবস্থা-ছাড়ানো' চাহিদার মূলে আমরা মেয়েরাও কিছু কম দায়ী নয়। আমাদের মধ্যেকার লোভ আর দুরন্ত চাহিদাই অনেক সময় পুরুষকে ঠেলে দেয় দুর্নীতির পথে, অসাধু উপায়ের পথে।

যদিও বহির্বিশ্বে ক্ষমতার লোভ, প্রভুত্বের লোভ, অন্যকে পদানত করার লোভ পুরুষকে ক্রমশই সর্বনাশা পথে ঠেলে চলেছে, তবু বলব পারিবারিক জীবনে মেয়েদের কল্যাণময়ী শুভবুদ্ধি যেটুকু রাশ টানতে পারত, সেটুকুর অভাবে অথবা বিপরীতে তাকে ঠেলেই চলেছে। তাই সভ্যতার অহঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে পণপ্রথা, বধূহত্যা, বধূনির্যাতন। মূলকথা সেই লোভ।

আমরা সবসময় 'এখনকার ছেলেমেয়েদের' সমালোচনায় পঞ্চমুখ হই, কিন্তু তাদের চোখের সামনে কোন দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারছি আমরা? কোন আদর্শ!

এযুগের ছেলেমেয়েরা গুরুজনেদের মানে না।

ঠিক কথা। কিন্তু মানাবার জন্যে গুরুজনেদের মধ্যেও কিছু গুণ থাকা আবশ্যক নয় কী? গুরুজনেদের মধ্যে শ্রদ্ধাযোগ্য ত্যাগ কোথায়? সংযম কোথায়? ধৈর্য, সহ্য, সহানুভূতি কোথায়? আর সর্বতোভাবে প্রশ্ন আজকের মা-বাপ গুরুজনেদের মধ্যে তাঁদের গুরুজনেদের প্রতি মান্য শ্রদ্ধা কোথায়? মা-বাবা ছেলেমেয়েদের

সামনে অনায়াসে আপন গুরুজনেদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে চলেছেন, ভাবছেন না এর প্রতিক্রিয়া কী? সমালোচনা করে চলেছেন, আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী সকলেরই। আর সেটা ছোটদের সামনেই। কারণ নিজের মধ্যে কারুর জন্যেই নেই ভালবাসার সঞ্চয়।

তবে? শিশুর মধ্যে আসবে কোথায় সে জিনিস? তার মধ্যেও তো জমতে থাকবে শুধু বিদ্বেষ, ঘৃণা, উপেক্ষা, অবহেলা। মা-বাবা কি তার থেকে রেহাই পাবে?

তার ফলে আমাদের মধ্যেও যেমন সব থেকেও সুখহীনতার অসুখ, শিশুদের মধ্যেও তারই ছোঁয়াচ।

… …

কল্পনা করতে ইচ্ছে হয়, আজকের এই মহাশক্তিমান বিজ্ঞান নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী করে না তুলে যদি ঈশ্বরের সহকারী করতে পারত।

যদি বিজ্ঞানীরা মহৎ পরিকল্পনায় তাঁদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে পারতেন মানবসমাজের সত্যকার কল্যাণে। আজ যেমনভাবে উন্নত প্রণালীর চিকিৎসা মানুষের দেহযন্ত্রের আমূল সংস্কার সাধন করে ফেলতে পারছে, তেমনি সংস্কার করে ফেলতে পারছে তার অন্তরের যন্ত্রগুলিকে! সত্যিই কল্পনা করতে ইচ্ছে করে।

অলৌকিক কোন 'এক্সরে' আবিষ্কার করে ফেলে বিজ্ঞানীরা তন্ন তন্ন করে দেখে ফেলছেন মানুষের মনের অন্ধিসন্ধি। আর তার ওষুধ প্রয়োগ করে চলেছেন, সেই মন থেকে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংস্রতা, লোভ, পাপ, কুটিলতা, অসঙ্গত বাসনা, অন্যায় ইচ্ছাকে উচ্ছেদ করতে। ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে উঠছে 'মানুষ' নামের যোগ্য!

ভাবতে ভাল লাগে সেই চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কার হওয়ার গুণে, মানুষের সমাজে আর ত্রাস নেই, সন্ত্রাস নেই, আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় মারণাস্ত্রের পর মারণাস্ত্র তৈরির চাহিদা নেই।

সে হবে আর এক 'নেই'-এর জগৎ।

মানুষের প্রতি অবিশ্বাস নেই, অপ্রেম নেই, বিদ্বেষ নেই! নেই সর্বগ্রাসী স্বার্থপরতা!

সুস্থ সুন্দর নির্মল অখণ্ড আর একাত্ম, বিশাল এক মানবগোষ্ঠী সুখে বসবাস করবে এই জননী ধরিত্রীর স্নেহ কোলে। তখন আর থাকবে না সুখহীনতার অসুখ।

তাদের মধ্যে থেকেই কিছু জন চালিয়ে চলবে বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের সমন্বয়ে উন্নতমানের মহাকাশ জয়ের সাধনা। যে-সাধনা একদিন বলে উঠতে পারবে, 'এতো যদি দিলে নাথ, আরো দিতে হবে হে! তোমারে না পেলে পরে ফিরিব না, ফিরিব না!'

'তোমাকে' বাদ দিয়ে সাধনা করে চলেই তো আমরা আজ পৃথিবীতে ডেকে আনছি এত বিপর্যয়! এত অশান্তি, এত অ-সুখ!

বুলগেরিয়ায় কিছুদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

কলিকাতা 'রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব্ কালচারে'র সচিব। মিশনের শিক্ষা ও ভাবপ্রচারের ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে সুপরিচিত সন্ন্যাসী।

আমি সম্প্রতি বুলগেরিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়া ঘুরে এসেছি। উচ্চারণটা 'বুলগেরিয়া' অথবা 'বালগেরিয়া' (**Bulgaria**)? ওদের দেশে দেখলাম দুটো উচ্চারণই চলে। বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে গেছিলাম। সাহিত্যিকদের নিয়ে এই সম্মেলন। ৪৯টা দেশের ২০০ সাহিত্যিক এই সম্মেলনে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। বুলগেরিয়ায় ইউনিয়ন অব্ রাইটার্স নামে একটি লেখকগোষ্ঠী আছে। (সোভিয়েত রাশিয়াতেও ঐ একই নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে। খুব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। প্রচুর পয়সা আছে এই প্রতিষ্ঠানের এবং যদিও ঠিক ঠিক সরকারের অধীন নয় কিন্তু সরকারের উপর খুব প্রভাব আছে।) তারাই উদ্যোক্তা এই শান্তি সম্মেলনের।

এই শান্তি সম্মেলন এর আগেও চারবার হয়ে গেছে। প্রথম হয় ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ওদের দেশে একজন মন্ত্রী ছিলেন—লুদমিলা জিবকোভা। এখন যিনি বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান তাঁরই মেয়ে। এঁর দপ্তর ছিল সংস্কৃতি। ইনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কয়েক বছর আগে এক মোটর দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। বুলগেরিয়ার মানুষ এখনও তাঁর কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। এঁর নামে এরা একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে—'প্যালেস অব্ কালচার'। এই লুদমিলা জিবকোভাই ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক সম্মেলন শুরু করেন। তারপর কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর আরও তিনটে হয়েছে। এইটি হল পঞ্চম—যেটাতে আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। আমি সাহিত্যিক নই, কিছুই নই। কিন্তু তবুও তাঁরা কেন আমাকে ডাকলেন কে জানে?

ওঁদের আমন্ত্রণ পত্র পাওয়ার পর মঠের অনুমতি চাইলাম। অনুমতি পেয়ে ওঁদেরকে জানিয়ে দিলাম যে, যেতে পারব। কিছুদিন পরে দুটো টিকেট এসে উপস্থিত। একটা রোম হয়ে সোফিয়া যাওয়ার. আর-একটা মস্কো হয়ে যাওয়ার। দুটো পথেই যাওয়া যায়। রোম আমি আগে গিয়েছি। তাই ভাবলাম—মস্কো হয়ে যাব। ওঁদেরকেও সেই মতো জানিয়ে দিলাম।

কলকাতা থেকে দিল্লী রওনা হলাম ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৪। দিল্লী এয়ারপোর্টে নেমে শুনি 'এয়ার ইণ্ডিয়া'র মাইকে খোঁজ করছে: 'স্বামী লোকেশ্বরানন্দ কি এসেছেন?' আমি গিয়ে জানালাম: 'হ্যাঁ, এসেছি।' তখন ওঁরা জানতে চাইলেন, আমার মস্কো যাওয়ার ঠিক আছে কিনা। এই খাতির যত্নর জন্য আমাকে মস্কো এয়ারপোর্টে গিয়ে একটু ভুগতে হয়েছে, সে-কথায় পরে আসছি। দিল্লী থেকে এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে চাপলাম ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যায়। প্লেনে সবই রাশিয়ার যাত্রী। কেবল একটি ভারতীয় পরিবার—দক্ষিণ ভারতের। দিল্লী থেকে মস্কো পৌঁছতে লাগল ছ-ঘণ্টা। যখন মস্কো পৌঁছলাম, তখন মাঝরাত। সুতরাং ২০ অক্টোবর। আমাকে সবাই বলেছিল: মস্কোয় খুব শীত পড়ে, −৩০° সেন্টিগ্রেড। কিন্তু আমি যে-

সময়টা ছিলাম, খুব শীত পাইনি। –৩° বা –৪°। তবে এখানকার তুলনায় খুবই শীত। মস্কো থেকে সোফিয়ার পরবর্তী প্লেন ছিল দুদিন পর অর্থাৎ ২২ অক্টোবর। ২৩ থেকে সোফিয়ায় সম্মেলন শুরু হবে। চলবে ২৬ পর্যন্ত। এয়ার ইণ্ডিয়া থেকেই মস্কোর কোন হোটেলে এই দুদিন থাকার ব্যবস্থা করবে। এটাই নিয়ম।

মস্কো এয়ারপোর্ট সম্বন্ধে আমার খুব ভয় ছিল। কারণ কিছুদিন আগে কলকাতায় 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় একজন ভারতীয় মহিলার অভিজ্ঞতার কথা পড়েছিলাম। তিনি লিখেছেন: 'Via Moscow with no Love'. লণ্ডন থেকে তিনি মস্কো হয়ে ভারতবর্ষ আসছেন। মস্কো এয়ারপোর্টে তাঁকে অনেক দুর্গতি সহ্য করতে হয়েছে। যেন নজরবন্দী হয়ে আছেন। বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। টেলিফোন করবেন একজন পরিচিত লোককে, জিজ্ঞেস করতে গেছেন বাইরে যেতে পারবেন কিনা, এয়ারপোর্টের কর্মচারীরা বলে দিল: 'No permission'. একটু কেনা-কাটা করতে পারি কি? 'No permission'. যা কিছু করতে যান, তাতেই ওরা বলে: No permission. শেষে তিনি বিরক্ত হয়ে তাদের জিজ্ঞেস করেছেন: আচ্ছা, আমি যদি এখন আত্মহত্যা করতে চাই, তাহলে কি তোমরা আমায় 'পারমিশন' দেবে? তখন তারা একটু কটমট করে তার দিকে তাকাল, কোন উত্তর দিল না। এই ঘটনা ছাড়াও, আমাকে একজন বাঙালী ভদ্রলোক বলেছিলেন যে, ওখানে ওরা ধরেই নেয় যে, প্রত্যেকটি লোক যেন চোর বা গুপ্তচর। সামরিক পোশাক পরে সব বসে থাকে, কথা বলে না, গম্ভীর। এয়ারপোর্টের বাইরে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পাসপোর্ট, ভিসা এসব দেখাতে হয়। সেখানে গিয়ে দেখি টেবিলের ওপারে একজন সামরিক পোশাক পরা লোক। খুব গম্ভীর। রাশিয়ান ছাড়া অন্য কোন ভাষা বোঝে না। আর আমি রাশিয়ান বিন্দুবিসর্গও জানি না। আমার পাসপোর্টে আবার এমন একটা ছবি, যার সঙ্গে অন্য কারও চেহারার মিল থাকতে পারে, আমার চেহারার বিশেষ মিল নেই। অন্তত আমার তাই ধারণা। সেই লোকটি একবার আমার ছবির দিকে, আর একবার আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। আমি হাসছি—এদিকে ভিতরে ভিতরে ভয় করছে। আমি এতক্ষণ খেয়াল করিনি—ঐ ঘরের কাছেই আর-একজন দাঁড়িয়ে আছে। শীতের জন্য তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত গরম পোশাকে ঢাকা। পুরুষ কি মহিলা বুঝবার উপায় নেই। তিনি রাশিয়ান ভাষায় ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কি যেন বললেন। কি বললেন, বুঝলাম না, তবে কয়েকবার ইংরেজী 'ডিপ্লোম্যাট' কথাটি শুনলাম। ঐ মিলিটারী অফিসার তখন কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বললেন; তারপর একটা ছাপ মেরে আমায় ছেড়ে দিলেন। আমি বেরিয়ে আসছি—তখন সেই ব্যক্তি, যিনি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি হঠাৎ বলছেন: 'Maharaj, I am Mira' —মহারাজ, আমি মীরা। আমি তো অবাক। এখানে আবার 'মহারাজ' বলে ডাকছে। গলার স্বরে বুঝলাম মহিলা। সেই মহিলা বেরিয়ে এসে আমায় বললেন: 'Maharaj, I am Mira. Do you remember me? I visited your Institute' ইত্যাদি। তখন মনে পড়ল, ঐ মহিলা কয়েক মাস আগে ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন। তাঁর আসল নাম মারিয়ানা সালগালিন। রাধাকৃষ্ণণ যখন রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূত ছিলেন, ইনি ছিলেন তাঁর সেক্রেটারী। খুবই বিদুষী মহিলা। ভারতবর্ষের প্রতি গভীর ভালবাসা। তাই 'মারিয়ানা'-কে পাল্টে মীরা করে নিয়েছেন। বললেন: 'আমরা আপনাকে সোভিয়েত রাইটার্স ইউনিয়ন এবং

অ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্স-এর পক্ষ থেকে নিতে এসেছি। আপনি এখানে তাঁদের সম্মানিত অতিথি। আপনি সোফিয়া যাচ্ছেন আমরা খবর পেয়েছি। সোফিয়া যাবার আগে আপনি আমাদের অতিথি হিসাবে এখানে থাকবেন। আবার ফেরার পথে আপনাকে দিল্লীর প্লেনের জন্য এখানে যে-কদিন অপেক্ষা করতে হবে তখনও আপনি আমাদের অতিথি হিসাবে এখানে থাকবেন। আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাব, বক্তৃতার ব্যবস্থাও হয়েছে।' সুতরাং এয়ার ইণ্ডিয়ার হোটেলে আমার থাকার আর প্রশ্ন উঠল না।

আমার সঙ্গে মালপত্র বলতে ছিল, একটা স্যুটকেশ আর একটা ব্যাগ। সবাই মালপত্র নিয়ে চলে যাচ্ছে—আমার মালপত্র নেই। আমার মালপত্র আর পাওয়া যায় না! শেষে আমাকে যারা নিতে এসেছিল তারা গিয়ে খুঁজে-টুঁজে নিয়ে এল। ঐ যে দিল্লীতে এয়ার ইণ্ডিয়া এত খাতির যত্ন করছিল, ওরা আমার মালপত্রের সঙ্গে দুটো 'ট্যাগ' লাগিয়ে দিয়েছে: **'Handle with special care'.** ওরা বিশেষ যত্ন করে এমন জায়গায় মালপত্র দুটো রেখে দিয়েছে যে, কেউ আর খুঁজে বের করতে পারছে না!

মীরার সঙ্গে একটি যুবক ছিল। শুনলাম সেই আমার দোভাষীর কাজ করবে মস্কোতে। এয়ারপোর্ট থেকে ওরা আমাকে নিয়ে গেল 'হোটেল রাশিয়া'তে। সেটাই রাশিয়ার সবচেয়ে বড় এবং ভাল হোটেল। আমার জন্য একটা আলাদা স্যুইট-এর ব্যবস্থা ছিল। খুব ভাল আরামদায়ক ঘর। ঘরের মধ্যে টি. ভি., ফ্রিজ, রেডিও সব আছে। বাইরে অত ঠাণ্ডা—কিন্তু ঘরের মধ্যে গরম। হোটেলে আমার ঘরে পৌঁছে ওরা বলল: 'স্বামীজী, আপনার জন্য "ইণ্ডিয়ান টী" আছে।' আমি ভাবছি 'ইণ্ডিয়ান টী'-টা আবার কি? আমাদের দেশে আমরা যখন চা খাই, দুধ-চিনি মিশিয়ে দিই। অন্য দেশে দুধ, চিনি আর চা আলাদা করে পরিবেশন করে। যার যেমন ইচ্ছা, দুধ-চিনি মিশিয়ে নেয়। তাই 'ইণ্ডিয়ান টী' মানে ঐ দুধ-চিনি মেশানো চা। আমি অবশ্য ওদের বললাম না যে, আমি দুধ-চিনি ছাড়াই চা খাই—'ইণ্ডিয়ান টী' খাই না। যাই হোক, শীতের মধ্যে রাত্রিবেলা বেশ ভালই লাগল চা খেতে। রাত তখন আড়াইটা।

মস্কোয় দুদিন কাটিয়ে মস্কো থেকে আমি বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া গেলাম। মস্কোর কথা পরে বলব। কারণ সোফিয়া থেকে ফেরার সময়ও দিন কয়েক ওখানে থাকতে হয়েছিল। যাহোক সোফিয়া এয়ারপোর্টে নামতেই একজন যুবক এসে আমাকে দেখে বলছে: **'Keswarananda? Keswarananda?' Lokeswarananda**-র জায়গায় **Keswarananda.** আমি বললাম: **'Yes.'** ওরা ইংরেজী বিশেষ জানে না।

যুবকটির সঙ্গে আরও দু-একজন ছিল। ওরা আমাকে নিয়ে গিয়ে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসাল। মালপত্র সব ওরাই নিয়ে এল। আমায় কিছু করতে হল না। জানতে চাইল: চা খাব, না কফি খাব, না ঠাণ্ডা? একটা কিছু খেলাম। কি খেলাম মনে নেই। তারপর গাড়ি করে ওরা আমাকে একটা হোটেলে নিয়ে গেল। প্রকাণ্ড হোটেল। যে ঘরে বসাল, সেখানে ঐ 'হোটেল রাশিয়া'র মতো ব্যবস্থা। আমি যখন হোটেলে ঢুকছি, তখনই 'রিসেপ্শন' থেকে একজন আমার পাশপোর্টটি নিয়ে নিল। টিকিটটিও তার কাছে রেখে দিল। ঘরে এসে কিন্তু আমার চিন্তা হতে লাগল। কলকাতায় একজন বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, বিদেশে পাশপোর্ট কখনও হাতছাড়া করবেন না। পাশপোর্ট না থাকলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। তাই চিন্তা হচ্ছিল।

আমি বসে আছি আমার ঘরে। মাথায়

চিন্তাটা ঘুরছে। এমন সময় একটি যুবক এসে দেখা করল আমার সঙ্গে। মুখে দাড়ি, বেশ সপ্রতিভ সুন্দর চেহারা। ২৩।২৪ বছর বয়স। বলল: 'স্যর, আমি আপনার "ইণ্টারপ্রেটার"। আমার দেরি হয়ে গেছে। দয়া করে কিছু মনে করবেন না। "রাইটার্স ইউনিয়ন" থেকে আমাকে আপনার দোভাষী নিযুক্ত করেছে। আমি সারাক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকব।' শুধু দোভাষী নয়, 'রাইটার্স ইউনিয়ন' আমার ব্যবহারের জন্য সারাক্ষণ একটি গাড়িরও ব্যবস্থা রেখেছিল। দোভাষী যুবকটি বেশ চালাক-চতুর, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ে। যতদূর মনে পড়ছে, তার বিষয় হচ্ছে অর্থনীতি। তাকে বললাম আমার পাশপোর্টের কথা। সে খোঁজখবর নিয়ে এসে বলল: 'সব ঠিক আছে, আপনার পাশপোর্ট হোটেলে জমা রাখা আছে।' ওদেশে সব জায়গাতেই তাই দেখলাম। বোধ হয় সব দেশের হোটেলেই এই ব্যবস্থা। আমাদের দেশে কি নিয়ম জানি না।

বুলগেরিয়াতে গিয়েছিলেন স্বয়ং স্বামীজী—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। বুলগেরিয়া সম্পর্কে স্বামীজী দুটি মন্তব্য করেছিলেন। এক: এখানে এসে মনে হচ্ছে আমি যেন ভারতবর্ষে ফিরে এসেছি। ভারতেই আছি। কথাটা বলেছিলেন সম্ভবতঃ এই কারণে যে, বুলগেরিয়ার তখন খুব দুর্দিন। ভারতের মতোই দরিদ্র। আবার ভারতের মতোই পরাধীন। বুলগেরিয়া প্রায় ৬০০ বছর অটোমান টার্কের (তুরস্কের সম্রাটের) অধীনে ছিল। এখনও তার নিদর্শন রয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা—অনেক কিছুর মধ্যেই সেই তুরস্কের ছাপ রয়ে গেছে খানিকটা। আর একটা মন্তব্য স্বামীজী করেছিলেন: বুলগেরিয়া ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ার প্রভাবের মধ্যে পড়বে। ঠিক তাই হয়েছে।

বুলগেরিয়ার স্বাধীনতালাভের পিছনে অবশ্য রাশিয়ার অনেক অবদান আছে। স্বাধীনতার জন্য অনেক সংগ্রাম করেছে বুলগেরিয়া, কিন্তু পেরে ওঠেনি। রাশিয়ার জারেরা বারবার বুলগেরিয়াকে সাহায্য করেছে। অবশেষে বুলগেরিয়া স্বাধীন হয়। রাশিয়ার সাহায্যেই হয়। দু-লাখ রুশ সৈন্য তাতে মারা যায়। যে 'জার'-এর সাহায্যে এটা সম্ভব হয়, বুলগেরিয়া তাকে ভুলতে পারেনি। সেই জারের বিরাট মূর্তি গড়ে রেখেছে তারা। ঐ ঘটনাকে মনে রাখার জন্য ওরা একটা বিরাট গির্জাও তৈরি করেছে। সেটা এখনও রয়েছে। এই হচ্ছে প্রথম বিপ্লব। তখন যারা ক্ষমতায় আসে তারা কম্যুনিস্ট নয়। এর পরে আর-একটা বিপ্লবের মাধ্যমে কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় আসে। ওরা বলে এটাই ঠিক ঠিক স্বাধীনতা। এখন কম্যুনিস্টরা ঐ দেশ চালাচ্ছে।

ওদের দেশের লোক দুজনকে প্রায় পূজো করে। একজনের নাম আগে উল্লেখ করেছি—লুদমিলা জিবকোভা। আর-একজন হচ্ছেন কবি ভাপট্সারোভ। ইনি বিপ্লবের কবি। এই কবির একটি বই ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে। অধিকাংশ কবিতাই শ্রমজীবীদের নিয়ে। তাঁর একটি ছোট কবিতার নমুনা দিচ্ছি: **Spring in the factory**—কারখানায় বসন্ত। কারখানার মধ্যে কারও প্রবেশাধিকার নেই। কর্মীরা সব কাজ করে চলেছে। অক্লান্ত পরিশ্রম। নীরস একঘেয়ে জীবন। এরই মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল, কর্মীদের মধ্যে খুশির ছোঁয়া। তারা বলাবলি করছে: বসন্ত এসে গেছে। বসন্ত এসে গেছে। যারা কারখানা পাহারা দিচ্ছিল, তারা বলছে: কি করে এল? আমাদের কর্মীর তালিকায় তো বসন্তের নাম নেই। তাহলে কি করে কারখানায় ঢুকল সে? খুব উদ্বিগ্ন তারা। তারা খুঁজতে

শুরু করেছে অনধিকার প্রবেশকারীকে। শেষে দেখা গেল, যারা খুঁজছে তারাও খুব খুশি। তাদের মনেও বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। এই সব কবিতার মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের মনে বিপ্লবের প্রেরণা যোগাতেন। তখনকার শাসকরা তাই তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র তেত্রিশ। মৃত্যুর আগে তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশে তিনি একটা কবিতা লেখেন। খুব মর্মস্পর্শী কবিতা। কিন্তু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেও বুলগেরিয়ার মানুষ আজও তাঁকে মনে রেখেছে। ভাপট্সারোভ এখন বুলগেরিয়ার জাতীয় কবি।

সারা বুলগেরিয়ার লোকসংখ্যা আশি লক্ষ। আমাদের কলকাতার চেয়েও কম।

পঞ্চম সাহিত্যিক সম্মেলনে আলোচনার বিষয় ছিল : আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা। আমেরিকার এক বৃদ্ধ সাহিত্যিক হারস্কিন কলওয়ে (৮৪ বৎসর বয়স) প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন। তিনি শুধু সাহিত্যিক নন, সাংবাদিকও। স্পেনের যে গৃহযুদ্ধ তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। আর দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ তো দেখেছেনই তিনি। বললেন : যুদ্ধ মানুষকে অমানুষ করে, মানুষের মূল্যবোধ, মানুষের মানবিকতা—এ সমস্ত নষ্ট করে দেয়। সবচেয়ে ক্ষতি করে শিশুদের। যুদ্ধের জন্য যে খাদ্যাভাব হয়, দেখেছি। অনাহারে শিশুরা ছটফট করছে, অনেকে মারা যাচ্ছে, দেখেছি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আরও সব বর্ণনা দিলেন যুদ্ধের। ভয়াবহ সব বর্ণনা। একদিন বক্তৃতা হল, কয়েকজন বললেন। আর দুদিন ছোট ছোট দলে নানারকম আলোচনা হল। আলোচনার নানারকম বিষয়বস্তু, কিরকম কবিতা লেখা উচিত, কিরকম উপন্যাস হওয়া উচিত; অনুবাদ, প্রকাশনের মান কেমন হওয়া উচিত; ইত্যাদি। এই সব আলোচনা যদিও সাহিত্য বিষয়ে—হচ্ছে কিন্তু শান্তিকে লক্ষ্য রেখে। সবাই বলছে : পারমাণবিক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। যদি তা হয়, তাহলে তা শুধু আক্রান্ত দেশ বা আক্রমণকারী দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সারা পৃথিবী তাতে জড়িয়ে পড়বে। মানব-জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। গাছপালা, জন্তুজানোয়ার সব শেষ হয়ে যাবে। জীবন বলে কিছু থাকবে না। এখন, এই ভয়াবহ যুদ্ধ যাতে না বাধে, তার জন্য সাহিত্যিকরা কি করতে পারেন? এই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। আমাকেও ওঁরা বলবার সুযোগ দিয়েছিলেন। আমার পোশাকের জন্যই সম্ভবতঃ—লক্ষ্য করছিলাম, টি.ভি., ক্যামেরা প্রায় সব সময় আমার দিকেই ঘোরানো আছে। প্রেসের লোকও সম্ভবতঃ ঐ কারণেই আমার সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী। একটা অধিবেশনের পরে একটা জায়গায় বসে হয়তো কারও সঙ্গে কথা বলছি, একজন কার্টুনিস্ট এসে দেখাচ্ছে : আমার একটা ছবি, তক্ষুণি সে এঁকেছে। আমি দেখে বললাম : মোটেই আমার মতো হয়নি। টুপি আর চশমা ছাড়া ওর মধ্যে আমার আর কোন লক্ষণ নেই। সে তখন নতুন করে আবার এঁকে দেখাল। তখন মনে হল, কিছুটা যেন আমার মতো হয়েছে। সে বলল : 'তুমি এটা সই করে দাও, আর তোমার মাতৃভাষায় একটা বাণী লিখে দাও।' সই করলাম, লোকেশ্বরানন্দ এবং বাংলা আর ইংরেজীতে লিখলাম, 'শান্তি, শান্তি, শান্তি'—'Peace, peace, peace'। পরে ওখানকার কাগজে ঐ ছবিটা বেরিয়েছিল। আমাদের কয়েকজনের বক্তৃতাও কিছুটা কিছুটা করে কাগজে বেরিয়েছিল। ওরা রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন বা সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে বলে মনে হয় না। কিন্তু এটা ওরা বুঝতে পেরেছিল যে, আমি ধর্মজগতের লোক। ঐ সভা যখন শেষ হল, মঞ্চ থেকে যখন নেমে এলাম (এবং

অন্য সময়ও), অনবরত লোক আমার কাছে এসে বলেছে : 'Please bless me.' আমরা তো মনে করি কম্যুনিস্ট দেশ, ধর্ম-টর্ম নেই। কিন্তু তাদেরও সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের জন্য একটা তৃষ্ণা রয়েছে। আর, আমাদের দেশে যেমন প্রতি পাড়ায় একটা না একটা মন্দির, ওদের দেশেও তেমনি অলিতে-গলিতে গির্জা। ওদের অনেকের সঙ্গেই কথা বলে দেখলাম যে, ওরা খুবই গর্বিত, ওদের একটা ধর্মীয় দৃষ্টি আছে বলে। ওরা ধর্মের কথাই বেশি শুনতে চায়। আমাকে একজন যুবক এসে বলল : 'We are spiritually starved. Give us spiritual food.' আমাকে অনেকে এসে জিজ্ঞেস করছে : ধর্ম কি জানতে চাই। কেউ আবার জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে জানতে চায়। দেখলাম, ওদের দেশে ধর্মের ভাব মানুষের মধ্যে খুব প্রবল। সরকার এ ব্যাপারে পুরো নিরপেক্ষ। সরকার নিষেধও করছে না, উৎসাহও দিচ্ছে না। বহু লোক গির্জায় যায়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই বেশি—তবে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েও আছে। ভারতীয় ধর্মের দিকে তাদের খুব ঝোঁক।

ওখানকার রাষ্ট্রপ্রধান—মিঃ জিবকোভা আমাদের একটা ভোজসভায় ডাকলেন। বিরাট একটা বাড়িতে বিরাট ব্যাপার। রাজপ্রাসাদ—রাজকীয় আয়োজন। খাওয়ার পরে সবাই আমাকে ঘিরে ধরেছে—আমার কাছে ধর্মের কথা শুনতে চায়। তারা বুঝতে পেরেছে যে, আমি একজন ভারতীয় সাধু। আমাকে এসে অনেকে বলেছে : 'আমাকে একটা মন্ত্র দাও, আমি সেটা জপ করব।' আমি বললাম : 'আমি মন্ত্র দিতে পারি না।' একজন এসে জিজ্ঞেস করেছে : 'আমাকে একজন চিঠি লিখেছে—সেই চিঠির প্রথমে এবং শেষে সে লিখেছে "ওঁ রাম"। এই "ওঁ রাম" মানে কি ?' আমি জানতে চাইলাম : 'যে চিঠি লিখেছে, সে তোমাদের দেশের লোক, না ভারতীয় ?' সে বলল : 'আমাদের দেশেরই লোক। সে একবার দিল্লী গেছিল। দিল্লী থেকে ফিরে এসেই দেখছি, ও ঐরকম লিখছে।' আমি বললাম : '"ওঁ" হচ্ছে ভগবানের প্রতীক। আর ভগবানকে তো আমরা নানা নামে ডাকতে পারি। "রাম" হচ্ছে ভগবানের একটি নাম।' যারা আমার কাছে আসছিল, তারা সকলে দেখলাম অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র। এই বিনয়, ভদ্রতা যেন তাদের মজ্জাগত। একটি বৃদ্ধার কথা আমি ভুলতে পারব না। ভাঙা ভাঙা ইংরেজী জানে সে। আমাকে বারবার বলছে : 'Please bless my Andree.' অ্যাণ্ডি হচ্ছে তার ছেলে—খুব অসুস্থ। আমি বললাম : 'God will bless him.' ঐ মহিলাই আমাকে বললেন : 'আমাকে তুমি একটা বাংলা "গীতাঞ্জলি" পাঠিয়ে দেবে ?' আমি বললাম : 'বাংলা তুমি জান কি ? "গীতাঞ্জলি" নিয়ে কি করবে ?' উনি বললেন : 'সোফিয়া ইউনিভার্সিটিতে একজন বাঙালী আছেন। তাঁর কাছে আমি একটু একটু বাংলা শিখছি। আমার ইচ্ছে "গীতাঞ্জলি" আমি বুলগেরিয়ান ভাষায় অনুবাদ করব।' আমি বললাম : 'আচ্ছা, চেষ্টা করব পাঠাতে।'

ওদের দেশে যা গির্জা আছে, আমাদের দেশে তত মন্দির নেই। সরকার থেকে গির্জাগুলি রক্ষা করা হচ্ছে। সরকারের যা বাজেট, তার শতকরা ১১ ভাগ ঐ গির্জাগুলির জন্য ব্যয় হয়। গির্জাগুলি সবই এখন মিউজিয়াম। গির্জাতে নানারকম আসবাব পত্র আছে। আর আছে 'আইকন্‌স্' অর্থাৎ নানারকম মূর্তি, ছবি ইত্যাদি—হীরা, মুক্তা, মণিমাণিক্য দিয়ে সব গাঁথা। শত শত বছরের সব পুরানো। আর অপূর্ব শিল্পকলা। গির্জাগুলিতে দেখলাম প্রণামীর বাক্স রাখা আছে—অনেকে সেখানে পয়সা দেয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে প্রতিষ্ঠান আমরা দেখেছি, সেটা

একটা মঠ। একটা পাহাড়ের উপর এই মঠ। পাহাড়ের নাম 'রীলা পাহাড়'। বল্কান উপত্যকার মধ্যে এই পাহাড় সবচেয়ে উঁচু। হাজার বছরের পুরানো মঠ। সোফিয়া শহর থেকে ২০০ কি. মি. দূরে। কী অপূর্ব মঠ! বিরাট জায়গা। আগে সেখানে চারশো সাধু থাকতেন। এখন মাত্র জনা চল্লিশেক আছেন। এই মঠটিও এখন একটি মিউজিয়াম। প্রচুর ধন-সম্পদ এই মঠের। কারণ দেশটা ধর্মপ্রাণ। আর এই মঠ তাদের ভালবাসার জিনিস। তাই যে যা পেরেছে, অকৃপণভাবে এই মঠকে দিয়েছে। এই মঠ ওদের ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। ওদের জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল এই মঠ থেকে। মঠের সাধুরাই ঐ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাই সরকার খুব কৃতজ্ঞ এই মঠের প্রতি এবং এই মঠ রক্ষা করার জন্য সর্বদা তারা সযত্ন। তবে সাধুদের ভরণপোষণের জন্য সরকার কোন অর্থ দেয় না। আমি ঐ সাধুদের জিজ্ঞাসা করলাম: 'কিসে চলে আপনাদের?' ওঁরা বললেন: নানারকম বই, পিকচার-পোস্টকার্ড বিক্রি করে আর পাউরুটি তৈরি করি, তা বিক্রি করে। এতেই ওঁদের চলে যায়। মনে হল ঐ মঠের পাউরুটির খুব নাম আছে। আমি অবশ্য খাইনি। কিন্তু দেখলাম দেশী-বিদেশী যারাই ঐ মঠ দেখতে আসছে, পাউরুটির খোঁজ করছে আর কিনে খাচ্ছে। বহু লোক আসে পাহাড়ের উপর ঐ মঠ দেখতে। খুব নির্জন। মাঝে মাঝে দু-একটা ভালুক ছাড়া জন্তুজানোয়ারের উৎপাতও বিশেষ নেই। আমি কল্পনায় ভাবতে চেষ্টা করছিলাম: চারশো সাধু যখন এই নির্জন মঠে থেকে ধ্যান-ধারণা, ঈশ্বর-চিন্তা করত, তখন কি অদ্ভুত আধ্যাত্মিক পরিবেশ এখানে ছিল!

ওদেশে গিয়ে আমার একটা ধারণা হয়েছে যে, বুলগেরিয়া অনেকটা রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে। রাশিয়া এমন গাঁটছড়া বেঁধে রেখেছে যে, রাশিয়া উঠতে বললে ওঠে, আর বসতে বললে বসে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম—হয়তো ভুল হতে পারে আমার—একটা চাপা রেষারেষি ভাব দু-দেশের মধ্যে রয়ে গেছে। বুলগেরিয়া কখনও রাশিয়ার নাম করে না। রাশিয়ার 'জার' যে এক সময় ওদের স্বাধীনতা লাভ করতে সাহায্য করেছিল, দু-লক্ষ রুশ সৈন্য মারা গেছিল, —সেটা ওরা স্বীকার করে, কিন্তু ইদানীংকালে রাশিয়া ওদের সাহায্য করছে, ওরা খুব কৃতজ্ঞ— এ-ধরনের কথা একবারও বলল না।

দু-দেশের মধ্যে যে একটা রেষারেষি আছে, সেটা বেশ বুঝতে পারা গেল একটা ফুটবল ম্যাচের মধ্য দিয়ে। হোটেলে বসে আছি। হঠাৎ আমার দোভাষী ছেলেটি এসে হাজির। মুখে চোখে উত্তেজনা। বলছে: 'তুমি "সকার" জান?' 'সকার' অর্থাৎ ফুটবল। আমি বললাম: 'হ্যাঁ, জানি।' —'তোমাদের দেশে ছেলেরা সকার খেলে?' আমি বললাম: 'ছেলেরা কেন, মেয়েরাও খেলে। আমিও খেলেছি এক সময়।' তখন সে বলছে: 'তুমি সকার দেখবে? আজ খুব বড় একটা খেলা আছে। বুলগেরিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার।' আমি তখন ওকে একটু ক্ষ্যাপাবার জন্য বললাম: 'তা তোমরা কি আর রাশিয়ার সঙ্গে পেরে উঠবে? রাশিয়া নির্ঘাৎ তোমাদের হারিয়ে দেবে।' সে বলল: 'না, না, আমরাও কম না। আমরাও কতবার রাশিয়াকে হারিয়েছি।' যাই হোক, সে বলে গেল যে, রাত আটটার সময় আমার ঘরে আসবে। তখন আমি আর সে দুজনে মিলে টি. ভি.-তে খেলা দেখব। আটটার সময় তার আর পাত্তা নেই। আসলে অন্য কোথাও বসে সে টি. ভি-তে খেলা দেখায় মজে গেছে। আমার কথা আর তার মনে নেই। ঘরে টি. ভি. রয়েছে। আমি এই বোতাম সেই

বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে দেখি পর্দায় খেলা ভেসে উঠল। দু-দলের খেলা হচ্ছে। ধারা-বিবরণীও হচ্ছে। কিন্তু কোন্‌টা যে কোন্ দল বোঝার উপায় নেই। কারণ ভাষা জানি না। আবার দু-দলের জার্সির রঙও টি. ভি.-তে একই রকম মনে হচ্ছে। খেলা দেখে যেতে লাগলাম। হঠাৎ একটা গোল হয়ে গেল এক-দিকে। গোটা মাঠ থমথমে, একটা হাততালি নেই, কিছু নেই। তখন মনে হল: সম্ভবতঃ বুলগেরিয়া গোল খেয়েছে। কারণ দোভাষীর কাছ থেকে এইটুকু জেনেছিলাম যে, বুলগেরিয়াতেই খেলা হচ্ছে। একটু পরে অপর পক্ষ গোল শোধ করে দিল। তখন সারা মাঠে উল্লাস। তখন নিঃসন্দেহ হলাম কোন্ দিকটা বুলগেরিয়া আর কোন্ দিকটা রাশিয়া। দেখতে দেখতে আরও দুটো গোল দিল বুলগেরিয়া। সারা মাঠ আনন্দে একেবারে যেন ফেটে পড়ছে। ৩—১ গোলে হেরে গেল রাশিয়া। খেলা চলার সময় লক্ষ্য করছিলাম, বুলগেরিয়ার একটি খেলোয়াড় ১১ নং জার্সি, খুব ভাল খেলছিল। রাশিয়ানরা বারবার তাকে লাথি মারছে আর সে পড়ে যাচ্ছে। রেফারী হুইসেল দিল দু-একবার। কিন্তু খুব একটা সুবিধা করতে পারল বলে মনে হল না। বুলগেরিয়ার দু-একটা পেনাল্টি কিক্ পাওয়া উচিত ছিল। আমি জানি না, রেফারী কোন্ দেশের—বুলগেরিয়ার, রাশিয়ার, না তৃতীয় কোন দেশের।

খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার বেশ খানিকক্ষণ পরে সেই দোভাষী ছেলেটি এসে উপস্থিত। সে এসে বলছে: 'Honourable Swami, (এই-ভাবেই সে আমায় সম্বোধন করত) I am very sorry. আমার বন্ধু-বান্ধবরা সব নিচের ঘরে ধরে বসাল। ওখানে টি. ভি. চলছিল। ওখানেই খেলা দেখতে বসে গিছলাম। আমি আর তোমার কাছে আসতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করো।' আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'কি হল ফল?'—'আমরা জিতেছি।' আমি বললাম: '৩—১ গোলে?' সে অবাক: 'জানলে কি করে? তুমি খেলা দেখেছ?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ', সে বলল: 'দেখেছ ১১নং খেলোয়াড়কে কিরকম মারছিল ওরা, আর রেফারী কিরকম দুর্বল?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ, সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি। দু-দলের মধ্যে ১১নং-এর খেলাই সবচেয়ে ভাল লাগল।'

বুলগেরিয়া ছোট দেশ। কিন্তু খুব সুন্দর দেশ। সারা পৃথিবী থেকে বহু পর্যটক বুলগেরিয়ায় আসে। ওদের দেশে বিশেষ কোন শিল্প নেই। ওরা বলে 'ট্যুরিজম্' ওদের প্রধান শিল্প। বাস্তবিক এই পর্যটকদের দৌলতে ওদের বিরাট আয় হয়। জীবনের মান বেশ উন্নত। রাস্তাঘাট চমৎকার। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি। মানুষগুলির স্বাস্থ্যও খুব ভাল, পোশাক-পরিচ্ছদও ভাল। আর সকলেই বেশ হাসি-খুশি। সবাই কাজ পায়। অনেকে আবার ছাত্র-অবস্থাতেই বিয়ে করে। তা বলে মা-বাবার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একেবারে শিথিল হয়ে যায় তা নয়। বুলগেরিয়া বা রাশিয়া দু-দেশেই দেখেছি, মা-বাবার প্রতি ছেলেমেয়ের খুব আকর্ষণ। ছাত্রজীবন থেকেই প্রত্যেকে একটা কাজ খুঁজে নেয়। বাবা-মার উপর নির্ভর করতে চায় না। আমার যে দোভাষী, সে ছাত্র, কিন্তু চাকরি করে। বিয়ে করেছে এবং স্ত্রীও একটি কাজ করে। ও যা হিসেব দিল তাতে মনে হল সাত-আটশো টাকা পায়। সেটা বড় কিছু নয়। ওর স্ত্রী আর একটু বেশি পায়। ছেলেটি সংবাদ-পত্রে কাজ করে। আমি বললাম: 'এই কাজটা কি তোমার মনের মতো?' ও বলল: 'হ্যাঁ, আমার মনের মতো।' আমি জানতে চাইলাম: 'তুমি সাংবাদিকতার কতখানি জানো যে, ওরা তোমাকে এই কাজের উপযুক্ত মনে করল?'

সে বলল : ‘দেখ, আমি যে এক্ষুণি সাংবাদিকতার বিশেষ কিছু জানি, তা নয়। আমি দরখাস্ত করেছিলাম। আমাকে কিছু লিখতে বলেছিল, লিখেছিলাম। তারপর ওরা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। তাতে ওদের মনে হয়েছে, আমার মধ্যে সাংবাদিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখন ওরাই আমাকে তৈরি করে নেবে।’ তার স্ত্রীও একটা বাচ্চাদের স্কুলে পড়ায়। এই কাজটা ওর স্ত্রীর খুব পছন্দ নয়। তবে মাইনে বেশি। বুলগেরিয়া আর রাশিয়া দু-দেশেই শিক্ষকদের খুব মোটা বেতন।

আমার খুব ইচ্ছে ছিল বুলগেরিয়ার গ্রাম দেখা। কারণ গ্রাম দেখলে একটা দেশকে ঠিক ঠিক চেনা যায়। সোফিয়া থেকে রিলা পাহাড়ে যাবার পথে সে সুযোগ হয়ে গেল। প্রায় ২০০ কি. মি. পথ। এই ২০০ কি. মি. রাস্তার মধ্যে আর কোন শহর নেই। দু-পাশে শুধু গ্রাম। ছোট ছোট পাহাড়, তার উপর পাথরের ঘরবাড়ি। বাড়িগুলি খুব সুন্দর; সাজানো-গোছানো। যারা কাজ করছে মাঠে, অধিকাংশই মেয়ে। তাদের হাতে গ্লাভস পরা, আর জামা-জুতো পরে কাজ করছে। রাস্তার দু-ধারে যতদূর দৃষ্টি যায়, সবুজ আর সবুজ। এতটুকু রুক্ষতা নেই। জিজ্ঞেস করলাম : ‘চাষের জল পাও কোথায়?’ ওরা দেখালো : ‘দূরে নদী আছে, মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা আছে। সেখান থেকে লম্বা লম্বা পাইপের সাহায্যে চারিদিকে সেচের জল দেওয়া হচ্ছে।’ আর-একটা দৃশ্য দেখে খুব ভাল লাগল। অসংখ্য ভেড়া চরছে—ঘাসে মুখ দিয়ে ঘাস খাচ্ছে, আর একটি লোক লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় টুপি, গায়ে আলখাল্লা আর সঙ্গে একটা কুকুর। ছোটবেলায় বাইবেলের পৃষ্ঠায় ঠিক এইরকম ছবি দেখেছিলাম মেষপালকের। আমার মনে হল, আমি যেন হঠাৎ যীশুখ্রীষ্টের যুগে চলে গেছি।

ওখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমাদের একটু অসুবিধে হয়। রাশিয়াতে আরও অসুবিধে হয়। ওরা আমিষ খাবার যা দেয়, তা খাওয়া চলে না। আবার নিরামিষেরও ভাল ব্যবস্থা নেই। আমিষ খাবার বলতে হয় গরুর মাংস, নয় শুয়োরের মাংস। নয়তো দুটো মিশিয়ে আর-একটা কিছু। ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশ থেকে অন্য যাঁরা গেছিলেন, তাঁরা দেখলাম গরু-শূয়োর বেমালুম খেয়ে গেলেন। আমি খেতাম দু-এক-টুকরো রুটি, শশা, টম্যাটো আর দই। পাশ্চাত্য দেশে ওরা দইকে ‘ইয়োগার্ট’ বলে। খুব ভাল দই। প্রায় এক বাটী দই খেয়ে ফেলতাম। আর আইসক্রীম বা চীজ একটু আধটু খেতাম।

ভারতে ফেরার পর দিল্লীতে বুলগেরিয়ান এমব্যাসীর যিনি সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান, তাঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। তিনি একজন মহিলা—মিসেস কামোভা। বুলগেরিয়া যাবার আগেই উনি আমাকে বলেছিলেন : ‘ফিরে এসে আমাকে বলবেন, আমাদের দেশ কেমন লাগল।’ সেই মতো দিল্লীতে ফিরে ওঁর কাছে গেছি। উনি আমাকে খুব খাতির-যত্ন করলেন। তারপর নানা কথাবার্তার পর জিজ্ঞাসা করলেন : ‘ওদেশে তোমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন কষ্ট হয়নি তো?’ আমি বললাম ; ‘তোমাদের দেশের অত ভাল দই—কষ্ট হবে কেন?’ কিন্তু ওঁর গর্ব দেখলাম, ওঁদের দেশের চীজ সম্বন্ধে। বললেন : ‘আর চীজ খাননি? বড় ভাল চীজ আমাদের!’ আমি বললাম : ‘হ্যাঁ, তাও খেয়েছি।’ উনি তখন বললেন : ‘আমাদের দেশের সেরা চীজ আপনাকে এখন খাওয়াব।’ আমি তো প্রমাদ গুনছি। রাশিয়ায় চীজ খেয়ে খেয়ে আমার তখন চীজ-এর নাম শুনলেই ভয় করছে। কি আর করব? উনি তিনরকম চীজ নিয়ে এলেন আমার জন্য। বললেন : ‘ভেড়ার

দুধের চীজ, বিশেষভাবে তৈরি। ভেড়াকে নির্দিষ্ট জায়গায় বিশেষ ধরনের ঘাস খাওয়ানো হয়েছে। সেই ঘাস খেয়ে ভেড়া যে দুধ দিয়েছে, সেই দুধের থেকে এই চীজ তৈরি হয়েছে। খেয়ে দেখুন কেমন?' কি আর করি? খেলাম। কোন বিশেষত্বই বুঝতে পারলাম না। মুখে অবশ্য বলতে হল: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল।'

আমার দোভাষী ছেলেটির সম্বন্ধে আর একটু বলি। বেশ দায়িত্বশীল ছেলে। আমাকে যতটুকু ওর সাহায্য করার কথা, আন্তরিকভাবে করেছে। প্রতিদিনই সকাল নটা-দশটার সময় আসত। সারাদিন আমার সঙ্গে থাকত। একদিন দুপুর হয়ে গেছে, তবুও সে আর আসে না। প্রায় দুটোর সময় এল। একেবারে অন্য মানুষ। চোখ লাল, উস্কো-খুস্কো চুল। এসে পাঁচ মিনিট ধরে কি সব কথা বলে গেল, কিছু বুঝতে পারি না। শেষকালে আমি বললাম: 'কি ভাষায় কথা বলছ আমার সঙ্গে? আমি তো ইংরেজী ছাড়া কিছু জানি না।' তখন সে বলছে: 'আমি খুব দুঃখিত। কাল রাত তিনটে পর্যন্ত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মদ খেয়েছি। এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছি। কার সঙ্গে কথা বলছি, কোথায় এসেছি—সব আমি ভুলে গেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না, আমাকে ক্ষমা করবেন।' খুব দুঃখ হল আমার। বললাম: 'তোমার ২৩।২৪ বছর বয়স, ছাত্র। কেন তুমি মদ খাবে?' সে বলল: 'মদ আর সিগারেট আমাদের দেশে সবাই খায়।' সেটা অবশ্য আমিও লক্ষ্য করেছি। মেয়েরাও সিগারেট খায়। বললাম: 'তা বলে তুমি এতটা মদ খাবে যে, তুমি বেহুঁশ হয়ে যাবে? স্থান-কাল ভুলে যাবে? তোমার নটা-দশটায় সময় আসবার কথা, এলে দুটোর সময়! আমার অবশ্য সেজন্য কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তোমার কেন এরকম বদ অভ্যাস হবে?' সে বলল: 'আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে।' আমার যেটা ভাল লাগল, সেটা হচ্ছে এই: আমার সঙ্গে তো ছেলেটির দুদিনের আলাপ। ভিন্ দেশের লোক আমি। আমার তিরস্কারের উত্তরে সে তো আমাকে কয়েক কথা শুনিয়ে দিতে পারত! তা না করে, মাথা নিচু করে আমার ধমক শুনল, তার দোষ স্বীকার করল।

ছেলেটি বেশ সুপুরুষ আর বুদ্ধিমান। ওর মাও খুব বুদ্ধিমতী মহিলা। 'ফরাসী ভাষা খুব ভাল জানেন—ইংরেজী তেমন জানেন না। তিনি এসে মাঝে মাঝে খোঁজ করতেন—'ও আপনার ঠিকমতো দেখাশুনা করছে তো?' আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে ছেলেটি গোটা সোফিয়া ঘুরে দেখিয়েছে। ওরা আমার হাত-খরচ হিসেবে বেশ কিছু 'লেভ্' দিয়েছিল। [বুলগেরিয়ান মুদ্রাকে 'লেভ্' বলে। রাশিয়ান মুদ্রাকে 'রুবল্' বলে। 'লেভ্' এবং 'রুবল্'-এর দাম সমান। এক লেভ্ বা এক রুবল্ আমাদের দেশের ১৫ টাকার সমান] আমি গোটা টাকাটাই ওকে দিয়ে বলেছিলাম: 'আমার কোন হাত-খরচ প্রয়োজন নেই; তোমার দরকার হলে ব্যবহার করতে পার।' সে আপত্তি করেছে: 'না, না, তোমায় কিছু কিনতেই হবে।' আমি বললাম: 'আচ্ছা, কিনব, তবে শুধু তোমাদের দেশের জিনিস কিনব। তোমাদের দেশের কলম আছে?' সে নিয়ে গেল ওদের দোকানে। দোকানে শুধুই বিদেশী কলম। ওদের দেশে ভাল কলম তৈরি হয় না দেখলাম। শেষে কয়েকটা ডট্ পেন কিনলাম। অতি সাধারণ ডট্ পেন। আর কিছু ওখানকার লোকসঙ্গীতের রেকর্ড কিনলাম। হোটেলে একদিন হঠাৎ টি. ভি. খুলেছি, দেখি নাচ-গান হচ্ছে। সেই গানের ভাষা কিছু বুঝছি না। কিন্তু সুর একেবারে আমাদের দেশের পল্লীগীতির মতো। তখনই আমার ইচ্ছে হয়েছিল—ওদের দেশের পল্লীসঙ্গীতের কয়েকটা রেকর্ড

কেনার। সেই রেকর্ড কয়েকটা কিনলাম।

এই দোভাষী ছেলেটি বলে যে, সে মার্কসবাদী —ধর্ম মানে না। সে বলছে : 'আমি সৎ হব, ভাল হব। তার জন্ম ধর্মের কি দরকার আছে?' আমি বললাম : 'তুমি ধর্ম বাদ দিয়ে যদি সৎ হতে পার, সে ভাল কথা। কিন্তু সৎ তুমি কেন হবে? সৎ হবার জন্ম নিজের দিক থেকে একটা তাগিদ তো থাকা চাই। ধর্ম না হলে সে তাগিদ আসে না।' ফিরে আসার সময় আমি ঐ ছেলেটিকে বললাম : 'আমি দেশে ফিরে তোমার জন্য কিছু পাঠাতে চাই, কি পাঠাব বল দেখি?' এদিকে ধর্ম মানে না, কিন্তু বলল : 'তোমাদের দেশের মন্দিরের একটা অ্যালবাম যদি পাঠাও, খুব খুশি হব।' আমি বললাম : 'আচ্ছা, সেরকম যদি কোন অ্যালবাম পাওয়া যায়, পাঠাব।'

এই দোভাষী ছেলেটির কথা বাদ দিলে, সাধারণভাবে আমি যা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে ওদেশের লোক 'ধর্মপ্রাণ'। ধর্ম তাদের একেবারে মজ্জাগত হয়ে গেছে। অবশ্য আনুষ্ঠানিক যে ধর্ম, সেটাকে ওরা পছন্দ করে না। যাঁরা ধর্ম মানেন না বলেন, তাঁরা আসলে আনুষ্ঠানিক ধর্মকেই গোটা ধর্ম মনে করেন বলেই ঐরকম বলেন। আসলে তো তা নয়। ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটা কারও কারও ক্ষেত্রে হয়তো প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেটা ধর্মের আবশ্যিক অঙ্গ নয়। ধর্মের বহিরঙ্গ সেটা। প্রকৃত ধর্ম যেটা, সেই ধর্মকে মানতে ওদের কোন আপত্তি নেই। যে ধর্ম বলে যে, তোমার নিজের বিকাশ ঘটাও, যে ধর্ম মানুষকে নিষেধ করে নিজেকে দেহ-সর্বস্ব ভাবতে; যে ধর্ম বলে, জীবনের উদ্দেশ্য শুধু ভাল থাকা-পরা নয়; জীবনের উদ্দেশ্য মানুষ হিসেবে উন্নত হওয়া; সৎ, পবিত্র, নিঃস্বার্থ ও প্রেমিক হওয়া—সেই ধর্মকে ওরা শ্রদ্ধা করে; সেই ধর্মের কথাই ওরা শুনতে চায় বা সেই ধর্মকেই ওরা অনুসরণ করতে চায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভারতীয় ধর্মচিন্তা, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে স্বামীজী যে-ধরনের ধর্মের কথা বলে গেছেন সেই ধর্মের চিন্তা, ওদের মধ্যে ঢুকে গেছে। ওদেশের মানুষ বুদ্ধিমান মানুষ—যথেষ্ট চিন্তাশীল। তারা এই ধর্মের জন্যই উন্মুখ হয়ে আছে। লুদমিলা জিবকোভা—যাঁর উদ্যোগে এই শান্তি সম্মেলন শুরু হয়েছিল—তিনি একটা 'শান্তির ঘণ্টা' স্থাপন করেছিলেন একটা পাহাড়ের উপর। প্রকাণ্ড ঘণ্টা—বেশ কয়েকজন লোক না হলে সেই ঘণ্টা বাজানো যায় না। শান্তি-সম্মেলন চলার সময় একদিন এই ঘণ্টার কাছে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। গান চলতে লাগল। ভাষা বুঝি না, কিন্তু নিশ্চয়ই শান্তি-সম্পর্কিত গান, সেই গানের সঙ্গে ঘণ্টা বাজতে লাগল। এই ঘণ্টা যেন একটা প্রতীক। অর্থাৎ নতুন প্রভাত শুরু হল। আর হিংসা নয়, আর বিবাদ নয়। এবার শান্তি। একজন কবি এই ঘণ্টাকে উদ্দেশ করে সুন্দর কবিতা পাঠ করলেন। একদল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা কেউ কেউ গান করল, সেই গানের মর্ম শান্তি। তাদের কেউ কেউ আবার বক্তৃতা করল। সারা পৃথিবীর বয়স্কদের উদ্দেশে তারা আবেদন করেছে : 'দোহাই তোমাদের, যুদ্ধ বাধিও না। আমাদের জীবন সবে শুরু হয়েছে। জীবনটাকে আমরা দেখতে চাই। বাঁচতে চাই আমরা। যুদ্ধ বাধালে আমরা ছোটরা আর বাঁচব না।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অনেক শিশু তাদের বাবা-মা বা অন্য প্রিয়জনদের মরতে দেখেছে, নিজেরাও ঘরের মধ্যে বন্দী থেকে অনাহারে দিন কাটিয়েছে। পরে তারাও মারা গেছে। মারা যাওয়ার আগে তাদের কেউ কেউ নিজেদের অভিজ্ঞতা ডায়েরিতে লিখে গেছে। সেইরকম কয়েকটি শিশুর ডায়েরি থেকে তারা পড়ে শোনাল : 'দুদিন কিছু খেতে পাইনি; আজ বোন মারা গেল; গতকাল বাবা মারা গেছেন।' মর্মস্পর্শী সব বর্ণনা। এখন যারা শিশু, তাদের যাতে সেই দুঃখ না পেতে হয়, সেজন্য তাদের হয়ে বুলগেরিয়ার ঐ সব ছাত্র-ছাত্রীরা পৃথিবীর সব বয়স্ক চিন্তাশীল মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে : 'আমাদের বাঁচতে দাও।'

বিস্মৃত কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস

শ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

সুপরিচিত লেখক ও কাব্য-সমালোচক।

প্রকৃত কাব্যশক্তির অধিকারী হয়েও কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস আজ সাধারণ পাঠকের কাছে বিস্মৃত ; অথচ তাঁর কবিচিত্তের সহজ সহৃদয়তা, দুর্নিরোধ্য আবেগ এবং গভীর বাস্তববোধ একসময় বাংলার কাব্যরসিক এবং বিদগ্ধজনের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।…

গোবিন্দ দাস ছিলেন স্বভাবকবি। এই বিশেষণেই তাঁর কাব্যধর্মের পরিচয়। দুর্দম আবেগ এবং সহজ হৃদয়োচ্ছ্বাসের মধ্যে তাঁর কবিত্বশক্তি প্রকাশপথ বেছে নিয়েছে। সেই প্রকাশধর্মে কোনরকম কৃত্রিমতা নেই,—নেই কোন শিল্পী-মনের অহেতুক উদাত্তত।। কেবল মুক্ত মনের স্বভাব-উক্তিতেই তাঁর কলাকৃতির প্রকাশ। যদিও অনাবিল অনুভূতির একটা সহজ প্রকাশ দানের প্রবণতা কবির ছিল, তবু সেখানে ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে কাব্যজীবনের কোন ব্যবধান বা বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়নি। যাঁদের কাব্যধর্মে এই ব্যবধান সুস্পষ্ট, গোবিন্দ দাস তাঁদের দলভুক্ত হতে পারেননি। চটুল ছন্দের সৌকর্যে এবং ভাষার ভেলকিতে পাঠক চিত্তকে অভিভূত করতে তিনি অপারগ ; আবার ঐ দুটির সচেতন বিন্যাসে মনের সহজ ভাবানুভূতিকে চাপা দিতেও তিনি অনিচ্ছুক। বোধ হয় সেই কারণে কবি সাধারণ পাঠকের কাছে সুপরিচিত হতে পারেননি,—বা তাঁর কবিতা সর্বত্র যথাযোগ্য সমাদরলাভ করেনি।

গোবিন্দ দাসের জন্মসাল—৪ঠা মাঘ, ১২৬১ (ইংরেজী,—১৬ জানুআরি, ১৮৫৫) জন্মস্থান,—ঢাকা জেলার ভাওয়াল জয়দেবপুর। কবির পিতার নাম, রামনাথ এবং মা,—আনন্দময়ী। 'ফুলরেণু'-কাব্যগ্রন্থে কবি নিজের ব্যক্তিপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

> "জয় জয় জন্মভূমি 'জয়দেবপুর'
> জয় জয় পুণ্যময়ী ধবলা 'চিলাই'
> প্রকৃতির রত্নভাণ্ডে সুধা সুমধুর
> বিধাতা রেখেছে বুঝি আর কোথা নাই।
> এই 'দেবপুরবাসী'—দেবতা আমার,
> জননী 'আনন্দময়ী' পিতা 'রামনাথ',
> সারদা প্রেয়সী পত্নী প্রেম পারাবার
> দুহিতা 'প্রমদা', 'মণি' তাহাদের সাথ…"

কবি দরিদ্র পিতার সন্তান। পারিবারিক অবস্থা অসচ্ছল হলেও তিনি বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। গ্রামের বিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রজীবন শুরু। সেখান থেকে ছাত্রবৃত্তি পেয়ে ঢাকা নর্ম্যাল স্কুলে একবছর পড়াশুনা করেছিলেন। পরে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলেও কিছুদিন পড়েছিলেন। ঐ সময় তাঁর বিদ্যাশিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন ভাওয়ালরাজ কালীনারায়ণ। কিন্তু সুযোগ পেয়েও কবির বিদ্যাশিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। এর একমাত্র কারণ,—পারিবারিক দুরবস্থা। দুর্ভাগ্য এবং দুরবস্থার প্রবল ঘূর্ণিতে কবির মানসিক স্বাস্থ্য বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তাই রাজপরিবারের অর্থানুকূল্য পেয়েও তাঁর বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার ও বিকাশ কোনটিই আশানুরূপ হয়নি। অনেকের মতে অমনোযোগ ও অস্থিরচিত্ততার ফলে কবির বিদ্যাশিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। এরূপ মতবাদ সর্বাংশে স্বীকারযোগ্য নয় ; কারণ বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ

হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এই কৃতিত্বের জন্যই রাজপরিবারের অর্থানুকূল্য লাভ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর ছাত্রজীবন সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। সেখানে কিছুটা অস্থিরমতিত্ব প্রকাশ পেলেও সেটি কেবল দারিদ্র্য এবং দুভাগ্যের কারণেই। ঐ কারণেই তাঁর বিদ্যাশিক্ষায় নানা বিভ্রাট ঘটেছিল।

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে গোবিন্দ দাসের কোন পরিচয় ছিল না। ঢাকা নর্ম্যাল স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার কোন সুবিধা ছিল না। সেখানে কবি সংস্কৃত ভাষা কিছুটা আয়ত্ত করেছিলেন। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন বলে তাঁর কাব্যে কোন ইংরেজ কবির বা ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব পড়েনি। সমকালীন বাংলাকাব্যই তাঁকে কাব্যরচনায় প্রেরণা দিয়েছিল। এই কারণে 'গোবিন্দ চয়নিকা' গ্রন্থের সম্পাদক, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবিকে 'উনবিংশ শতাব্দীর খাঁটি বাঙালি কবি' আখ্যায় ভূষিত করেছেন ['গোবিন্দ চয়নিকা'/যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, (১৩৫৫), পৃঃ ১১]। যেহেতু কবির কাব্যে কোন বিদেশী প্রভাব পড়েনি, সেইহেতু দেশবাসী তাঁকে 'স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস' আখ্যায় শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। সমকালীন কবিদের মধ্যে কবির এখানেই অসাধারণত্ব ['বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)/ডঃ সুকুমার সেন, (১৩৫০), পৃঃ ৫২৯]।

দরিদ্রের সন্তান গোবিন্দ দাসের ব্যক্তিজীবন কোন সময় সুখের ছিল না। সমস্ত জীবন তিনি দুঃখের গহনে নিমগ্ন ছিলেন। ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনে শোক, দারিদ্র্য, উৎপীড়ন, নির্বাসন, অনশন ইত্যাদি সকল অভিশাপ সহ্য করতে হয়েছিল। সে এক অতি মর্মান্তিক জীবন…। যৌবনে প্রথমা স্ত্রী সারদাসুন্দরীর মৃত্যু কবির জীবনে এক নিদারুণ আঘাত হেনেছিল। এই দুর্ঘটনার সাত বছর পর কবি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর নাম, প্রেমদাসুন্দরী। কিন্তু দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের পরও তিনি প্রথমার স্মৃতি ভুলতে পারেননি। নিম্নোক্ত কয়েকটি ছত্রে কবি নিজের শোকাতুর মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন :

'সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পূবে
জীবন গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া,
অপূর্ব্ব সুন্দরী ঊষা, অপূর্ব্ব সন্ধ্যার ভূষা,
পৃথিবীর দুই প্রান্ত উঠিছে প্লাবিয়া।…
প্রেমদা পদ্মার কূলে, কোমল শেফালী ফুলে,
করিয়া বাসর সজ্জা ডাকিছে আমায়,
সারদা 'চিলাই' তীরে আমকাঠ দিয়ে শিরে,
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায়।…'

['কস্তুরী']

স্ত্রী-বিয়োগের এক বছর পর কবির ভ্রাতৃ বিয়োগ ঘটে, আবার সেই বছরের কয়েক মাসের মধ্যেই কবির জীবনে আর-এক শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর প্রথমা পত্নীর শেষ স্মৃতি মণিকুন্তলা হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। কবির একটি কবিতায় এই শোকানুভূতি মর্মস্পর্শী রূপ পেয়েছে :

'তপস্বীর তপোরথে, জ্ঞানময় মহাপথে
যায় ব্রহ্মময়ী মেয়ে—সারদা তোমার,
লও সে স্নেহের বুকে, যাক মেয়ে চিরসুখে—
এ জীবনে তার তরে ভাবিব না আর।'

['কস্তুরী']

এছাড়া কবির প্রথমা কন্যা, সারদার গর্ভজাত সন্তান প্রমদার মৃত্যু কবির জীবদ্দশায় ঘটেছিল।

কবি গোবিন্দ দাসের জীবনে দ্বিতীয় অভিশাপ, —দারিদ্র্য। দরিদ্রতা হেতু জীবনে তিনি নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন, নিদারুণ বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন এবং দিনের পর দিন বিনা চিকিৎসায় রোগযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। আবার

জীবন-সায়াহ্নে দুরবস্থার চরমসীমায় উপনীত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে দারিদ্র্য নানা সময়ে এবং নানাভাবে তাঁকে বিপর্যস্ত করলেও, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে এতটুকু ম্লান করতে পারেনি; বরং দারিদ্র্যের খরতাপে কবির জীবন-বোধ দীপ্ত ও তেজোময় হয়ে উঠেছিল। এই দারিদ্র্যের খরতাপ তাঁকে ভগবদ্‌নিষ্ঠায় প্রণোদিত করেছিল। দুঃখ-শোকের আঘাতে তাঁর অধ্যাত্ম-বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হতে শুরু করেছিল। কয়েকটা কবিতায় গোবিন্দ দাসের ভগবদ্‌নিষ্ঠা সুব্যক্ত হয়েছে:

(১) 'শ্রীহরি শ্রীবিষ্ণু ভগবান
দীনবন্ধু করুণা নিধান
এ গৃহের গৃহী তিনি এ বিশ্ব-মন্দিরে যিনি
সর্ব্বত্র করেন অধিষ্ঠান!
তাঁর পূজা তাঁর অর্চ্চনায়
অবিচল ভকতি শ্রদ্ধায়
রহ রত সেবক সন্তান…'
['নব্যভারত' পত্রিকা/বৈশাখ, ১৩১১]

*

(২) 'সকলি ধ্বংসের পথে! সকলি ধ্বংসের পথে।
ওহে ভগবান হরি,
দেও হে করুণা করি,
তোমাতে বিশ্বাস ভক্তি অধম শরণাগতে;
দেও হে চরণ রাঙ্গা,
ভীতচিত-ভয়-ভাঙ্গা,
হে মুকুন্দ! হে মুরারে! হে কৃষ্ণ কমলাপতে।'…
['ধ্বংসের পথে']

*

(৩) 'নাথ! সাগরে যেমন নদ নদীচয়,
কেহ কর্দ্দমাক্ত কেহ স্বর্ণময়,
চলিছে জীবন, তেমনি হৃদয়
তোমাতে মিশিবে, করুণা সাগর তুমি!…'
['আমি তোমার']

ব্যক্তিজীবনে কবি বিভিন্ন ব্যক্তির স্নেহচ্ছায়ায় বেতনভুক কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছেন। কখন জমিদার কাছারির নায়েব-রূপে, কখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-রূপে; আবার কখন পত্রিকা অফিসের কার্যাধ্যক্ষ-রূপে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন। কিন্তু চাকরির প্রতি তাঁর এতটুকু মোহ বা আকর্ষণ ছিল না। জীবনধারণের আর কোন উপায় ছিল না বলেই তাঁকে অপরের দাসত্ব করতে হয়েছে। তবে যে কর্মস্থলে তাঁর চারিত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়েছে বা মানসিক স্থৈর্যতা বিঘ্নিত হয়েছে, তখনি সেখান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। এর পরিণতি যে কত নিদারুণ, সেকথা কদাচ ভেবে দেখেননি। শুধু তাই নয়, জীবনে নানা দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হলেও কবি কখনও মানুষের নীতিহীনতাকে প্রশ্রয় দেননি; বরং কয়েকটি ক্ষেত্রে রূঢ় প্রতিবাদ করে নিজের দুর্ভাগ্যকে অতি সহজে বরণ করে নিয়েছেন। অনেকের আখ্যায় এটি তাঁর অব্যবস্থিত চিত্তের পরিচায়ক। যদি তাই হয়, তবে এই অব্যবস্থিত চিত্ততার মধ্যেই তিনি নিজের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কবিচিত্তের এই রূঢ় সবলতা বাংলাকাব্যে এক নতুন সুর ধ্বনিত করেছে:

'আমি ত ভাবিনি রোগ, ভেবেছি মহেন্দ্র যোগ,
তিলে তিলে পলে পলে আশায় আশায়,
ভেবেছি মরণ মাঝি লইতে আসিবে আজি,
অচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙ্গা পায়!…'
['সৌরভ' পত্রিকা/কার্তিক, ১৩২২]

গোবিন্দ দাসের জীবনে তৃতীয় ও চতুর্থ অভিশাপ,—উৎপীড়ন ও নির্বাসন। চাকরি-জীবনে কোন অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি বলে কবিকে অশেষ উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। প্রতিপালক হরচন্দ্র চৌধুরীর একটি অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করতে অক্ষম হলে তাঁকে চাকরি ত্যাগ করে তৎকালীন 'নব্যভারত'

পত্রিকার সম্পাদক, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 'আনন্দ আশ্রমে' আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সেখান থেকে কিছুদিন মধুপুরে এবং তারপর কলকাতায় ফিরে এসে তিনি 'নব্যভারত' প্রেসের কার্যাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেছেন। এরই ফাঁকে একসময় কলকাতার 'বিভা' পত্রিকার প্রকাশক এবং সেরপুরে 'চারুবার্ত্তা' কাগজের অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। শেষে কয়েকবছর মুক্তাগাছার মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর জমিদারিতে নায়েব পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু অসুস্থতার কারণে সেই চাকরি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অগত্যা চাকরির মায়া কাটিয়ে পত্নী প্রেমদার পিত্রালয়, ব্রাহ্মণ-গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানেও তাঁর দুর্ভাগ্য ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে। গ্রামের কয়েকজন দুষ্ট লোক কবির নিষ্কলুষ চরিত্রে মিথ্যা কালিমা লেপন করে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

গোবিন্দ দাস একসময় ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষের চক্রান্তে নিজ জন্মভূমি (জয়দেবপুর) হতে নির্বাসিত হন। পরে কালীপ্রসন্নের নানা অপকীর্তি প্রকাশ পায়। তখন ভাওয়ালের রাজকুমারেরা নিরপরাধ কবিকে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানান। দীর্ঘ এগার বছর নির্বাসনের পর কবি পুনরায় জন্মভূমির কোলে ফিরে আসেন। মাতৃসমা জন্মভূমির বাৎসল্যপূর্ণ মুখচ্ছবি অবলোকন করে তিনি যেন মুগ্ধপ্রাণ,—আবেগ-বিহ্বল। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে কবির মাতৃবন্দনা সার্থক রূপ পেয়েছে:

'আমি পরবাসী,
ওগো শ্যামা বনভূমি, বিপুলা বিশালা তুমি,
কবিতা কল্পনা মোর তোর চিরদাসী,
আমি বা বুঝিব কি মা, তোর ঐ শ্যাম মহিমা,
তথাপি সেবিব তোরে চির অভিলাষী,
আমি, তাইতে হেথা আসি!'
['নব্যভারত' পত্রিকা / বৈশাখ, ১৩১৬]

কবির জীবনে সর্বশেষ অভিশাপ,—অনশন। শেষ জীবনে অনশনক্লিষ্ট কবি আর্থিক সাহায্যের আশায় অনেকের শরণাপন্ন হয়েছেন। একসময় তিনি ময়মনসিংহের রাজা জগৎকিশোরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। মহানুভব রাজা তাঁকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কুড়ি টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভাওয়াল রাজপরিবার থেকেও তিনি মাসিক চব্বিশ টাকা হিসাবে নিয়মিত সাহায্য পেতেন। এছাড়া স্বগ্রামে তাঁর কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। যদিও উক্ত সম্পত্তি ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, পরে তিনি রাজানুগ্রহে ফিরে পেয়েছিলেন। ফলে, তাঁর দুরবস্থার কিছুটা সুরাহা হয়েছিল, কিন্তু কিছুকালের মধ্যে কয়েকটা বৃত্তি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, কবির জীবনে এক নিদারুণ বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণের দুশ্চিন্তায় তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এই দুশ্চিন্তায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ক্রমশঃ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটি কবিতায় কবির আক্ষেপ অপার কারুণ্যে বিবৃত হয়েছে:

'গেলনারে অর্থকষ্ট, হায় কি কপাল—কি অদৃষ্ট!
ইহকাল পরকাল নষ্ট দারুণ দুরাশায়!'
['দিন ফুরায়ে যায়']

তখন থেকেই কবি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতায় তাঁর সেই মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

'দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়!
মাঝের রবি ডুবছে সাঁঝে, দিনটা গেল বৃথা কাযে,
এক পা কেবল পড়ে আছে, এক পা দিছি নায়।'
['নব্যভারত' / জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮]

অতঃপর অনশনক্লিষ্ট কবি নিজের দুঃখ-দুর্দশা জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে লিখেছেন:

'ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে—
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?

আজ যে আমি উপাস্ করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্‌…'
['নব্যভারত' / শ্রাবণ, ১৩১৮]

উক্ত কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানা জায়গা থেকে কিছু কিছু সাহায্য আসতে থাকে ; কিন্তু সেই সাহায্যের পরিমাণ এতই অল্প যে, তাতে কবির জীবনরক্ষা সম্ভবপর হয়নি। অর্থাভাবে কয়েকবারই তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি। একবার ঢাকায় কঠিন অসুখে পড়লে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। সুচিকিৎসার ফলে সে-যাত্রায় তাঁর জীবনরক্ষা হয়েছিল। ব্যথাক্ষুব্ধ কবি ঐ সময় একটি কবিতায় নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করে লিখেছেন :

'কেন বাঁচালে আমায়—
আমি ভেবেছিনু হরি   এবার করুণা করি,
ঘুচাইবে অভাগার   এ-ভবের দায়,
যত দুঃখ যত ক্লেশ   সকল হইবে শেষ,
কাঁদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায় !'
['সৌরভ' পত্রিকা / কার্তিক, ১৩২২]

ছত্রটিতে কবির প্রত্যক্ষ অনুভবের বেদনার উন্মথিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

কবি গোবিন্দ দাসের জীবনে দুশ্চিন্তা ও দুর্দশার অন্ত ছিল না। একসময় পদ্মাগর্ভে তাঁর গ্রামের বসতবাটী বিলীন হয়ে যায়। ঢাকা শহরে একটি বাসগৃহের জন্য সকলের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করেও কোন সাড়া পাননি। উপরন্তু গ্রামের সামান্য ভূ-সম্পত্তির বকেয়া খাজনা ঠিক সময়ে দিতে না পারায় জমিদার কর্তৃক নীলাম জারি হয়েছিল। রোগজীর্ণ কবি তাঁর অসহায় পরিবারবর্গের কথা চিন্তা করে ঐ ক্ষুদ্র ভূ-সম্পত্তি রক্ষাকল্পে কয়েকজন বিত্তবান ভূ-স্বামীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন ; কিন্তু সেই প্রচেষ্টা তেমন সফল হয়নি। কবির লেখায় উক্ত ঘটনাসমূহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় :

'পদ্মায় লইল বাটী   না রাখিল ভিটা মাটি,
না রহিল তৃণটুকু শেষের সহায় !
কি বিজয় অট্টহাসে,   গর্জিয়া কাঁপায়ে আসে,
আকাশ পাতাল যেন গ্রাসে সমুদায়।'

*

'গেলেও যমের বাড়ী   করিবে নীলাম জারি,
শমনের বাড়ী এরা "শমন" লটকায়।'
['কেন বাঁচালে আমায়', ১৩১৮]

এক তীব্র মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কখন অনশনে কখন বা অর্ধাশনে ঐ সময় তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছিল। অনিয়ম আর অবহেলায় জীর্ণ দেহ ভেঙে পড়েছিল। শেষে সংসারের সকল জ্বালা, যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে দুঃখদৈন্য-ক্লিষ্ট, শোক-জর্জরিত কবি আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় ঢাকা শহরের ৺সতীশচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে দেহত্যাগ করেন। সেই মর্মান্তিক দিনটি ছিল ১৩ আশ্বিন, ১৩২৫।

গোবিন্দ দাসের জীবন রক্ষার্থে যে-সকল মনীষী এবং সহৃদয় ব্যক্তি অগ্রণী হয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি সারদাচরণ মিত্র, সেরপুরের স্বনামধন্য জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী, মুক্তাগাছার দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী ও কেশবচন্দ্র আচার্য চৌধুরী, 'নব্যভারত' পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার, কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য (গৌরীপুর), ঢাকার ব্যারিস্টার প্রাণকিশোর বসু, 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং আরও অনেকে।

স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের কবিতাগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—(১) 'প্রসূন' (১২৬১ বঙ্গাব্দ), (২) 'প্রেম [illegible] ফুল' (১২৯৪), (৩) 'কস্তুরী' (১৩০২), (৪) 'কুঙ্কুম' (১২৯৮), (৫) 'চন্দন' (১৩০৩), (৬) 'ফুলরেণু' (১৩০৩), (৭) 'বৈজয়ন্তী', (১৩১২), (৮) 'মগের মুলুক' (১৮৯৩), (৯) 'শোক ও সান্ত্বনা' (১৩১৬) ও (১০) 'শোকোচ্ছ্বাস' (১৩১৭)। রচনাগুলির মধ্যে 'মগের মুলুক' এবং 'ফুলরেণু' ছাড়া আর সকলই গীতিকাব্য। 'মগের মুলুক' একটি ব্যঙ্গকাব্য। এই কাব্যটি নিযে কবির বিরুদ্ধে একসময় মামলা দায়ের হয়েছিল ; কিন্তু পরে সেই মামলা প্রত্যাহৃত হয়েছিল। 'ফুলরেণু' রচনাটি কতকগুলি সনেটের সমষ্টি, এছাড়া আরও কয়েকটি কবিতা রচনা করে গোবিন্দ দাস স্বকীয় কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে 'স্বদেশ' ('নব্যভারত'/ পৌষ, ১৩১৪), 'কবে মানুষ মরে গেছে' ('নব্য-ভারত'/চৈত্র, ১৩১৭), 'উপদেশ' (রচনাকাল, বৈশাখ, ১৩১১), 'তুমি না থাকিলে' (রচনাকাল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২), 'নৃসিংহ' (রচনাকাল, বৈশাখ, ১৩১০), 'সে কেমন ?' (রচনাকাল, ফাল্গুন, ১৩০১), ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর তিন বছর আগে কবি গীতার কয়েকটি শ্লোকের কাব্যানুবাদ করেছিলেন। উক্ত কাব্যানুবাদ হেমচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত 'স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস' গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। 'অ্যালেন হিউম' রচিত একটি উৎকৃষ্ট কবিতা অনুবাদ করে তিনি প্রভূত যশোলাভ করেন।

কবির শেষ কবিতা তৎকালীন 'নারায়ণ' পত্রিকায় (১৩২৫) প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর অনেক কবিতা এখনও বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় লুকিয়ে আছে। সেগুলির পূর্ণ সংকলন আজও সম্ভব হয়নি। বলাবাহুল্য গোবিন্দ দাসের কবিকৃতির বিস্তারিত পরিচয় জানতে হলে তাঁর সমগ্র রচনার একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রয়োজন ; নচেৎ কবিকল্পনার কল্পতীর্থে অবগাহন সম্ভব নয়।

কবির প্রথম কবিতা 'একদিন' রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত 'বীণা' পত্রিকায় (প্রথম বর্ষ, কার্তিক, ১২৮৫) প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত পত্রিকায় তাঁর প্রথম জীবনের অনেকগুলি কবিতা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে কয়েকটি কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থেই স্থান পায়নি। এছাড়া তৎকালীন আরও কয়েকটি সাময়িক পত্র-পত্রিকায় কবির রচনা বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে আছে। সেই পত্রিকাগুলির মধ্যে রয়েছে—'নব্যভারত', 'নবজীবন', 'সৌরভ', 'প্রতিভা', 'মানসী', 'নারায়ণ', 'সাহিত্য', 'আলোচনা', 'আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা', 'বান্ধব', 'সম্মিলনী', 'প্রকৃতি', 'Dacca Review', 'নবজীবন', 'কৌমুদী' এবং 'ভারত মিহির'। রচনাগুলির অধিকাংশই প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়নি। কবির কিশোর বয়সের রচনা, যেগুলি তিনি জয়দেবপুর বিদ্যালয়ের 'বিদ্যোৎ-সাহিনী' সভায় পাঠ করতেন, তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিশোর বয়সেই তাঁর কাব্য প্রতিভার উন্মেষ এবং ঐ বয়সেই তিনি তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে কল্পনার রঙে সুষমামণ্ডিত করে কাব্যরসিকদের শ্রবণপথে কাব্যঝঙ্কারের লহর তুলেছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেই কাব্যকলার একটি স্মৃতিও আজ অবশিষ্ট নেই।

কবি গোবিন্দ দাসের মহাপ্রয়াণের পর বাংলার যে কয়েকজন কবি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জীবেন্দ্র-কুমার দত্ত, কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'ফুল নীরবে যেমন ঝরে,
        তেমনি করে মরে গেল কবি,
চলে গেল মানসযাত্রী,
        প্রজাপতির নীরব পাখার ভরে ;

হাওয়া শুধু করলে হাহা, আনমনে হায় ;
সেই সমাচার লভি
দূরে বাঁশীর সুরের ধারা কেঁপে বারেক উঠল
নিমেষ-তরে।
এই দুনিয়ার একটি কোলে
কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে,
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায়
কাঁটার মালা গলে ;
পাতায় চাপা গন্ধটুকুন পূবে হাওয়ায়
বেরুল নীড় ত্যাজে
পাথর চাপা রইল কপাল, বাদলা ক'রে রইল
চোখের জলে।'

কবি গোবিন্দ দাস একজন হতভাগ্য কবি। আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে দিনের পর দিন জঠরের জ্বালায় অস্থির হয়ে এক অতি অসহায় অবস্থার মধ্যে ধরাধাম হতে চির বিদায় নিয়েছেন। চরম দুরবস্থার মধ্যেও নিঃশঙ্কচিত্তে পথ চলেছেন কবি দীর্ঘদিন। এই চলার পথে অনেকে তাঁর সাহসিকতার প্রতি কটূক্তি করেছে, নীতিনিষ্ঠতার প্রতি অবজ্ঞা করেছে এবং কঠোর জীবনসংগ্রামের প্রতি বিদ্রূপ করেছে। আবার অনেক সময় দুঃখদৈন্য কবির পারিবারিক জীবনকে বিরক্তিকর করে তুলেছে। তবু জীবনে মুহূর্তের জন্যেও নিজের মনুষ্যত্বকে অবমাননা করেননি তিনি।

কবির এই মনুষ্যত্বের বৈভব একদা সকলের অনুভবকে শ্রদ্ধাবিনত করেছিল,—তাঁর কাব্য-রচনাগুলি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের এখানেই অক্ষয় সিদ্ধি।

শ্রীম: পল ব্রান্টনের চোখে

অনুবাদক: অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবালোকে বাংলার নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চ তথা নটগুরু গিরিশ সম্পর্কে প্রথিতকীর্তি গবেষক।

ডক্টর পল ব্রান্টন প্রথম জীবনে ছিলেন সাংবাদিক। সাংবাদিকতার সূত্রে তাঁর মধ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও অতীন্দ্রিয়তাবাদ সম্পর্কে আগ্রহ জেগে ওঠে। প্রবল কৌতূহল নিয়ে প্রাচ্যভূমির দেশগুলি ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন তিনি এবং প্রাচ্য-ধর্মের মর্মমূলে পৌঁছবার প্রয়াস পান। তারই ফসল তাঁর সুপ্রসিদ্ধ রচনাগুলি: "দ্য সিক্রেট পাথ", "এ মেসেজ ফ্রম অরুণাচল", "দ্য কোয়েস্ট অব দি ওভারসেলফ", "দ্য ইনার রিয়েলিটি", "দ্য ইণ্ডিয়ান ফিলোজফি অ্যাণ্ড মডার্ন কালচার" প্রভৃতি।

নিচের অংশটি লেখকের "এ সার্চ ইন্ সিক্রেট ইণ্ডিয়া" গ্রন্থের 'এ্যামং দ্য ম্যাজিসিয়ানস্ এ্যাণ্ড হোলি মেন' অধ্যায় থেকে সংকলিত ও স্বাধীনভাবে অনূদিত। এই গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড মন্তব্য করেছেন: "'পবিত্র ভারত' (Sacred India)—বইটির যথার্থ নাম। একটি দেশ তার পবিত্রতম সম্পদটিই সংগোপনে রাখতে চায়। একজন বিদেশীর পক্ষে ইংলণ্ডের পবিত্র সম্পদ আবিষ্কার সহজ নয়—ভারতের সম্পর্কেও একথা সমভাবে সত্য। ভারতের পবিত্রতম অংশই গোপনীয়তম।...সেই গুপ্ত সম্পদকে পাওয়ার জন্য চাই কঠোর অনুসন্ধান—কিন্তু সেভাবে যারা সেই সম্পদের অনুসন্ধান করে তারা ঠিকই তার খোঁজ পায়। মিঃ ব্রান্টনের সেই দৃঢ় অধ্যবসায় ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত তিনি তার সন্ধানও পেয়েছেন।"

ভারতে এসে দেশভ্রমণকালে আকস্মিকভাবে এক ভদ্রলোকের হাতে একটি বই ব্রান্টনের চোখে পড়ল—"দি লাইফ অব রামকৃষ্ণ"। কবে যেন কার কাছে শুনেছিলেন রামকৃষ্ণই ভারতের শেষ ঋষি—আধ্যাত্মিক

অতিমানব। সব নিয়মকানুন উপেক্ষা করে ব্রান্টন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমালেন—তাঁর কাছে শুনলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে আর মাত্র দু-তিনজনই জীবিত আছেন। সেই দু-তিনজনের অন্যতম অশীতিপর বৃদ্ধ, কথামৃতকার মাস্টারমশাই। সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে কলকাতায় পেঁ'ছে তিনি গেলেন শ্রীম-র সন্ধানে। তাঁর সেই সন্ধান ও পরিণতির বিবরণীতেই রেখে গেছেন অন্তরতম ভারতবর্ষের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

"অবশেষে খাস কলকাতায় পৌঁছে শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ষীয়ান ভক্ত মাস্টারমশায়ের বাড়ির খোঁজে গেলাম। রাজপথের লাগোয়া খোলা উঠান পার হয়ে পেঁ'ছলাম পরিকল্পনাহীন একটি বড় বাড়ির একধার খাড়াই সিঁড়ির মুখে। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় উঠে নিচু দরজা দিয়ে একটি ঘরে ঢুকলাম। সমতল ছাদের দিকে খোলা একটি ছোট ঘর। দুদিকের দেওয়াল ঘেঁসে দুখানা তক্তপোশ। আলো আর খানকয়েক বই ছাড়া ঘরে আর বিশেষ কিছু নেই। একটি যুবক ঘরে ঢুকে তার কর্তার জন্য একটু অপেক্ষা করতে বলল, তিনি তখন নিচের তলায়।

"দশ মিনিট কাটল। নিচের তলার ঘর থেকে কেউ বেরুচ্ছেন—শব্দ পেলাম। তখনই মাথার মধ্যে একটা শিহরণ অনুভব করলাম—মনে হল, নিচের তলায় কেউ আমার সম্পর্কে মনঃসংযোগ করছেন। সিঁড়িতে সেই মানুষটির পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। ধীর পায়ে উঠে তিনি অবশেষে প্রবেশ করলেন ঘরে। কে তিনি সে-কথা বলার প্রয়োজনই হল না—যেন বাইবেলের পৃষ্ঠা থেকে উঠে এলেন এক সম্মানিত ধর্মযাজক—রক্তমাংসের অবয়ব নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন মোজেসের কালের একটি শরীরী আকৃতি। তাঁর রিক্তকেশ মস্তক, দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু ও শুভ্র গুম্ফ, গম্ভীর আকৃতি, আয়ত ভাবগর্ভ দুটি চোখ, আশিবছরের পার্থিব অস্তিত্বের ভারে ঈষৎ ন্যুব্জ স্কন্ধ—ইনি মাস্টারমশাই ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

"তক্তপোশের উপর বসে তিনি আমার দিকে চোখ ফেরালেন। তাঁর প্রশান্ত, গাম্ভীর্যময় উপস্থিতিতে আমি উপলব্ধি করলাম—লঘু পরিহাস, হাস্যকৌতুক, এমন কি মাঝে মাঝে যে রূঢ় সন্দিগ্ধতা ও অস্পষ্ট নাস্তিকতা আমার মন আচ্ছন্ন করে—সে সবের অবকাশ এখানে নেই। ঈশ্বরবিশ্বাসে দৃঢ়মূল তাঁর চরিত্র, তাঁর মহত্ব যেন তাঁর আবির্ভাবের মধ্যেই সুমুদ্রিত—যা সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারে।

"নিখুঁত উচ্চারণে ইংরেজীতে তিনি আমার উদ্দেশে বললেন, 'স্বাগত'।

"কাছে এসে তাঁর তক্তপোশে আমাকে বসতে বললেন। এখানে আসার উদ্দেশ্য তাঁকে জানালাম। আমার কথা শেষ হতে তিনি সস্নেহে আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন, 'এক উচ্চতর শক্তি তোমাকে টেনে এনেছে ভারতে। এদেশের পবিত্র মানুষদের সংস্পর্শে এনেছে সেই শক্তিই; এর পশ্চাতে আছে একটি উদ্দেশ্য যা ভবিষ্যতে উদ্‌ঘাটিত হবে। তার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর।'

"'আমাকে আপনার গুরু রামকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু বলুন।'

"'তুমি এমন বিষয় উত্থাপন করলে যা নিয়ে বলতে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। প্রায় পঞ্চাশ বছর হল তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর পবিত্র স্মৃতি কখন আমাদের পরিত্যাগ করতে পারে না। সর্বদা তা আমাদের অন্তরে সজীব ও সুবাসিত। যখন আমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করি তখন আমার বয়স ২৭ বছর এবং তাঁর জীবনের শেষ পাঁচ বছর কাটিয়েছি তাঁর সান্নিধ্যে। তার ফলে আমি আজ পরিবর্তিত

মানুষ। জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গী আজ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছে। সেই দেব-মানব রামকৃষ্ণের এই হল প্রভাব। যারা তাঁকে দেখতে গেছে তাদের সকলের উপরই তাঁর এই আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। বলতে গেলে, তিনি যেন তাদের জাদু করেছিলেন—মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন তিনি। একান্ত বাস্তববাদী মানুষরাও, যারা তাঁকে ব্যঙ্গ করার অভিপ্রায় নিয়ে গিয়েছিল, সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তারাও স্তব্ধ হয়ে গেছে।'

"কিছুটা বিমূঢ়ভাবেই আমি তাঁকে বাধা দিয়েছিলাম, 'কিন্তু এ ধরনের মানুষেরা, যারা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসহীন, কেমন করে সেই আধ্যাত্মিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে ?'

"স্মিতহাস্যে মাস্টারমশায়ের ওষ্ঠপ্রান্ত নড়ে উঠল। তিনি বললেন, 'দুজন লঙ্কা চিবিয়েছে। তার মধ্যে একজন বস্তুটির নাম জানে না—হয়তো কখন চোখেও দেখেনি। অন্যজন বস্তুটির সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত এবং দেখেই চিনতে পেরেছে। দুজনের কাছেই কি এর স্বাদটা একই রকম হবে না ? দুজনের মুখই কি সমানভাবে জ্বলে যাবে না ? একইভাবে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতার মহত্ত্ব বস্তুবাদীর আস্বাদনেও বাধা হয়ে ওঠেনি—আধ্যাত্মিকতার যে প্রেরণা তাঁর থেকে বিচ্ছুরিত হত তার স্পর্শ থেকে তারাও বঞ্চিত হত না।'

"'তাহলে তিনি সত্যই আধ্যাত্মিক মহামানব।'

"'হাঁ। আমার জ্ঞান-বিশ্বাসে তার থেকেও বেশি। রামকৃষ্ণ ছিলেন সরল মানুষ—অজ্ঞ এবং বিদ্যাহীন। তিনি এতই অজ্ঞ যে নিজের নাম পর্যন্ত সই করতে পারতেন না, একখানা চিঠি লেখা তো দূরের কথা। তিনি চেহারায় সরল মানুষ—জীবনযাত্রায় সরলতর। তা সত্ত্বেও তিনি সে সময়কার ভারতবর্ষের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের আনুগত্য লাভ করেছেন। তাঁরা রামকৃষ্ণের প্রগাঢ় আধ্যাত্মিকতার কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছেন। রামকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—অহঙ্কার, সম্পদ, ঐশ্বর্য, ঐহিক সম্মান প্রতিষ্ঠা মূল্যহীন। এই তুচ্ছ-বস্তুই মায়াস্বরূপ যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আহা! সেই অপরূপ দিনগুলি! প্রায়ই তিনি সমাধিতে ডুবে যেতেন—তখন এমনই জ্যোতির বিচ্ছুরণ হত যে, আমরা যারা তাঁকে ঘিরে থাকতাম, উপলব্ধি করতাম তিনি মানুষ নন, স্বয়ং ঈশ্বর। আরও বিস্ময়ের কথা, স্পর্শমাত্রেই তিনি যে কোনও ভক্তকে পৌঁছে দিতে পারতেন সেই অমৃতলোকে। সে-অবস্থায় তারা গভীর ঈশ্বর-রহস্য প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে উপলব্ধি করতে পারত। সে যাক। আমাকে কেমন করে তিনি প্রভাবিত করলেন সেই কথা বলি।

"'আমার পড়াশুনো পাশ্চাত্য ধরনে। বুদ্ধিবাদের অহঙ্কারে আমার মাথা তখন পূর্ণ। কলকাতার কলেজে বিভিন্ন সময়ে ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির (পলিটিক্যাল ইকনমি) অধ্যাপকরূপে কাজ করেছি। রামকৃষ্ণ তখন কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে গঙ্গার ধারে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বাস করেন। বসন্তকালের একটি দিনে সেখানে গিয়ে তাঁকে পেলাম। সে এক অবিস্মরণীয় দিন।—শুনলাম তাঁর আপন অভিজ্ঞতালব্ধ আধ্যাত্মিক চিন্তার সহজ প্রকাশ। আমি তর্ক করার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে যেন বাক্-রহিত হয়ে গেলাম। সে-প্রভাব এত গভীর যে, কথায় প্রকাশ করা যায় না। সেই সরল, বিনীত মানুষটিকে ছেড়ে থাকা সম্ভব হল না—বারবার যেতে আরম্ভ করলাম। একদিন তিনি সকৌতুকে বললেন, "একটা ময়ূরকে একদিন ৪টার সময় আফিম

াইয়েছিল। পরদিন আবার ঠিক সেই সময় এসে হাজির। আফিমের নেশায়—আর একটু পাওয়ার লোভে।" সাঙ্কেতিকভাবে হলেও কথাটা খুব সত্যি। রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে আমি যে চরম আনন্দের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম, তা আর কোথাও পাইনি। সুতরাং ঘন ঘন যে সেখানে যাব, তার মধ্যে আর আশ্চর্য কি! এইভাবেই নিছক দর্শক নয়, তার অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীর একজন হয়ে গেলাম। একদিন ঠাকুর আমাকে বললেন, "তোমার চোখ, কপাল আর মুখে আমি যোগীর লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। সংসারের সব কাজ করবে কিন্তু মনটি বেঁধে রাখবে ঈশ্বরে। স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবা সকলের সঙ্গে থাকবে—আপনজনের মতো তাদের সেবা করবে। জগতে সব কাজ করবে কিন্তু মনটিকে ফেলে রাখবে তাঁর কাছে।"

"'তাই, রামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর যখন তাঁর অনেক শিষ্য স্বেচ্ছায় সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণ করল এবং ভারতের সর্বত্র রামকৃষ্ণের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগে প্রস্তুত হল তখনও আমি আমার পেশা ছাড়লাম না। শিক্ষাদানের কাজই চালিয়ে যেতে লাগলাম। তা সত্ত্বেও, সংসারে থেকে সংসারের বাইরে থাকার সঙ্কল্পে আমি এতই দৃঢ় ছিলাম যে, অনেকদিন গভীর রাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে শহরের গৃহহীন ভিখারীদের সঙ্গে সিনেট হাউসের চাতালে নিদ্রা যেতাম। এইভাবে, সাময়িক হলেও, আমি অনুভব করতাম, আমি একজন রিক্ত মানুষ।

"'রামকৃষ্ণ চলে গেছেন কিন্তু আজ তুমি সারা ভারতেই দেখতে পাবে, তাঁর প্রথম শিষ্যদের অনুপ্রেরণায় (দুঃখের কথা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ তিরোহিত) সমাজসেবা, স্বদেশপ্রেম, চিকিৎসা ও শিক্ষার কাজ চলেছে। কিন্তু যা তুমি সহজ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না তা হল সেই বিস্ময়কর মানুষটির সংস্পর্শে কত হৃদয়, কত জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে। এর কারণ তাঁর ভাবধারা শিষ্য পরম্পরায় বাহিত হচ্ছে এবং সেই শিষ্যরা তাদের সাধ্যমত প্রচার করে চলেছে। আমার সৌভাগ্য, আমি তাঁর অনেক বাণী বাংলায় লিখে নিয়েছিলাম—সেগুলির মুদ্রিতপাঠ আজ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছেছে। তার অনুবাদও ছড়িয়েছে দেশের অন্যান্য জায়গায়। সুতরাং তুমি বুঝতে পারছ, রামকৃষ্ণের প্রভাব কিভাবে তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যমণ্ডলীর সীমা অতিক্রম করে ব্যাপকতা লাভ করেছে।'

"মাস্টারমশাই তাঁর দীর্ঘ আলাপ শেষ করে স্তব্ধতায় ডুবে গেলে আমি যেন ভেসে গেলাম এশিয়া-মাইনরের সেই ক্ষুদ্র রাজ্যটিতে—যেখানে ইসরাইলের সন্তানেরা ভাগ্যের কঠিন পীড়ন থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পায়। তাদের মধ্যে দেখলাম মাস্টারমশাইকে পরম-শ্রদ্ধেয় প্রফেটরূপে—তাঁর জনগণের কাছে কথা বলছেন। তাঁর মহত্ত্ব, সাধুত্ব, সদাচার, ধর্মপ্রাণতা ও নিষ্ঠা স্বতঃস্বচ্ছ। বিবেকের কণ্ঠস্বর যিনি আনতমস্তকে দীর্ঘদিন ধরে গ্রহণ করেছেন—এমনি আর্যমর্যাদায় তিনি প্রতিষ্ঠিত।

"আমি অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললাম, 'যে মানুষ কেবলমাত্র বিশ্বাসে বাঁচতে পারে না, যে মানুষ বুদ্ধি ও কার্যকারণ সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, জানি না, রামকৃষ্ণ তার সম্পর্কে কি বলবেন।'

"'তিনি তাদের বলবেন প্রার্থনা করতে। প্রার্থনা একটা বিপুল শক্তি। রামকৃষ্ণ স্বয়ং প্রার্থনা করেছিলেন অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু মানুষের জন্য এবং তারপরেই তাদের আগমন শুরু হয় যারা পরে তাঁর ভক্ত ও শিষ্য হয়েছিল।'

"'কিন্তু যে কখনও প্রার্থনা করেনি? তার কি হবে?'

"'প্রার্থনাই শেষ কথা। মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ

সম্পদ। বুদ্ধি যেখানে পরাজিত—প্রার্থনাই সেখানে সহায়।'

"বিনীত নিবেদন করলাম আমি, 'কিন্তু যদি এমন কেউ আপনার কাছে এসে বলেন যে, প্রার্থনা তাঁর মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায় না—তাঁর প্রতি আপনার পরামর্শ কি হবে?'

"'আমি তাঁকে বলব প্রকৃত সাধুসঙ্গ করতে। যাঁদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আছে—এইরকম সাধুদের সান্নিধ্যে বারবার আসতে। বারবার তাঁদের সংস্পর্শ অন্তরস্থিত অবিকশিত আধ্যাত্মিকতা উন্মোচনের সহায়ক হবে। উচ্চকোটির মানুষই আমাদের মন ও ইচ্ছাকে দৈবীশক্তির দিকে পরিবর্তিত করতে পারেন। সর্বোপরি তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনের বাসনাকে জাগিয়ে তুলতে পারেন। তাই তাঁদের সন্নিধি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান। রামকৃষ্ণ প্রায়ই বিশেষভাবে বলতেন এই কথা।'

"এইভাবেই আমাদের আলোচনা ছিল পবিত্র ও উচ্চমার্গের। সেই সর্বময় সনাতন ঈশ্বর ভিন্ন যে মানুষের শান্তির আর কোন পথ নেই—এই ছিল আমাদের আলোচ্য বিষয়। সারা সন্ধ্যা কত লোক আসত তাঁর কাছে—সেই ছোট ঘরখানি একসময় পূর্ণ হয়ে যেত। তারা সবাই তাঁর শিষ্য। রাতের দিকেই আসত তারা। সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় উঠে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনত গুরুর কণ্ঠ-উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ।

"কিছুদিনের জন্য আমিও যোগ দিয়েছি তাদের সঙ্গে। রাতের পর রাত আমি উপস্থিত হয়েছি। তাঁর পবিত্র কথাগুলির চেয়ে তাঁর উপস্থিতির আধ্যাত্মিক সূর্যকিরণে অবগাহনের জন্যই আমার আকর্ষণ ছিল বেশি। তাঁকে ঘিরে পরিবেশটি ছিল কোমল, স্নিগ্ধ, মাধুর্যময়। নিজের মধ্যে তিনি যে পরমশান্তি পেয়েছিলেন তা সুস্পষ্টভাবে বিচ্ছুরিত হত। তাঁর বাণী হয়তো কখন কখন ভুলে যাই—ভুলতে পারি না সেই উদার মহৎ ব্যক্তিত্ব। যে আকর্ষণ তাঁকে বারবার টেনে নিয়ে গেছে রামকৃষ্ণের কাছে, সেই আকর্ষণেই আমাকে নিয়ে গেছে তাঁর কাছে—আমার উপরে শিষ্যের আকর্ষণ প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই বুঝতে পারি তাঁর গুরুর আকর্ষণ ও প্রভাব কতখানি দুর্বার ছিল।

"অবশেষে শেষ সন্ধ্যা এল। তক্তপোশে তাঁর পাশে বসে আলোচনার আনন্দে ভুলে গেছি কখন কিভাবে আমাদের সময় কেটে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেছে—আমাদের কথা চলেছে অব্যাহতভাবে। এবার তার সমাপ্তি। সেই মহান আচার্য আমার হাতটি ধরে ফিরে গেলেন তাঁর বাড়ির সমতল ছাদের উপর। সেখানে পূর্ণচাঁদের আলোয় দেখলাম টবে হাঁড়িতে চারাগাছগুলি সুবিন্যস্তভাবে গোলাকার সাজানো। নিচে শহর কলকাতার গৃহাভ্যন্তরের আলোকমালা।

"উদ্ভাসিত পূর্ণচন্দ্র। মাস্টারমশাই একবার চাঁদের দিকে দেখালেন, তারপর নীরব প্রার্থনায় ডুবে গেলেন। আমি ধীরভাবে অপেক্ষা করে রইলাম। প্রার্থনা শেষে তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে শান্তভাবে আমার মস্তক স্পর্শ করলেন।

"আমি ধর্মজগতের মানুষ নই, তবু এই দেবদূতের মতো মানুষটির কাছে বিনত হলাম। কয়েকমুহূর্ত পরে তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'আমার কাজ শেষ হয়ে এসেছে। ঈশ্বর এই শরীরটাকে যে কাজে পাঠিয়েছিলেন তা প্রায় শেষ। যাবার আগে আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।'

"বিস্ময়করভাবে তিনি আমাকে আলোড়িত করেছেন। সে-রাতে ঘুমের চিন্তা বিসর্জন দিয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগলাম। অবশেষে পৌঁছলাম একটি মসজিদের সামনে—শুনতে পেলাম, মধ্যরাতের নৈঃশব্দ্য ভেদ করে সুগম্ভীর ঈশ্বরস্তুতিধ্বনি—আল্লা হো আকবর—ঈশ্বর মহান। আমি অনুভব করলাম, যে বৌদ্ধিক অবিশ্বাস আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা থেকে মুক্ত করে সহজ বিশ্বাসের জীবনে আমাকে উত্তীর্ণ করতে পারেন একজনই—মাস্টারমশাই।"

‘দ্বা সুপর্ণা’

ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

মানুষের জীবনের দুটি দিক,—কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ ; একটিতে ঘরে ফেরা আর একটিতে ঘর ছাড়া ; একটিতে নীড়ের ছোট গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখা, আর একটিতে আকাশের ব্যাপ্তিতে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া। শুধু প্রথমটা নিয়ে মানুষ কোনদিন শান্তি পায়নি, তাই সে বারংবার দ্বিতীয়টির দিকে ঝুঁকেছে। মানুষের সত্তার দুটি দিক তাকে সব সময় দুটি বিপরীত গন্তব্যের অভিমুখে টানছে। অনেকেই এই নীড় ও আকাশের দোটানায় স্বাভাবিকভাবে দিশাহারা। স্বার্থের সংকীর্ণতা থেকে বিশ্বপ্রেমের বিশালতায় উত্তরণ তাদের কাছে সহজসাধ্য নয়। এই উত্তরণ মানুষের নবজন্মের সূচনা করে, কীট্সের ভাষায় ‘dying into life’, প্রকৃত অর্থে মানুষ দ্বিজত্বে উন্নীত হয়। পাখির জীবনে যে-দ্বিজত্ব দৈহিক, মানুষের জীবনে সে-দ্বিজত্ব আধ্যাত্মিক। পাখি মানুষের ঘরবাঁধার প্রবণতার যেমন মূর্ত প্রতীক, তেমনই প্রতীক তার আত্মিক অভীপ্সার। স্কাইলার্ক-পাখির মধ্যে ওয়র্ডসোয়র্থ এই দুই দিকের সমন্বয় মূর্ত হয়ে উঠতে দেখেছেন, ‘true to the kindred points of heaven and home’। শেলির স্কাইলার্ক শুধু নভোচারী, মাটির মায়া কাটিয়ে সে উড়ে চলে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে, ভূর্ভুবঃ স্বঃ। সে স্বাধীনতা ও দুঃসাহসের প্রতীক, সে প্রতীক সুদূরের পিয়াসার। Hal Barland বনহংস-সম্পর্কে যা লিখেছেন সেটা শেলির স্কাইলার্ক-সম্পর্কেও প্রযোজ্য : ‘…he is the epitome of wanderlust, limitless horizons and distant travel. He is the yearning and the dream, the search and the wonder, the unfettered foot and the wind’s-will wing.’

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে, শিল্পকর্মে, দর্শনে, ধর্মশাস্ত্রে পাখির প্রতীক ও চিত্রকল্প বারবার এসেছে। নরওয়ের নাট্যকার হেন্‌রিক্‌ ইব্‌সেনের ‘The Wild Duck’ মর্মস্পর্শী নাটক এবং সেটা ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হলেও তার ভাবধারা ও সুর বিশশতকী। একজন প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক একটি জার্মান চলচ্চিত্রে এ-নাটকের যে অসাধারণ রূপায়ণ করেছেন—তাতে পাখির প্রতীকটি অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

ঋগ্বেদের একটি বিখ্যাত শ্লোক (১।১৬৪।২০) মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।১) ও অন্যত্র উদ্ধৃত হয়েছে :

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিসস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত ‘উপনিষৎ গ্রন্থাবলী’, প্রথম খণ্ডে (১৩৭৭ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২৫) এর অনুবাদ এইভাবে করা হয়েছে :

‘সর্বদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে।’

‘সখায়া’-শব্দের ‘সমান নামধারী’ অনুবাদ কোন কোন সাধারণ পাঠকের কাছে স্পষ্টভাবে বোধগম্য না হতে পারে। এই দুই পাখি পরস্পরের সখা, তারা মৈত্রীর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। Wilson-এর ইংরেজী অনুবাদ ‘mutual friends’ কিংবা Griffith-এর ‘Knit with bonds of friendship’ এ-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

টীকাকারেরা সাধারণত এই দুই পাখিকে যথাক্রমে জীবাত্মা ও পরমাত্মা-রূপে ব্যাখ্যা করেন। বর্তমান লেখকের ধারণা, এই দুই পাখি মানুষের ব্যক্তিজীবনের দ্বৈত সত্তার স্বরূপ। (W. B. Yeats, যিনি উপনিষদের অনুরাগী পাঠক এবং অনুবাদকও ছিলেন, তাঁর 'Byzantium' কবিতার তৃতীয় স্তবকে যখন পাখিদের এনেছেন, তখন হয়তো এই শ্লোকটি তাঁর স্মরণে ছিল।) প্রথম পাখিটি মানুষের পার্থিব সত্তা, 'Of the earth, earthy', তাকে অনিত্য ভোগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় পাখিটি মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা, বাইবেলে যাকে 'the new man, the heavenly man' বলা হয়েছে, তাকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। (অবশ্য আধ্যাত্মিক সত্তাকে পরমাত্মা-রূপে কল্পনা করতেও কোন বাধা নেই।) ত্যাগের দ্বারা ভোগ শাশ্বত ভোগ, জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য, মানুষের মহত্তম বৃত্তি। এই বৃত্তির কথাই রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক প্রিয় ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'। 'ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করা' এবং 'ত্যাগের দ্বারা ভোগ করা' স্পষ্টতই সমার্থক। এই ত্যাগ হচ্ছে নিজের ইচ্ছাশক্তির বিসর্জন, রমণ-মহর্ষি যাকে বলেছেন 'অহংকে মুছে ফেলা'। এই কথাই রবীন্দ্রনাথের গানে ঝংকৃত হয়েছে—'তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন-মাঝে'। আমরা সাধারণ মানুষ সব-সময় শুধু চেয়ে চলেছি, শুধু পাওয়ার জন্য ব্যস্ত। বহু বাসনায় প্রাণপণে চাইছি। এর ফলে আমাদের শক্তি অবিরত ক্ষয় করছি নির্বোধের মতো, ওয়র্ডসোয়র্থ যাকে বলেছেন, 'getting and spending, we lay waste our powers'। নিজের স্বত্ব, নিজের অধিকার, নিজের মালিকানা—এই-সব নিয়ে শুধু আপনাকে ঘিরে পলে পলে ঘুরে মরছি। যে-মুহূর্তে আমরা সংসারের অনিত্যতা বুঝতে পারব, তার আসক্তির বন্ধন কাটাতে পারব, সেই মুহূর্তে আমরা মুক্তি পাব। তখনই আমরা সংসারকে সার্থকভাবে ভোগ করতে সমর্থ হব। যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এক ঐশী শক্তি সর্বভূতে সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত, তখন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য আমাদের আর কোনও মোহ থাকবে না। অবিদ্যার অন্ধকার কিন্তু এই পরম সত্যকে আমাদের দৃষ্টিগোচর হতে দেয় না। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' আকুতির মধ্যে যে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে সেটা এই অজ্ঞতার আঁধার দূর করার জন্য। অন্তর্নিহিত সত্যকে গ্রহণ করতে পারলে বাইরের মিথ্যা আবরণ বা 'painted veil'-এর জন্য ব্যাকুলতা থাকবে না, তখন হৃদয়ঙ্গম হবে শেলির 'Adonais'-এর এই পঙ্‌ক্তিগুলির প্রকৃত তাৎপর্য :

> The One remains, the many change and pass ;
> Heaven's light forever shines, Earth's shadows fly,
> Life, like a dome of many-coloured glass,
> Stains the white radiance of Eternity,
> Until Death tramples it to fragments.

যেটা ইন্দ্রিয়সুখকর সেটা প্রেয়, আর যেটা কল্যাণকর এবং মোক্ষের সাধনবিদ্যা, সেটা শ্রেয়। 'দ্বা সুপর্ণা'র প্রথম পাখিটিকে আমরা প্রেয়ের উপাসক-রূপে গণ্য করতে পারি, আর দ্বিতীয় পাখিটিকে শ্রেয়ের সাধক-রূপে। পাখি দুটি যেরকম পরস্পর সংযুক্ত, প্রেয় ও শ্রেয় সেইভাবে মানুষের জীবনে ওতপ্রোত। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়বল্লীর প্রথম শ্লোকে আমরা পাই :

> অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
> স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।

তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্ত সাধু ভবতি
　　হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥

স্বর্গত অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'নক্ষত্রমালা'—পুস্তিকায় শ্লোকটির ব্যাখ্যা এই-ভাবে করেছেন :

'যাহা পরিণামে হিতকর তাহা শ্রেয়ঃ, আর যাহা আপাতমধুর তাহা প্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পরস্পর ভিন্ন, তাহাদের উদ্দেশ্যও ভিন্ন, ফলও ভিন্ন। এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়েই মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করে। যিনি এই দুইটির মধ্যে শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করেন তাঁহার মঙ্গল হয়, আর যিনি প্রেয়ঃকে বরণ করেন তিনি মঙ্গলের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন।' দার্শনিক প্লেটোর 'Phaedrus'-এ (237d) কয়েকটি ছত্র আছে যেখানে একই ভাবধারা প্রবাহিত :

'আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দুটি নিয়ামক নীতি রয়েছে। সেগুলি যেদিকেই আমাদের নিয়ে যাক না কেন, আমরা তাদের নির্দেশ অনুসরণ করি। এদের একটি হচ্ছে সুখভোগের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি, অন্যটি আহৃত বিচারবোধ যার অভিলাষ উৎকর্ষের দিকে। এই দুটি নীতি আবার কখন সুসমঞ্জস অবস্থায় থাকে, কখনও বা আমাদের অন্তরে এদের সংঘর্ষ বাধে এবং কখন এটি কখন অন্যটি জয়ী হয়।'

প্লেটো-কথিত এই নীতি দুটিকে স্বচ্ছন্দে কঠোপনিষদ্-বর্ণিত প্রেয়োমার্গ ও শ্রেয়োমার্গের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

রামকৃষ্ণদেব 'কাঁচা-আমি' ও 'পাকা-আমি'র কথা বলেছেন। কাঁচা-আমি প্রথম পাখি, 'স্বাদু ফলের' দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। পাকা-আমি নিরাসক্ত ; সে নিরপেক্ষ দর্শকের চোখ নিয়ে বিশ্বরূপের খেলাঘরে জীবনের খেলা দেখে খুশি, দ্বিতীয় পাখিটি যেমন ফল দেখেই পরিতৃপ্ত। তার আনন্দের সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি **Lucretius**-এর **'De Rerum Natura'**-কাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে বর্ণিত নিরাপদ-সত্যের তীরে অবস্থিত সেই দর্শকের অনুভূতির যে মিথ্যার সমুদ্রে হাবুডুবু-খাওয়া লোকদের নিরাসক্তভাবে নিরীক্ষণ করতে পারে।

নরেন্দ্রপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

শ্রীসুনীলকুমার পাল

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে সদ্য-উদ্‌ঘাটিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের স্থাপত্য ইতিমধ্যেই বহুজনের বিমুগ্ধ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে। বর্তমান নিবন্ধের লেখক সেই মন্দিরের মুখ্য রূপকার—ইদানীংকালের প্রখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী।

সমবেতভাবে একত্র বসে উপাসনার গৃহ আর পূজামন্দিরকে এক করে মিলিয়ে বেলুড় মঠে নির্মিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির ভারতবর্ষের আধুনিক মন্দির-স্থাপত্যে প্রয়োজনের দিক ও সেই সঙ্গে সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এক নতুন ও সার্থক সৃষ্টি। স্বয়ং স্বামীজীর পরিকল্পনার আদর্শে এর "প্ল্যানিং" হয়েছিল ; মন্দিরের এই "টাইপ"কে লোকে গ্রহণ করেছে, তাই চারিদিকে এর অনুকরণ-চেষ্টাও চলছে। নরেন্দ্রপুর আশ্রমের এই মন্দিরেও উল্লিখিত ভাবকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ পূজামণ্ডপ ও নাটমণ্ডপ এক করে এর স্থাপত্যরূপ গঠন করা হয়েছে। শুধু শিল্প-রূপ এর আলাদা। বাংলার গ্রামের দোচালা আর চারচালা এবং কাঠের কাজ মনে রেখে কংক্রীটের এই স্থাপত্য। বিশেষ করে, কামারপুকুরে ঠাকুরের মাটির ঘরখানির মায়া এই মন্দিরের মধ্যমণি। এবং এর রূপকল্পনার প্রেরণা।

মন্দির

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও কবি। বর্তমান রচনার পটভূমিকা—নরেন্দ্রপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির।

মন্দির ঈশ্বর ও মানুষের সংযোগ-সেতু। অনন্ত আকাশের উদ্দেশে সমুত্থিত যুক্তকর ঊর্ধ্বমুখী প্রণাম। গূঢ়তম প্রার্থনার শিলায়িত প্রতীক।

অন্তরের অন্তরে আছেন আত্মা। গুহাহিত নিভৃতে অনির্বাণ। এই মন্দিরের মাধ্যমে তিনি যুক্ত হলেন বিশ্বচরাচরের সঙ্গে। অনন্ত আর সান্ত—আপাতদৃশ্য এ পার্থক্য মন্দিরের শীর্ষচূড়া থেকে শেষ সোপান অবধি নিজেদের পরম ঐক্য ঘোষণা করলে।

তিনি ছিলেন, তিনি এলেন, তিনি যুগে যুগে ফিরে ফিরে আসবেন—এই সত্যটি বারবার বেজে চলেছে মন্দিরের সর্ব অঙ্গে, সর্ব অলঙ্করণে।

বাক্য-মনের অতীতকে আমরা স্পর্শ করতে চেয়েছি। তাই তো কবিতা, শিল্প, মন্ত্র, সুর, ছবি, ভাস্কর্য, স্থাপত্য; তাই তো ধূপ, দীপ, শঙ্খ, পুষ্প, প্রার্থনা। ভোরের মঙ্গলারতি, মানসে ও উপচারে নিত্যপূজা, সন্ধ্যার প্রদীপ, শীতল ও শয়ন।

উদ্ভাসিত তিনি পটে, প্রতীকে, বিগ্রহে, চিত্রমালায়; বঙ্কিম-রেখায়িত নানান আলপনায়, এক চূড়া থেকে আর এক চূড়ায়, স্নিগ্ধ, সৌম্য বর্ণসুষমায়। ভৈরোঁ থেকে বাগেশ্রী অবধি তাঁর অনাহতধ্বনিকে আভাসিত করে চলে সানাই। তার সব রংপরংই মূল সুরধ্বনির নানান প্রতিরূপ।

যিনি পূজারী, তাঁর পূজায় কখন এসে মিশে যায় সব ভক্তের হৃদয়। যারা মন্দিরে সমবেত, স্মরণরত, যাদের সমস্ত দিনটি এক অখণ্ড পূজার ছন্দে আবর্তিত—সকলের সব পূজা কখন একজনের পূজায় রূপান্তরিত হতে থাকে। আর পূজারী কখন দেবতায় মিশে যায়! দেবতা পরিব্যাপ্ত সমস্ত মন্দিরে।

তিনি তো পূজারীই ছিলেন—আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ! দক্ষিণেশ্বরে তাঁর পূজাময় ভবতারিণীমন্দির আর একরূপে ফিরে এল গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেলুড় মঠের মন্দিরে। জগতের মাকে যিনি জাগিয়েছিলেন, তিনিই এবার জাগ্রত দেবতা। আর, সেই দেবতার দিব্যধ্যানস্পর্শে পূবে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে নতুন মন্দির জেগে উঠছে অবিরত।

তারা এক, তবু অনেক। হৃদয় থেকে হৃদয়ে, স্থান থেকে স্থানান্তরে, এক শিল্পী থেকে আর এক শিল্পীর দৃষ্টিপার্থক্যে। এক-এক মন্দিরে এক-এক অভিনবত্ব। সৃষ্টির মূলে যেমন এক, তবু প্রতিটি সৃষ্টিই যেমন অনন্ত।

মন্দিরে মন্দিরে আপন অনন্তস্বরূপকে অভিব্যক্ত করেছেন ভগবান বুদ্ধ, করছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রতি মন্দিরে তাঁদের নিত্য নব পদক্ষেপ।

বাইরে থেকে এ মন্দির স্থির, সীমাবদ্ধ। অন্তরে চিরন্তন এর রথযাত্রা। পথের এক প্রান্তে তার কাছটি থেকে আমাদের যাত্রা শুরু, আর এক প্রান্তে তারই কাছে যাত্রাশেষ। দিনের সমস্ত দাহ রাতের গভীরে মিলিয়ে যাবার সংকেত নিয়ে আসে পঞ্চপ্রদীপ। পঞ্চশিখা কখন মৌন নিশীথের লক্ষ দীপাবলী!

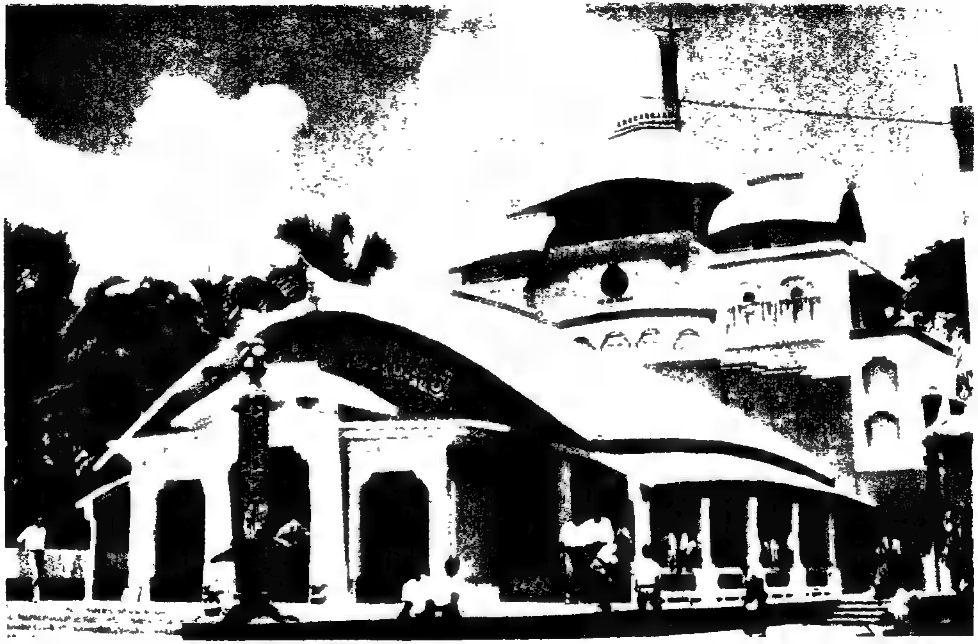

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—নরেন্দ্রপুর

আলোকচিত্রী : পার্থসারথি নিয়োগী

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠা

শ্রীরণজিত মুখোপাধ্যায়

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদে সংশ্লিষ্ট।

নরেন্দ্রপুর। কলকাতা থেকে ষোল কিলোমিটার দক্ষিণে। ময়দান, রবীন্দ্রসদন, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট অব্ কালচার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পিছনে রেখে, গড়িয়া ছাড়িয়ে নরেন্দ্রপুর। পুরনো উখিলা-পাইকপাড়া ধন্য হল বিশ্ববন্দিত স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যনামকে শিরে ধারণ করে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা থেকে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্রপুরে সংস্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা-শুরু। আজ তা বিশাল এক শিক্ষাক্ষেত্র। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, অন্ধ বালক বিদ্যায়তন, জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল, লোকশিক্ষা পরিষদ, গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য আরও কয়েকটি শিক্ষালয় নিয়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম এক বিরাট বনস্পতিসদৃশ প্রতিষ্ঠান—যা প্রকৃতিতে যেন গোটা ভারতবর্ষেরই একটি ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ। ভারতের সব রাজ্যের ছেলেরা এখানে শিক্ষালাভ করে।

দূর থেকে, কাছ থেকে হাজার হাজার মানুষ আসেন আশ্রমে। কেউ অভিভাবক, কেউ শিক্ষার্থী, কেউ গবেষক, আবার কেউ-বা দর্শনার্থী মাত্র। সকলেরই ইচ্ছে থাকে আশ্রমে প্রবেশ করে আশ্রমের দেবালয়ে গিয়ে অধিষ্ঠাতা দেবতার পায়ে প্রণতি নিবেদন করেন। অথচ ছাত্রাবাসের প্রার্থনাকক্ষ ক্ষুদ্র-পরিসর, ছাত্র-শিক্ষকের বাইরে দর্শনার্থীদের স্থান সেখানে হয়ে ওঠে না। বাসনা অতৃপ্ত থাকে অনেকেরই, অধিকাংশেরই। সকলেরই জিজ্ঞাসা—আশ্রমে মন্দির কই? মন্দিরবিহীন আশ্রম কেমন যেন বিগ্রহহীন দেবালয়। সেই অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা কালক্রমে উচ্চারিত হল। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবেদিত হতে থাকল যথাস্থানে। গ্রাম থেকে আসা কর্মিগণেরও ঐ একই আকূতি যুক্ত হল সেই সঙ্গে। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী আজ রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের অনুপ্রেরণায় ও সহায়তায় সঙ্ঘবদ্ধ, জগদ্ধিতায় সংকল্পবদ্ধ। অন্নহীন, বিত্তহীন তথাকথিত দুর্বল অসহায় মানুষকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা এঁদের ব্রত। এঁরা আশ্রমে আসেন দিনে-রাতে আলোচনা-পরামর্শের জন্য। এঁরাও চাইলেন একটি মন্দির। দরিদ্র এঁরা অর্থের অভাবে—কিন্তু হৃদয় সম্পদে এঁরা ধনী। এঁরা এগিয়ে এলেন—এমনকি কিছু পরিমাণ অর্থ সংগ্রহেরও প্রতিশ্রুতিসহ। প্রাণের সাধ—একটি মন্দির—শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির। তদানীন্তন সঙ্ঘাধীশ পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দ মহারাজও অগণিত প্রাণের এই আর্তিতে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, নরেন্দ্রপুরের সমগ্র গ্রাম-সেবা প্রকল্পে তথা লোকশিক্ষার কাছে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর উৎসাহ, প্রেরণা ও আশীর্বাদ ছিল এক অমিত শক্তির উৎসস্বরূপ। যা হোক, বেলুড় মঠস্থ মিশন-কর্তৃপক্ষ অনুমোদন জানালেন—নরেন্দ্রপুরে মন্দির হোক। সবুজ সঙ্কেত পাওয়া গেল।

শত শত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপ নিতে থাকল ধীরে ধীরে। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির যখন গড়ে উঠছে নরেন্দ্রপুরে—তখন গ্রামে-গঞ্জে, দূরে কাছে সকলেই এই মন্দির-গঠনের বিশাল ব্যয়ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে কাজে নেমে পড়েছেন। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় একদিন সত্যি সত্যিই মন্দির

নির্মাণ শুরু হল। বিখ্যাত ভাস্কর শ্রীসুনীলকুমার পাল ও বাস্তুকার শ্রীদুর্গা বসু একদল কর্মিসহ মন্দিরনির্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন দীর্ঘ পাঁচ বছর। বিভিন্ন স্থানের নানা মন্দিরের নক্শা সংগ্রহ হল, কত আলোচনাই হয়েছিল পূজনীয় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী এবং পূজনীয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে মন্দিরের গঠনশৈলীর ব্যাপারে। চিত্রশিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। অনেক পরিমার্জন ও পরিবর্তনের পরে শ্রীসুনীল পাল এক চূড়ান্ত রূপ দিলেন মন্দির-স্থাপত্যের।

তৈরি হল মন্দির। একশো ফুট দীর্ঘ, চল্লিশ ফুট প্রশস্ত ও পঁচাত্তর ফুট উচ্চ এই মন্দির বাংলার আটচালার প্রতিরূপ। পল্লীবাংলার কুটীর ও বিভিন্ন প্রদেশের এবং ধর্মের কিছু কিছু স্থাপত্যভঙ্গীসহ গঠিত এই মন্দির। প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরের মতো আশ্রমস্থ এই মন্দিরের সম্মুখভাগে নাতিদীর্ঘ দুটি দীপস্তম্ভ। সম্মুখের প্রধান প্রবেশদ্বারটি ছাড়াও রয়েছে দুপাশে দশটি প্রবেশপথ দিক্পতিদের জন্য নির্দিষ্ট। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের নাগররীতির প্রভাব সম্বলিত এই মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত সোপান। আশ্রমের প্রথম প্রবেশপথটি ধরে এগিয়ে এসে বাঁয়ে বেঁকে যাওয়া পথটি ধরে সামান্য এগিয়ে গেলেই প্রশস্ত সোপানশ্রেণী মন্দিরে ওঠার।

কিন্তু মন্দির তৈরি করাই তো শেষ কথা নয়। বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসবের মাধ্যমে এই মন্দিরপ্রাঙ্গণকে শত-সহস্র মানুষের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠতে হবে। দেবতা প্রতিষ্ঠিত হবেন মন্দিরে,—মন্দির মানুষের হৃদয়ের প্রতীক—তাই দেবতার আসন হবে মানুষের হৃদয় জুড়ে। তবেই তো হবে সফল মন্দির-প্রতিষ্ঠা।

২১ মে, ১৯৮৫। সূর্যোদয়ের পূর্বে সানাই ভৈরবীতে ঘোষণা করল উৎসবের শুভ সূচনা। আশ্রমিকগণ স্নান সমাপনান্তে একে একে এগিয়ে এলেন মন্দিরপ্রাঙ্গণে, ভীড় করে দাঁড়ালেন যজ্ঞমণ্ডপে—যেখানে শুরু হয়েছে বাস্তুযাগ। কাশীর বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বেদমন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসবের সূচনা করলেন। আশ্রমিকদের কণ্ঠে তখন গীত হচ্ছিল প্রভাতী ভজন। সুরে-তানে-লয়ে, কথায়-আচরণে, চলনে-বলনে সকলের মধ্যেই প্রকাশিত এক আকুতি—দেবতার প্রতি সভক্তি আহ্বান। সারাদিন শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ-মননের মধ্য দিয়ে প্রস্তুতি চলল ২২ মে-র জন্য। একে একে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে পৌঁছলেন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ।

২২ মে। প্রাতঃকালে সানাই-এর সুর অনুরণিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী ও ভক্তগণ মন্দির প্রদক্ষিণ করে সূচনা করলেন প্রভাতফেরীসহ আশ্রম পরিক্রমার। সকলের আগে প্রবীণ সন্ন্যাসীদের হাতে পবিত্র গৈরিক ধ্বজা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রী স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকল বেদমন্ত্র। অতঃপর সকলের মিলিত কণ্ঠে গীত—শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত। সব মিলিয়ে এক পবিত্র আনন্দময় পরিবেশ। ক্রমে ক্রমে সমবেত হলেন ভক্তবৃন্দ,—জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম, যজ্ঞমণ্ডপে সপ্তশতী যজ্ঞ, বাইরে ভক্তবৃন্দের আনন্দ-গুঞ্জনে প্রাঙ্গণ মুখরিত। সকলের মধ্যেই কিন্তু একটি প্রত্যাশা, সকলের দৃষ্টিই তখন একদিকে।

আশ্রমের প্রবেশপথটি একটি সুদৃশ্য তোরণে সুসজ্জিত। রামবাগান পল্লীর শিল্পীদের তৈরি বাঁশ ও বেতের এই সুদৃশ্য তোরণ সমগ্র প্রাঙ্গণের

সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল শতগুণ। ঐ প্রবেশপথের দিকেই তাকিয়ে আছেন সকলে। মূল মণ্ডপে সহস্র সহস্র ভক্তের উপস্থিতিতে চলছে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা। আশ্রমের বাইরে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় আছেন দর্শনার্থী জনতা,—তাদের সবার হাতে ফুল, মালা, শাঁখ। আসবেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। সঙ্ঘনায়কের পবিত্র হস্তের নিবেদিত অর্ঘ সূচিত করবে মন্দিরের উদ্বোধন,—দ্বারোদ্ঘাটন। মহারাজজী আশ্রমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল শত শত শাঁখ। সমবেত মাতৃকণ্ঠের উলুধ্বনি ঘোষণা করল পূজ্যপাদ মঠাধীশ মহারাজের আগমন। হাজার হাজার নারী-পুরুষের সম্মিলিত কণ্ঠে তখন ধ্বনিত—'জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কি জয়'। তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণ-মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসিমণ্ডলী। ধীরে ধীরে মহারাজজী এগিয়ে এলেন মন্দিরের দিকে। সমগ্র মন্দিরপ্রাঙ্গণ তখন যথার্থই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের মিলনক্ষেত্র—পুণ্যতীর্থ। আগে আগে চলেছেন পূজ্যপাদ প্রেসিডেণ্ট মহারাজ। তিনি প্রবেশ করলেন মন্দিরাভ্যন্তরে—তাঁর পবিত্র হাতের অর্ঘ নিবেদিত হল যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে। উপস্থিত ভক্ত নর-নারী সকলেরই প্রাণের পূজা নিবেদিত হল সঙ্ঘগুরুর করকমলের অর্ঘ নিবেদনের মধ্য দিয়ে।

মন্দির-উদ্বোধনের পর পূজ্যপাদ গম্ভীরানন্দজী মহারাজ উদ্বোধন করলেন একটি প্রদর্শনীর। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী ছবিতে ও কথায় বিধৃত হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনিশ্চিত-উদ্দেশ্যবিহীন জনজীবনে যিনি নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, যাঁর সহজ-সরল কথায় মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছিল বেদান্তের সারাৎসার, যিনি সকল ধর্মকেই সমান প্রীতি ও শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে ও করিয়ে নবযুগের সূচনা করেছিলেন—সেই অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনালেখ্যসহ এই প্রদর্শনীটি উপস্থিত সকলের কাছেই মন্দিরের পবিত্রতা নিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল।

এরপর মূল মণ্ডপে পূজ্যপাদ প্রেসিডেণ্ট মহারাজ ভক্তি-পিপাসায় আর্ত কয়েক সহস্র মানুষকে শোনালেন যুগাবতারের আগমনের তাৎপর্য; ব্যাখ্যা করে বোঝালেন বর্তমান এই অবক্ষয়ের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রয়োজন ও মাহাত্ম্য। পূজনীয় মহারাজ সকলের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে পূজনীয় মহারাজকে বিদায় জানালেন। ইতিমধ্যে পূজনীয় মহারাজ মন্দিরনির্মাণে যে নিঃস্বার্থ ভাস্কর তাঁর অন্তরের সমস্ত ভক্তিকে উজার করে ঢেলে দিয়েছেন সেই শ্রীসুনীল পাল মহোদয়কে, বাস্তুকার শ্রীদুর্গা বসুকে এবং কর্মী শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রীতি ও শুভেচ্ছার প্রতীকস্বরূপ বস্ত্র-উত্তরীয় প্রদান করেন।

এবার প্রসাদ বিতরণের পালা। কর্মিগণ প্রস্তুত। প্রস্তুত ভক্তগণও। দশ সহস্রাধিক মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে দেবালয়ের সামনের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে গ্রহণ করলেন প্রসাদ। তৃপ্ত হয়েছিল সকলেই। একই সঙ্গে চলছে মূল মণ্ডপে ভক্তিমূলক সঙ্গীত—পরিবেশন করছে দেশের বিখ্যাত শিল্পিগণ, কালীকীর্তন পরিবেশন করলেন আন্দুল কালীকীর্তন সমিতি, রামায়ণ গেয়ে শোনালেন শ্রীঅনাথবন্ধু অধিকারী, আশ্রমের অন্ধ বালক বিদ্যায়তনের ছাত্রগণ নিবেদন করলেন গীতি-আলেখ্য: অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ। অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত হল ধর্মসভা—রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ

মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী সুললিত ভাষায় "শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির"—এই বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণে দেশ-বিদেশের আধ্যাত্মিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির বর্তমান বিশ্বে কী ভূমিকা পালন করছে, তা বুঝিয়ে বলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণীর পটভূমিকায়, ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ও বর্তমান বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। ভক্ত-হৃদয়ের সীমাহীন আকুলতা যেন বাণীরূপ পেল সন্ধ্যার সুন্দর অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সুললিত ভাষণে।

প্রভাতে যে উৎসবের সূচনা—সন্ধ্যায় তার পূর্ণ পরিণতি আরাত্রিকে ও ভজনে। বেজে উঠল কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খ, শত কণ্ঠে গীত হল 'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়'। ছোট মন্দির, কিন্তু ভক্ত যে অনেক। কিন্তু স্থানের অপ্রতুলতা প্রাণের আবেগকে বাধা দিতে পারেনি। মন্দির ছাড়িয়ে সংলগ্ন প্রাঙ্গণে হাজার হাজার মানুষ, পুরুষ-নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী, শিশু, হিন্দু-মুসলমান—সকলের প্রাণের আকুতি, হৃদয়ের অর্ঘ নিবেদিত হল শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে। পরে সভামণ্ডপে বিশ্বখ্যাত বেহালাবাদক পণ্ডিত ভি. জি. যোগের বেহালাবাদনের মধ্যেও নিবেদিত হল শিল্পীর সহস্র সহস্র শ্রোতার ভক্তিশ্রদ্ধা।

২১ মে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসবের সূচনা। উৎসব চলল ২৬ মে পর্যন্ত। ঊষাকালের ভৈরবীতে প্রতিদিনই ঘোষিত হত দিনের শুভ অনুষ্ঠানসূচী। ঊষা থেকে নিশা—একের পর এক অনুষ্ঠান। ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান, গানে ও কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন, বিখ্যাত শিল্পী শ্রীবুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সরোদবাদন, শ্রীঅমরেশ চৌধুরীর প্রাণমাতানো ভজন, শ্রীসমরেশ চৌধুরীর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও ভজন, শ্রীধীরেন বসুর ভক্তিগীতি ও সন্ধ্যায় ধর্মসভা। ২৩ মে-র ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করলেন স্বামী সিদ্ধিনাথানন্দজী এবং প্রাত্যহিক জীবনে মন্দিরের তাৎপর্য বিষয়ে বললেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী কর্মসচিব স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী হর্ষানন্দজী এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ। ২৪ মে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী—এই বিষয়ে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী কর্মসচিব স্বামী গহনানন্দজী এবং আলোচনা করলেন স্বামী স্মরণানন্দজী, স্বামী অমৃতানন্দজী, অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। ২৫ মে ধর্মসভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী'। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী কর্মসচিব স্বামী আত্মস্থানন্দজীর সভাপতিত্বে এই সভায় ভাষণ দেন স্বামী অজজানন্দজী, স্বামী হর্ষানন্দজী, স্বামী অকামানন্দজী এবং ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর।

২৬ মে উৎসবের সমাপ্তি দিবস। প্রাতঃকালে আশ্রমিকগণ, সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং শত শত গ্রামকর্মী পরিক্রমা করলেন আশ্রম—শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত গেয়ে। মন্দিরে হল শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা। সকালে অনুষ্ঠিত হল আলোচনা-সভা। আলোচ্য বিষয়: 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলন'। স্বামী জিতাত্মানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী ও শ্রীশিবশঙ্কর চক্রবর্তী—তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ এবং ব্যক্তি-মানুষের কর্তব্য স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন ভক্ত শ্রোতাদের কাছে।

সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভার বিষয় ছিল: 'সর্বধর্ম সমন্বয়'। সভাপতিত্ব করলেন স্বামী

অক্ষরানন্দজী। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বললেন স্বামী মুমুক্ষানন্দজী এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে স্বামী হর্ষানন্দজী বলেন। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বললেন বিচারপতি শ্রী এস. এ. মাসুদ এবং খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করলেন রেভারেণ্ড বি. সি. দাস। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও ইসলাম—সর্বধর্মের সারমর্ম স্পষ্ট হয়ে, স্বচ্ছ হয়ে সিক্ত করল শ্রোতাদের মন। যখন সংকীর্ণ ধর্ম-জাতি-সাম্প্রদায়িক বোধ বসুধাকে খণ্ড ক্ষুদ্র করেছিল, যখন মানুষের ভেদবুদ্ধি নিজেকে অক্ষম অপদার্থ মনে করে নির্জীব হয়ে পড়েছিল, তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি যখন মানুষের বিচারবোধকে গ্রাস করেছিল, ভয় যখন মানুষকে সংকুচিত করে রেখেছিল—তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম সমন্বয় ও শিবজ্ঞানে জীব-সেবার আদর্শের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে চিনিয়ে দিলেন তার স্বরূপ, ঘোষণা করলেন সে দুর্বল, অক্ষম নয়। বক্তাগণ এক-একটি ধর্মের সারবত্তা ব্যাখ্যা করলেন আর তার যাথার্থ্য নিরূপণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও আদর্শের আলোকে।

ধর্মসভার শেষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাত্রাভিনয়—'সাধক কমলাকান্ত'। পরিবেশক—হাওড়া শিবপুরের রামকৃষ্ণ-মন্দির।

উৎসবের প্রথম দিনে যে আনন্দের শুভ সূচনা হয়েছিল—সপ্তাহকালব্যাপী যে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল অগণিত মানুষেব মধ্যে—অনুষ্ঠানের শেষদিনে শেষলগ্নে—তাতে কিঞ্চিৎ যেন বেদনার ছায়া নেমে আসে স্বাভাবিক কারণে। কিন্তু ঐ যে সামনে মন্দির—মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতা—তিনি তো আনন্দেরই প্রতিমূর্তি। তাঁর উপস্থিতিতে নিরানন্দের অবকাশ নেই সামান্যতম। তাই প্রতিদিন সকালে-সন্ধ্যায় শত শত শান্তিপিপাসু মানুষ, সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ আসছেন শান্ত পদবিক্ষেপে, এগিয়ে যান মন্দিরে। দেবতাকে দর্শন করে, তাঁর চরণে ভক্তির অঞ্জলি দিয়ে ফিরে যান—আবার আসবেন বলে।

মানুষ যে জিনিসটি তৈরি করে, তাতে কোন একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। যাতে idea-র expresssion (ভাবের প্রকাশ) নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art (শিল্প) বলা যায় না। ঘটি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলিও ঐরূপে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ করে তৈরি করা উচিত।

—স্বামী বিবেকানন্দ

জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী

ডক্টর চিত্রা দেব

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট গবেষিকা ও লেখিকা। ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা—বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকায় সংশ্লিষ্টা। প্রকাশিত প্রবন্ধটি বিগত ৬ এপ্রিল, ১৯৮৫ 'উদ্বোধন' কার্যালয়-প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য-সম্মেলনে লেখিকা কর্তৃক পঠিত।

ভারতীয় সাহিত্যে জীবনী-সাহিত্য রচনার ধারাটি খুব প্রাচীন। যতদূর মনে হয়, এদেশে জীবনী রচনার সূত্রপাত হয়েছিল বৈদিক যুগে। ঋগ্বেদ সংহিতার কোন কোন সূক্তের দেবস্তবে দেখা যায়, মাহাত্ম্য বর্ণনা উপলক্ষে তাঁদের জন্ম থেকে কীর্তিকথা সংক্ষেপে বর্ণিত হচ্ছে। এই দেবতার বিজ্ঞাপিকাই হল জীবনী-সাহিত্য রচনার আদিরূপ। অন্যান্য দেশেও এ-জাতীয় উদাহরণ বিরল নয়। এমনও ধারণা করা চলে, পৃথিবীর সব দেশেই দেবতা বা দেবকল্প মানবের জীবনচরিত রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল। একহিসেবে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বিভিন্ন পুরাণ এমনকি বৌদ্ধ জাতকও জীবনী-সাহিত্য।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে, মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে জীবনী-সাহিত্য রচনার কোন চেষ্টা শুরু হয়নি। যদিও রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত রচনার ধারাটি অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশে আধ্যাত্মিক জীবন-সাধনার প্রেরণারূপে এসেছিলেন দুজন অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী দেবোপম মানব। তাঁরা শুধু ধর্ম-সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র দেশবাসীর জীবনে ও মননে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। সংক্ষেপে বলা যায়, বাঙালীর চিত্তলোক যে দুটি নবজাগরণের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, তার হৃদয় মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল তারই ঘনীভূত রসরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন এই দুই দেবকল্প মহামানব শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

ভারতবর্ষে পূর্বে অবতাররূপে যে মহাপুরুষেরা এসেছিলেন তাঁরাই ছিলেন মহাকাব্যের নায়ক। কিন্তু দশাননজয়ী অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধনিয়ন্তা দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য আছে। বরং সাদৃশ্য আছে ভিক্ষু সন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের সঙ্গে, জৈন তাপস মহাবীরের সঙ্গে। এঁদের আবির্ভাব আলোড়ন জাগিয়েছিল উত্তর ভারতে। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সেদিন ধন্য হয়েছিল বাঙালীর জীবন, ধন্য হয়েছিল সমগ্র বঙ্গদেশ। শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য জীবনচরিত রচনার মধ্য দিয়েই বাংলায় জীবনী-সাহিত্য রচনার সূচনা হয়। তাই বাংলা চরিত-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যজীবনীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য গতানুগতিক তুচ্ছতা থেকে মুক্তিলাভ করে। সেই সময় তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মানবলীলার অপূর্ব বৃত্তান্ত লিখে রাখার আগ্রহ তাঁর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দেখা দেয়। জীবিত বা অল্পকাল পূর্বে লোকান্তরিত কোন মহামানবের জীবনী রচনা ও তাঁর সাধনার দার্শনিক ব্যাখ্যাদানের চেষ্টাও শুরু হয় তখন থেকেই। বলাবাহুল্য আধুনিক যুগে আমরা যাকে জীবনী-সাহিত্য বলে থাকি চৈতন্যজীবনীগুলি সে জাতীয় যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ জীবনীগ্রন্থ হয়নি। বরং এদের তুলনা করা যায় য়ুরোপীয় হ্যাজিওগ্রাফী

বা সন্তজীবনীগুলির সঙ্গে। এ-জাতীয় গ্রন্থে সাধকের ভাবজীবনই প্রাধান্য লাভ করে, বাস্তব-জীবন নয়। শ্রীচৈতন্যদেবও ভক্তদের কাছে ছিলেন 'ভাবের মূরতি', কিছু বাস্তব ও কিছু কল্পনায় মেশা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন ও লীলামাহাত্ম্যও আধুনিক মানুষের কাছে পরম বিস্ময়। তিনি শুধু অবতার নন, অবতারবরিষ্ঠ। সুতরাং তাঁর জীবন ও সাধনাসম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে প্রচণ্ড আগ্রহ ও কৌতূহল থাকাই স্বাভাবিক। তাঁর লীলাবসানের পর তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্তরেও জাগ্রত হচ্ছিল তাঁর জীবনলীলা প্রকাশের ঐকান্তিক বাসনা।

চৈতন্য-জীবনীকারদের সামনে জীবনী রচনার কোন দৃষ্টান্ত ছিল না, কিন্তু উনবিংশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী রচনার সময় এদেশে জীবনী রচনার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় রীতিই বেশ পরিচিত। বিশেষ করে ব্রাহ্ম লেখকেরা দেশীয় মহাপুরুষদের জীবনী রচনায় অত্যন্ত উৎসাহবোধ করতেন। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় লেখকদের অনুসরণেই তাঁরা সমসাময়িক ও অনতিকাল পূর্ববর্তী বাঙালী মনীষীদের জীবনী রচনায় মনোনিবেশ করেন। বাংলা-সাহিত্যের এই নতুন শাখাটি তাঁদের হাতেই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রথম বাণী সংকলক ও জীবনী লেখকও জনৈক ব্রাহ্ম মনীষী গিরিশচন্দ্র সেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নির্দেশে 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী সংকলন করেন। পরে এই সংকলন 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় ছিল ১৮৪টি প্রশ্ন ও তার উত্তর। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের অব্যবহিত পরে এই পুস্তিকায় সংযোজিত হয় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

সুরেশচন্দ্র দত্তের 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। পরে তিনিও গ্রন্থটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে পুনঃপ্রকাশ করেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ' নামে। স্বতন্ত্র আকারে ঠাকুরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন রামচন্দ্র দত্ত। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থে তিনি ঠাকুরের বাল্যলীলা ও সাধন-ভজনের বৃত্তান্ত এবং তাঁর পরবর্তী জীবনের যেসব ঘটনাবলী রামচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা প্রকাশ করেন।

এর কয়েক বছর পরে অক্ষয়কুমার সেন বাংলা পয়ারের সহজ ছন্দে লিখলেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'। পুরনো রীতিতে লেখা হলেও এই গ্রন্থটি অতীব সুন্দর, সুললিত ও সুখপাঠ্য। স্বামীজী তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে লিখেছিলেন, 'তার কণ্ঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন।' শুধু তাই নয়, পরবর্তিখণ্ডে লেখবার জন্যে কিছু কিছু নির্দেশও পাঠিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমারের পুঁথিতে শ্রীমা সারদাদেবীর কথা বিশেষ ছিল না। স্বামীজীর নির্দেশে তিনি গ্রন্থে মাতৃস্তব সংযোজন করেন।

এ-সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা তাঁদের গুরুদেবের জীবনচরিত রচনায় হস্তক্ষেপ করেননি। বরং স্বামীজী প্রথমদিকে তাঁর গুরু-ভাইদের এ-ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে একপ্রকার নিষেধ করেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন, 'তাঁর জীবনচরিত যে কেউ লিখবে, তার সঙ্গে তোমরা নিজেদের জড়িত করো না বা তা অনুমোদন করো না।' গুরুভাইদের এভাবে সাবধান করে দিলেও এ-সময় থেকেই স্বামীজী ঠাকুরের জীবনী রচনার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন, 'আমি একটা পরমহংস

মহাশয়ের জীবনচরিত লিখে পাঠাব। সেটা ছাপিয়ে ও তর্জমা করে বিক্রি করবে।' স্বামীজীর লেখা ঠাকুরের জীবনের সেই সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রই তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যের আঁকা প্রথম জীবনচিত্র।

ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী গ্রন্থ প্রথম রচনা করেন ম্যাক্সমূলার। তবে সংক্ষেপে The Hindu Saint নামে ঠাকুরের সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই প্রবন্ধই Paramhansa Ramkrishna নামে পুস্তিকাকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ম্যাক্সমূলার এই পুস্তিকা পাঠ করে প্রথমে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংক্রান্ত আরও বহু তথ্য সংগ্রহ করে রচনা করেন Ramkrishna : his life and sayings। তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম বিদেশী জীবনীকার। স্বামীজীর নির্দেশে ম্যাক্সমূলারকে ঠাকুরের জীবনী-সংক্রান্ত কিছু কিছু কাগজপত্র ও তথ্য বেলুড় মঠ থেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন স্বামী সারদানন্দ। পরে এই তথ্য সংগ্রহই তাঁর নিজস্ব গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' রচনার কাজে লাগে।

এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাণী ও উপদেশ সংকলনের কাজও শুরু হয়েছিল। ভক্ত-সাধারণের কাছে মহাপুরুষের জীবন ও বাণী সমার্থক। তাই ঠাকুরের জীবনী রচনারও আগে শুরু হয়েছিল তাঁর অমৃতোপম বাণী সংকলন। এ-জাতীয় সব গ্রন্থকে না হোক শ্রীম-সংকলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-কে সকলেই জীবনীগ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। অভিভূত হয়ে শ্রীম-কে জীবনীলেখক বস্‌ওয়েলের সঙ্গে তুলনা করেছেন অলডাস হাক্সলি।

মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় থেকে ঠাকুরের দেহাবসানের সময় পর্যন্ত শ্রীম অন্তরঙ্গ পার্ষদের মতোই তাঁকে দর্শন করেন ও দিনলিপিতে সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখে রাখেন। এই সাক্ষাৎকারের যথাযথ বিবরণই কথামৃত নামে বিখ্যাত। প্রথমে মহেন্দ্রনাথ এই দিনলিপি প্রকাশের কথা ভাবেননি, কিন্তু শ্রীমার আদেশে তিনি গ্রন্থাকারে এই সাক্ষাৎকার বিবরণ প্রকাশে সম্মত হন। মনে হয়, তিনি ইচ্ছে করেই ঠাকুরের লীলাবসানের একেবারে শেষের পর্বটি বাদ দিয়েছিলেন।

কথামৃতে ঠাকুরের জীবনের বহু ঘটনার বিবরণ ছাড়াও আছে তাঁর অমূল্য উপদেশ, অমৃতোপম বাণী, আছে তাঁর আত্মস্বরূপের কথা। ভক্তদের কাছে তিনি তাঁর নিজের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা ব্যক্ত করেছেন। ঠাকুরকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ; কারণ তাঁর চেতনার স্তর সাধনার উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত। খণ্ডিত মানবের পক্ষে সেই পূর্ণ মানবকে উপলব্ধি করে সেই অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় প্রকাশ করা কখনই সম্ভব হত না যদি না তিনি নিজেই নিজের পরিচয় ভক্তদের জানিয়ে যেতেন। অথচ জীবনীকারকে, তিনি যাঁর জীবনচরিত রচনা করবেন, তাঁর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতেই হবে। কোন মহাত্মা বা ধর্মগুরুর জীবনী রচনায় এটি একটি বিরাট বাধা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, অধিকাংশ গ্রন্থেই শ্রীরামকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। ঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি কারও পক্ষে। সৌভাগ্যক্রমে কথামৃতে তিনি স্বয়ং জীবনচরিত রচনার বহু সূত্র রেখে গিয়েছেন। সেজন্যে পরবর্তী লেখকেরা সকলেই শ্রীম-র কথামৃতের সাহায্য নিয়ে ঠাকুরের জীবনী রচনা করেছেন।

মহেন্দ্রনাথের অনুরোধে স্বামী অভেদানন্দ 'কথামৃতে'র ইংরেজী সংস্করণটি সম্পাদনের ভার

নেন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। স্বামী নিখিলানন্দের সম্পাদনায় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে যে ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে সাল তারিখ অনুযায়ী ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলা কথামৃতে এই বিবরণ সাজানো নেই। পৌনঃপুনিকতা এবং প্রায় একই ধরনের বর্ণনাও দুর্লভ নয়। পড়তে পড়তে মনে হয়, কথামৃত যেন সদ্য আহরিত ফুল, সাজিয়ে গুছিয়ে একটি তোড়ায় বাঁধা হয়নি। কিন্তু তাতে এখন সদ্য তোলা ফুলের সতেজ ভাব, ভোরের শিশির লেগে রয়েছে। অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত বিবরণকে যথাযথভাবে সাজিয়ে গ্রথিত করেছেন স্বামী সারদানন্দ।

বাংলা জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে'র মূল্য অপরিসীম। স্বামী সারদানন্দ এই মহাগ্রন্থটি রচনা শুরু করেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। অন্যদিক থেকেও গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য, কেননা এতদিন ধরে এবং এর পরেও বহুদিন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনচরিত-লেখকরা সকলেই ছিলেন গৃহী ভক্ত। কথামৃতও গৃহী ভক্তের দৃষ্টিতে দেখা ও তাঁদের জন্যেই লেখা। এ-সময় আরও অনেকেই ঠাকুরের জীবনচরিত লেখার চেষ্টা করেন। 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশের ফলে এ-আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্যদের মধ্যে সত্যচরণ মিত্র ও গুরুদাস বর্মণের গ্রন্থের নাম স্মরণীয়। সত্যচরণ মিত্রের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' ছাপা হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, গুরুদাস বর্মণের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত' ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। আরও কয়েকজনের কথা আগেই বলেছি। প্রথমদিকে লেখা ঠাকুরের এই সব জীবনীগ্রন্থই প্রধানত শ্রুতিনির্ভর বিবরণ সংগ্রহ করে লেখা হয়। সত্যচরণ লিখেছেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিশেষ বন্ধু—ভক্ত শ্রীমহিমচন্দ্র [illegible] মহাশয়ের ঋষিতুল্য মুখ হইতে শুনিয়া' এবং গুরুদাস বর্মণের প্রধান অবলম্বন ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা। অবশ্য তিনি তৎকালে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থও দেখেছিলেন। অক্ষয়কুমার সেন শিহড় অঞ্চলের অনেক চাক্ষুষ বিবরণ সংগ্রহ করেন। আরও কয়েক বছর পরে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় কলকাতায় এসে শ্রীম-র নির্দেশে দক্ষিণেশ্বর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের বহু বৃদ্ধ ও প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে ঠাকুরের জীবনী রচনার ও অবতারত্বের বিবরণ সংগ্রহ করেন। অনেক সময় কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির অন্তরালে ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং এরও মূল্য আছে, কিন্তু জীবনীগ্রন্থ হিসেবে এ-জাতীয় কোন গ্রন্থকেই প্রামাণিক বলা চলে না।

স্বামী সারদানন্দের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগে। তবু তিনি প্রথমে ঠাকুরের জীবনী লেখার কাজে হাত দেননি। 'উদ্বোধন' পত্রিকার ভার তাঁর হাতে ছিল এবং এ-সময় তিনি লক্ষ্য করেন, সাধারণ মানুষের মনে ঠাকুরের জীবন সম্বন্ধে প্রবল ঔৎসুক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলি তাদের যথাযথ কর্তব্য পালন করতে পারছে না। তাঁর নিজের কথায়, 'উদ্বোধনে ছাপাবার জন্যে ঠাকুরের সম্বন্ধে তখন নানারূপ প্রবন্ধ আসত। সবগুলিই এত অধিক ভ্রমপূর্ণ যে কেটে ছেঁটে সম্পূর্ণ নতুন করে লিখতে হত। আমার কেবলই মনে হত, আমরা থাকতেই এতটা ভুল প্রচারিত হবে?'

এ-ছাড়াও আরও কিছু কিছু কারণ ছিল। সেইজন্যে স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং ১৯০৯ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি যে মহাগ্রন্থ রচনা করলেন সেটি হল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'।

স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের জীবনকথা অতিবিস্তৃতভাবে অনুপুঙ্খ বর্ণনাসহ উপস্থাপিত

করেছেন। তাঁর রচনা যুক্তিনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক সত্যনির্ভর অথচ ঐকান্তিক ভক্তিনম্রতায় সমুজ্জ্বল। ঠাকুরের দৈনন্দিন জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কিছু জ্ঞাতব্য বস্তুর আকর গ্রন্থরূপে আমরা লীলাপ্রসঙ্গকে গ্রহণ করতে পারি। মধ্যযুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতো দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করে যে দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন এযুগে স্বামী সারদানন্দও ততোধিক কঠিন কাজ সম্পন্ন করলেন লীলাপ্রসঙ্গ রচনা করে। তাঁর মনস্বিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লীলাপার্ষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ-গ্রন্থকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেকে বুঝতে পারেননি। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা সম্ভবও হয়নি সবসময়। অনেকে মনে করতেন, তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি—যাঁর সাম্প্রদায়িক মত বা দল সৃষ্টি করাই প্রধান লক্ষ্য। স্বামী সারদানন্দ স্থির করলেন এই ভ্রান্ত ধারণাও দূর করতে হবে। 'ঐ অলোকসামান্য জীবনের সহিত সনাতন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া কেহই এ পর্যন্ত উহার অনুশীলন করেন নাই।' বলাবাহুল্য স্বামী সারদানন্দ এ-কাজটিও সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

লীলাপ্রসঙ্গ পড়বার সময় প্রথমে মনে হতে পারে, এ-গ্রন্থটিও হ্যাজিওগ্রাফীর মতো শুধুই সন্তজীবনী। ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যের আঁকা সাধকজীবনের চিত্র। আসলে কিন্তু তা নয়। সকলের জীবন যেমন এক ছাঁচে গড়া নয়, তেমনি সকলের জীবনচরিত একই ধরনের হতে হবে এমন কোন কথা নেই। রবীন্দ্রনাথও এই নির্দিষ্ট মাপকাঠির বিরোধিতা করেছেন। [যীশুখ্রীষ্ট ও স্মথচাইল্ড] স্বামী সারদানন্দ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক মননসম্পন্ন এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যও ঠাকুরের জীবন-সংক্রান্ত যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা দূর করা। তাই তীক্ষ্ণধী গবেষকের মন নিয়ে প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ না করে তিনি কোন তথ্য বা কোন সংবাদ গ্রহণ করেননি। বরং জোর দিয়ে বলেছেন, 'লীলাপ্রসঙ্গের কোন কথা আমি না জেনে লিখিনি।' তাঁর এই সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ় উক্তির মধ্যেই গ্রন্থটির প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েছে।

অবশ্য স্বামী সারদানন্দের উক্তির আলোকেই আমরা বুঝতে পারি এই মহান জীবনীগ্রন্থখানির সীমাবদ্ধতা কোথায়। এ-গ্রন্থে বিবৃত সব বিবরণই সত্য কিন্তু পূর্ণ নয়। তিনি নিজেই বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র সম্পর্কে আমরা যতদূর বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি, সমধিক সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিকতর ভাবে উহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। অতএব ঐ দেবচরিত্র বুঝিবার জন্য আমরা নিজ নিজ মন বুদ্ধির প্রয়োগ করিলে উহাতে দূষ্য কিছুই নাই ; কেবল ঠাকুরের চরিত্রের সবটা বুঝিয়া ফেলিয়াছি এ কথা মনে না করিলেই হইল।'

লীলাপ্রসঙ্গের খণ্ডগুলির ধারাবাহিকতা একত্রে পড়লে ক্ষুণ্ণ হয় না, কিন্তু স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থ লেখবার সময় গুরুভাব ও সাধকভাব পূর্বে লিখেছিলেন অর্থাৎ যা গৃহীভক্তদের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়নি সেই অংশ পূর্বে রচনা করেন। পরে তিনি ঠাকুরের বাল্য ও কৈশোরের কথা বর্ণনা করেন। এর ফলে গ্রন্থখানির ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। তবে ঠাকুরের অন্ত্যলীলার বিস্তৃত বিবরণ এ-গ্রন্থে নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের মতোই এ-গ্রন্থও অসম্পূর্ণ।

স্বামী সারদানন্দকে গ্রন্থখানি শেষ করার জন্য অন্যান্য সন্ন্যাসীরা অনুরোধ জানালে তিনি

উত্তর দিয়েছিলেন, 'আর বোধ হয় হবে না। সেরূপ প্রেরণাই পাচ্ছি না। ঠাকুরের যতটুকু ইচ্ছে ছিল করিয়ে নিয়েছেন।' এখানেও নিরাভিমানী সন্ন্যাসীর চারিত্রিক দার্ঢ্য ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের আরেকবার পরিচয় হয়। শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর বরপুত্রের গ্রন্থখানি শুনতে ভালবাসতেন এবং বলতেন, 'শরতের বইয়ে সব ঠিক ঠিক লিখেছে।' তাঁর দেহাবসানের পর স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থ শেষ করবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তাই মনে হয়, শ্রীমার আশীর্বাদ ও আগ্রহই ছিল তাঁর প্রেরণা।

লীলাপ্রসঙ্গের ভাষাশৈলী, উপস্থাপনারীতি, রচনারীতি প্রভৃতি বহুদিক থেকে সাহিত্যিক আলোচনা সম্ভব। আমার মনে হয়, সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থখানিকে নিয়ে বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। স্বল্প অবকাশে এখানে সে সুযোগ নেই। লীলাপ্রসঙ্গের অন্যান্য বহু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এর ভাষা। বিষয় যেখানে জটিল, ভাষাও সেখানে গুরুগম্ভীর। আবার ঠাকুরের লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা অংশে তাঁর ভাষা সহজ সাধুগদ্য। কোথাও ভাষা অস্পষ্ট বা আড়ষ্ট নয়। পড়তে পড়তে মনে হয়, তিনি যেন প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনার বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। ঠাকুর ও শ্রীমার জীবনবৃত্তান্ত ও বহু খুঁটিনাটি ঘটনা তিনি সংগ্রহ করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করেন। আজ পর্যন্ত ঠাকুরের যত জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছে তাদের কোনটির সঙ্গেই লীলাপ্রসঙ্গের তুলনা করা চলে না। বাংলা জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসেও এ-ধরনের গ্রন্থ বিরল।

লীলাপ্রসঙ্গের পরেও ঠাকুরের বহু জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। শুধু বাংলা গ্রন্থেরই সংখ্যা প্রায় দুশো। অবশ্য সব গ্রন্থই যে জীবনী তা নয়, বিভিন্ন দিক থেকে তাঁকে দেখার চেষ্টা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশের সংখ্যাও কম নয়। এখানকার একটি গ্রন্থাগারে অসমিয়া ভাষায় তিনটি, মলয়ালম ভাষায় দশটি, তামিল ভাষায় আটটি, উর্দু ভাষায় একটি, গুজরাটি ভাষায় সাতটি, হিন্দীভাষায় চৌদ্দটি, মারাঠী ভাষায় নটি, ওড়িয়া ভাষায় চারটি, কানাড়ী ভাষায় তেরোটি ও সংস্কৃত ভাষায় ষোলটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী-সংক্রান্ত বইয়ের খোঁজ পাওয়া গেছে। এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারে।

এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে বিদেশী বইয়ের কথা। ইংরেজীতে বহু বই লেখা হয়েছে। ম্যাক্সমূলারের গ্রন্থের কথা আগেই বলেছি, তাঁর গ্রন্থ পাঠ করে স্বামীজী অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেছিলেন। তাঁর পরেই আমরা রোমাঁ রোলাঁর গ্রন্থখানির উল্লেখ করতে পারি। তার আগে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের **Sri Ramakrishna : Face of Silence**-এর নাম করা যায়। ঠিক জীবনী না হলেও সশ্রদ্ধ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ধনগোপাল ঠাকুরের লীলাবসানের বেশ কয়েক বছর পরে ভারতে এসে তাঁর সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি সংগ্রহ করেন। রোমাঁ রোলাঁ ধনগোপালের বই পড়েই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কৌতূহলী হন ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাহায্যে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তখনও লীলাপ্রসঙ্গের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। তিনি শুধু দুটি খণ্ড দেখেছিলেন। ভারতবর্ষে দু-হাজার বছর ধরে যে আধ্যাত্মিক জীবনধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণকে তারই মূর্ত প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন রোমাঁ রোলাঁ। স্বামী জগদানন্দের অনূদিত **Shri Ramakrishna : the Great Master**. 'লীলাপ্রসঙ্গে'র সার্থকতম অনুবাদ। ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংক্রান্ত গ্রন্থের সংখ্যাও

শতাধিক। এ-প্রসঙ্গে ক্রিস্টোফার ইশারউডের গ্রন্থটির উল্লেখ অবশ্যই করব। তবে লেখক নিজেই জানিয়েছেন, এ-গ্রন্থে নতুন কোন তথ্য দেবার চেষ্টা তিনি করেননি, লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃতই তাঁর গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন। ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জাপানী ও চীনা ভাষাতেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী প্রকাশের খবর পাওয়া গেছে। অধিকাংশক্ষেত্রেই লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত অবলম্বনে ঠাকুরের জীবনী রচনা করা হয়েছে। বিদেশীদের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা 'My Master' প্রভাব বিস্তার করেছে বেশি।

বাংলাতেও পরবর্তিকালে যাঁরাই ঠাকুরের জীবনচরিত রচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই উক্ত গ্রন্থদুটিকে আকর হিসেবে ব্যবহার করেছেন। স্বামী তেজসানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী' প্রকৃত-পক্ষে লীলাপ্রসঙ্গের সহজ ও সংক্ষিপ্ত রূপ। সকলের পক্ষে ঐ বিশাল গ্রন্থ পড়া সম্ভব নয় বলেই এ-গ্রন্থ লেখা হয়। মানদাশঙ্কর দাশগুপ্তের 'যুগাবতার রামকৃষ্ণ' পূর্বোক্ত গ্রন্থদুটি অবলম্বনে রচিত একখানি অসামান্য গ্রন্থ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাশ সংকলিত ও সম্পাদিত 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ' জীবনী না হলেও জীবনচরিতের বহু উপাদান সম্বলিত একখানি গ্রন্থ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' চমকপ্রদ ও নাটকীয় ভঙ্গিতে লেখা। তবে এ-গ্রন্থের লেখক ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি। আকর্ষণীয় করবার জন্যেই নীরেন্দ্র গুপ্ত কথামৃত থেকে সংকলন করেছেন 'শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মচরিত।'

ঠাকুরের জীবনী রচনার ধারাটি এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ-ব্যাপারে লেখক ও পাঠকদের আগ্রহ যত বৃদ্ধি পায় ততই ভাল। যদিও এখন ঠাকুরের জীবনীগ্রন্থগুলি দূর থেকে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, গৃহী ভক্ত ও সন্ন্যাসীদের রচনায় অনেক পার্থক্য আছে। সংসারীদের ঝোঁক অলৌকিকত্বের প্রতি, সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য আদর্শ জীবনের প্রতি। শুধু তাই নয়, তাঁরা ঠাকুরকে দেখেওছেন দু-ভাবে—সন্ন্যাসিভক্তরা অন্তরঙ্গভাবে, গৃহীরা বহিরঙ্গরূপে। উভয় ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত পড়ার পর। তবে একটি ক্ষেত্রে উভয়েই এক, উভয়ের কাছেই ঠাকুর অহৈতুকী করুণার আধার, কৃপাসিন্ধু। ভক্তির আলোয় লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত সমান উজ্জ্বল।

জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনীগ্রন্থের একটি পরোক্ষ ভূমিকা আছে। তাঁর জীবনী রচনার ধারাটি অব্যাহত থাকায় পরবর্তিকালে আমরা আরও অন্যান্য বহু সাধকের জীবনের কথা জানতে পেরেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের জীবনচরিত রচনা করেও ঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানেরা বাংলা-সাহিত্যের একটি দুর্বল শাখাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছেন। এ-জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজন আজকের সমাজে ও সাহিত্যে খুব বেশি। ধর্মগ্রন্থ বলে এ-সব জীবনীগ্রন্থকে একপাশে সরিয়ে রাখা যায় না। জাতীয় চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের ত্যাগপূত জীবন, নিষ্কামকর্ম, সত্যনিষ্ঠা ও সেবার মনোভাব আদর্শ হয়ে উঠতে পারে যদি তাঁদের জীবনীগ্রন্থ বৃহত্তর ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পরিবেশন করা যায়।

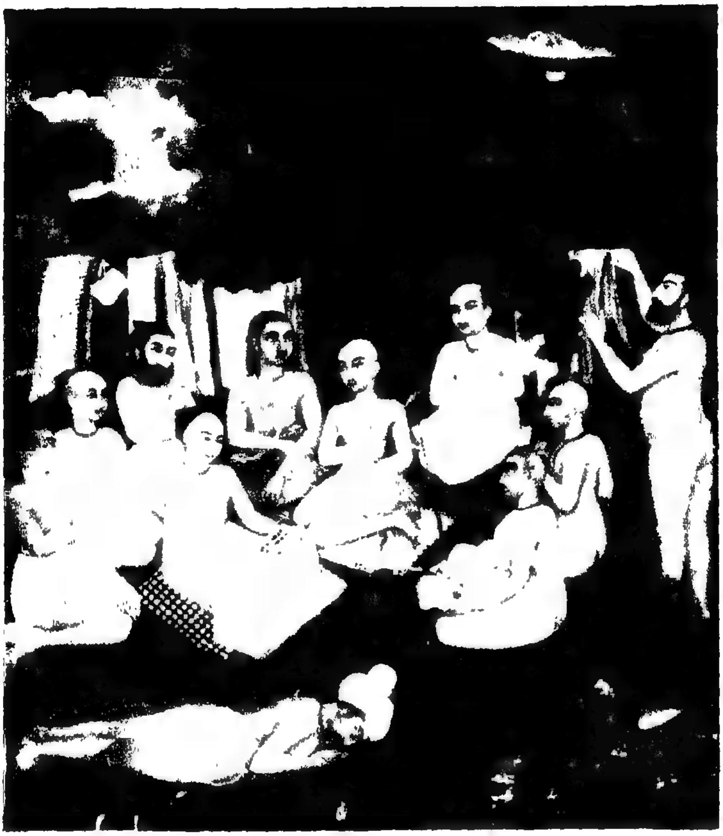

সপারিকর শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামস্থ নরেন্দ্রসরোবর তীরে গদাধর পণ্ডিতের ভাগবত পাঠ শ্রবণ করছেন।

চৈতন্যদেবের দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, সেবক গোবিন্দ, শঙ্কর ও গোপীনাথ আচার্য। চৈতন্যদেবের বামে বাসুদেব সার্বভৌম, স্বরূপ গোস্বামী, রামানন্দ রায়। দণ্ডায়মান—ঠাকুর হরিদাস। ওড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্র সাষ্টাঙ্গ প্রণত।

চার শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এই ঐতিহাসিক চিত্রপট ওড়িষ্যার স্বাধীন নৃপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালেই কোন বিখ্যাত শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর অদর্শনের পরে বিরহাকুল শ্রীনিবাস আচার্যকে এই চিত্রপট প্রতাপরুদ্র কর্তৃক উপলব্ধ হয়। শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর শ্রীরাধামোহন ঠাকুর উক্ত পটখানি তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য মহারাজ নন্দকুমারকে উপহারপ্রদান করেন। মুর্শিদাবাদে মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদ—কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে ঐ চিত্রপটখানি অদ্যাবধি সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। মহারাজা নন্দকুমারের বর্তমান বংশধর (দৌহিত্রধারায়) শ্রীগৌরীশঙ্কর রায়ের অকুণ্ঠ সৌজন্যে মূল পট থেকে রঙীন আলোকচিত্র গৃহীত এবং অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত।

কবিতা

শ্রীমন্-মহাপ্রভু-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রস্য পঞ্চশততম জন্মমহোৎসবে সপ্রণাম-প্রশস্তি-পুষ্পাঞ্জলিঃ

শার্দুল-বিক্রীড়িত-ছন্দসা বিরচিতঃ

দাসানুদাসেন শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্তেন

ডক্টর কালীকিংকর সেনগুপ্ত সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত—খ্যাতকীর্তি প্রবীণ কবি।

যো রাকাশশিশোভিতাঽপি হৃত-ভা-রাত্র্যাম্বতীর্ণো বভৌ।
পৃথ্বীং যঃ কৃতবান্ সুমার্জিততরাং শ্রীনামসংকীর্তনাৎ॥
উৎসাহৈরপি সাধনৈশ্চ নিতরাং ধর্মে চ নিষ্ঠাং দদৌ।
শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রিতো যদি ভবেদ্ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরম্॥১॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবির্ভূত হন পূর্ণচন্দ্রশোভিত পূর্ণিমা রজনীতে, কিন্তু সেদিন চন্দ্রগ্রহণ থাকায় পূর্ণচন্দ্রের কিরণ মলিন দেখাইতেছিল, (এমনও মনে করা যাইতে পারে যে, চৈতন্যচন্দ্রের মুখশোভা চন্দ্রাপেক্ষাও সুন্দর বলিয়া চন্দ্রের মুখ লজ্জায় রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল।) তিনি শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা পাপকলুষিতা এই পৃথিবীকে, সুমার্জিত ও সুপ্রসাধিত করিয়া, উজ্জ্বলতরা করিয়াছিলেন। হীনমনা জনগণের মনে নিত্য নিয়মিত সাধনায় উৎসাহ ও ধর্মে নিষ্ঠা দান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের পদাশ্রিত জন, নিতান্ত পঙ্গু হইলেও তাঁহার মাহাত্ম্যের ও কৃপার বলে সহজেই ভবসাগর পার হইতে পাবে।১।

বীতংসেঽপি বিলে স্বখাত-সলিলে সম্মজ্জতান্ দুষ্কৃতান্।
মাধাসোদরবজ্জনান্ ভবভয়াদ্ যো মুঞ্চতে তৎক্ষণাৎ॥
ভক্ত্যা হীনজনা-স্তথা দ্বিজগণাঃ সাম্যং সুখেনাপ্নুয়ুঃ।
শ্রীচৈতন্য-দয়াং ক্ষমাঞ্চমমতাং বিশ্বং চিরং যাচতাম্॥২॥

সংসারে দুষ্কৃতকারী পাপীগণ স্বখাত-সলিলে ডুবিয়া মরে এবং নিজেদের দুর্বুদ্ধিবশতঃ নিজেদের ফাঁদে জড়াইয়া পড়ে। এইরূপ দুষ্কৃতকারী জগাই মাধাই দুই ভ্রাতাকে ভব ভয় হইতে তিনি মুহূর্তে মুক্তিদান করিতে পারেন।

তাঁহাব প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি উৎপন্ন হইলে দীনহীন পতিত পামর জনগণের সহিত পবিত্র ব্রাহ্মণগণও নিজেদের প্রাধান্য [illegible] শ্রেষ্ঠতা ভুলিয়া আনন্দের সহিত সাম্য ও মৈত্রী বরণ করেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের দয়া, ক্ষমা ও মমতা বিশ্বজগৎ চিরদিন প্রার্থনা করুক।২।

গ্রাম্যান্ নাগরিকাংস্তথেশবিমুখান্ সর্বান্ সমালিঙ্গ্য যো।
নাম্নৈকেনভজনাদনন্যশরণাদ্ ভক্তিং পরাং দত্তবান্॥

প্রেম্না তুষ্যতি কেবলং ন তপসা তীব্রেণ তিগ্মেন স ।
শ্রীচৈতন্য কৃপানিধির্ভবতু নো বন্দারু-বৃন্দারকঃ ॥৩॥

গ্রামবাসী, নগরবাসী—এমন কি ঈশ্বরবিমুখ নাস্তিকগণকেও আলিঙ্গন করিয়া একমাত্র নাম-সংকীর্তন, ভজন ও অনন্য-শরণ হইয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করার শিক্ষাদান করিয়া তিনি তাহাদিগকে বিশুদ্ধাভক্তি দান করিয়াছিলেন,—তিনি বুঝাইয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কেবলমাত্র অকপট প্রেম ভক্তিদ্বারাই পরিতুষ্ট হন,—তীক্ষ্ণ ও তীব্র আত্মপীড়নরূপ উপবাসাদির তপস্যা তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না। করুণা-বরুণালয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঈশ্বরবন্দনাকারী ভক্তবৃন্দের শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র আশ্রয়রূপে বরণীয় হউন । ৩ ।

হিংসাদ্বেষ বশীকৃতাং চ ধরণীং প্রেম্নাবশীকৃচ্চ যো
বিষ্বক্‌সেন-কথাপ্লুতাং চ রসনাং সংকীর্তনে প্রীতবান্ ।
শূদ্রস্ত্রীশ্বপচোঽধমাংশ্চ পতিতাং নাম্নৈব মুক্তিং দদৌ
শ্রীচৈতন্যদয়া স্বভাব-সুলভা পৃথ্বীং সদা পূয়তাং ॥৪॥

হিংসা-দ্বেষ-বশীকৃত ধরণীকে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র প্রেমের দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। তিনি জীবের ভোগ্যরসলুব্ধ রসনাকে বিষ্বক্‌সেন (বিষ্ণু) কথায় পরিপ্লুত করিয়া সংকীর্তন-গানে পরম প্রীতি দান করিয়াছিলেন। শূদ্রস্ত্রী-চণ্ডালাধমপতিত জনগণকেও নামের দ্বারাই মুক্তি দান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের স্বভাব-সুলভ করুণা এই পৃথিবীকে সর্বদা পবিত্র করুক । ৪ ।

ঋদ্ধা-সিদ্ধিপরাং তথা চ পরমাত্মাপ্তিং সমাধৌ স্থিতিং ।
তুচ্ছীকৃত্য সুদুর্লভাং চ নিতরাং কৃষ্ণেরতিং নীতবান্ ॥
কৈবল্যং চ তথা ত্রয়ীষু সুলভাং স্বর্গস্পৃহাং চিচ্ছিদে ।
যৎ-কারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববশাত্তম্ গৌরমেব স্তুমঃ ॥৫॥

যে যোগের দ্বারা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি, এমনকি পরমাত্মাপ্রাপ্তিরূপ সমাধিতে স্থিতিলাভ করা যায়, তাহাকেও তুচ্ছ করিয়া, সেই সুদুর্লভ যোগাপেক্ষাও আনন্দময় শাশ্বত কৃষ্ণপ্রেম তিনি দান করিয়াছিলেন। কৈবল্যমুক্তি এবং বেদাদি যজ্ঞসুলভ স্বর্গভোগলাভ ও লোভের স্পৃহার যিনি মূলচ্ছেদন করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহার করুণাময় কটাক্ষের শক্তিদ্বারা, সেই শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে আমরা স্তুতি ও প্রণতি জানাই । ৫ ।

প্রাগ্‌জাতং কৃতকর্মলভ্য ফলজং পাপং চ তাপত্রয়ী-
সর্পীণাং চ সুতীক্ষ্ণ-জীবনহরাং প্রোৎখাত্য দংষ্ট্রাং মুদা ॥
বিশ্বং যঃ কৃতবান্ শুভঙ্কসুখদং প্রেম্নাপরিপ্লাবিতং
দ্বৈতাদ্বৈত-বিকাশভাব-মিলিতঃ কৃষ্ণোঽস্তু সর্বাশ্রয়ঃ ॥৬॥

পূর্বজন্মকৃতকর্মলভ্য-ফলজাত দুষ্কৃতি ও তজ্জনিত তাপত্রয়ীরূপ সর্পীদের প্রাণঘাতী সুতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা যিনি অতি সহজে ও সানন্দে উৎপাটন করিয়াছিলেন, বিশ্বকে যিনি শুভদ, সুখদ ও প্রেমপ্লাবিত করিয়াছিলেন,—সেই দ্বৈতাদ্বৈত বিকাশ-ভাব মিলিত 'রাধা ভাব-দ্যুতি সুবলিত' 'অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর'-রূপ শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণই সকলের একমাত্র আশ্রয় হউন । ৬ ।

বৃন্দারণ্য-নবং কৃতঞ্চ কৃতবান্ পুরীঞ্চতীর্থোত্তমাং।
বর্ণদ্বেষ-প্রথাং তথাজনিগতাং ভেদাংশ্চ যো ধ্বস্তবান্ ॥
সিন্ধৌবিন্দব এব সৃষ্টমখিলং স্রষ্টুশ্চ ভগ্নাংশকম্।
প্রেমানন্দতনুং রসৈকনিলয়ং চৈতন্যমেবাশ্রয়েৎ ॥৭॥

নবদ্বীপে যিনি নববৃন্দাবন রচনা করিয়াছিলেন এবং পবিত্র শ্রীক্ষেত্র বা পুরীতীর্থকেও যিনি শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলেন,—বর্ণবিদ্বেষপ্রথা ও জন্মগত জাতিভেদ প্রথা যিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন, দ্যাবাপৃথিবী সমন্বিত অখিল সৃষ্ট জগৎ যে স্রষ্টার ভগ্নাংশমাত্র তাহা শ্রুতি-স্মৃতি হইতে অকাট্যযুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন,—সেই প্রেমানন্দতনু রসময় রসিকশেখর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকেই সকলের আশ্রয় করা উচিত ।৭।

ভব্যে বঙ্গশতাব্দ সায়কমিতে আগামিসংবৎসরে।
বৈদেশ্যাদি জনাস্তথাহিজনতাস্তৃপ্যন্তু গৌড়ীয়কাঃ ॥
তন্নাম-স্নপিতা স্তদর্পিতধিয়ঃ ভুঞ্জন্তু সৌখ্যং পরং।
শ্রীচৈতন্যরসান্বিতা চ রমতা ভূম্নাস্তু রম্যাধরা ॥৮॥

আগামী তাঁহার পঞ্চশততম জন্মমহোৎসব বর্ষে বিদেশী ও স্বদেশী জনগণ ও গৌড়ীয় ভক্তগণ সকলেই তৃপ্তিলাভ করুন। তাঁহার নাম-সংকীর্তনে স্নাত হইয়া এবং তাঁহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া পরমানন্দ আস্বাদ করুন। শ্রীচৈতন্যরসাপ্লুতা হইয়া ও তাঁহার পরমরমণীয়া প্রেমভক্তিতে ভূষিতা হইয়া এই ধরণী বহু বহু গুণে রম্যতরা হউক ।৮।

জগজ্জননী সারদা

বেগম সুফিয়া কামাল

শ্রেষ্ঠ কবি—বাংলাদেশ।

মধুর শৈশবকাল কেটেছে খেলায়
কিশোর বেলায়
সুকন্যা। বধূর বেশে হয়েছ গৃহিণী
তার পরে বরণীয়া হয়েছ জননী।
জঠরে ধরনি তুমি আপন সন্তান
লালন করনি, তবু মাতার সম্মান
লভিয়াছ, মহিয়সী। অনাথের একান্ত আশ্রয়
তোমার অঞ্চল তলে স্নেহের প্রচ্ছায়
আতুর, অনাথ জনে মায়াক্ষরা মমতার মধু
সিঞ্চিয়া করেছ ধন্য, হে সাধিকা, সাধকের বধূ,
শুধু বধূ নহ তুমি, অর্ধাঙ্গিনী, জীবনের সাথী
মহত্তের কর্মপথে অন্তর আরতি
প্রদীপের শিখা জ্বালি করি দীপ্যমান
সাধক স্বামীরে তুমি করিয়াছ মহৎ, মহান।
তব নিষ্ঠা, ত্যাগ, সেবা সর্বজন তরে
করুণার বারিধারা প্রাণপাত্র ভরে
বিলায়েছ অকাতরে, অফুরন্ত সে মাঙ্গল্য দানে
করেছ পবিত্র, পূত, অনেক অজ্ঞানে।
নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ সেবা, ফলভারানত তরুসম
সাধক সাধন-পীঠ করি মনোরম
দৃঢ় অবিচল চিত্তে নীরব সাধিকা, সুগৃহিণী
তোমার কর্মের যোগে, তুমি আজ জগত-জননী।

যুবকদের উদ্দেশে

(আন্তর্জাতিক যুব বৎসর স্মরণে)

শ্রীঅরবিন্দ

অনুবাদক : শ্রীকানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

Ideal of Karma Yogin থেকে অনুবাদ। অনুবাদক বিদগ্ধ লেখক ও কবি।

আহ্বান জানাই প্রত্যেক মানুষকে,
বিশেষ করে যুবকদের—
যারা ভারতের ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য জেগে উঠছে···
ভারতের কাজ—
সে যে ভগবানেরই কাজ···
পার্থিব সম্পদের দিক থেকে
তোমার কোন মূল্য নেই—
আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে
সবই তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে···
একমাত্র ভারতবাসীই সব কিছু বিশ্বাস করে,
আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য
সাহসে ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে,
সব পাবার আশায়
সব হারাতে সে প্রস্তুত···
কাজেই, সর্বাগ্রে হয়ে ওঠো ভারতবাসী,
উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত
আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি কর পুনরুদ্ধার···
উদ্ধার কর আর্য চিন্তা···আর্য নিয়মানুবর্তিতা···
আর্য চরিত্র···আর্য জীবন···
উদ্ধার কর বেদান্ত···গীতা···যোগশাস্ত্র···
শুধু মস্তিষ্ক দিয়ে নয়
হৃদয়ানুভূতির আবেগে নয়
জীবন দিয়ে—আপন জীবনে···
এই মহাসত্যের মাঝে বাঁচো—

তাহলেই তুমিও হবে মহৎ বীর্যবান শক্তিশালী
অপরাজিত··· নির্ভীক।
তখন দেখবে জীবন অথবা মৃত্যু
তোমার কাছে আর কোন কিছুই বিভীষিকার নয় ··
তোমার জীবনের অভিধান থেকে
বাধাবিঘ্ন আর অসম্ভব কথাটি হয়ে যাবে অদৃশ্য—
কেননা, আত্মার জাগরণেই মেলে শাশ্বত শক্তি,
বাইরের সাম্রাজ্য জয় করার পূর্বে
জয় করতে হবে আপনাকে—
আপন আন্তর স্বরাজ···
সেখানেই যে মা অধিষ্ঠিতা!
মা অপেক্ষা করছেন পূজা পাবার জন্যে—
আপন সন্তানকে শক্তি দিতে···
মায়ের ওপর বিশ্বাস রেখো
তাঁকে সেবা কর···
তাঁর ইচ্ছার কাছে
আপন ইচ্ছাকে দাও বলিদান···
তোমার ক্ষুদ্র অহংকার
দেশের বৃহত্তর অহং-এ গলে মিশে এক হয়ে যাক
তোমার স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ
মানবজাতির কল্যাণে হোক নিবেদিত··
তোমারই মাঝে উদ্ধার কর
সেই মহাশক্তির উৎসকে···
তাহলেই এ জীবনে তোমার সব মিলে যাবে—
সামাজিক স্বচ্ছল জীবন···
মস্তিষ্কের প্রখর বোধশক্তি···
রাজনৈতিক স্বাধীনতা···
চিন্তার জগতে প্রভুত্ব···
জগতে নেতৃত্বের অধিকার···

অপার কামনাসিন্ধুজলে

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভূতপূর্ব
রবীন্দ্র অধ্যাপক।

সময় শ্রাবণ। বিশ্বে অফুরন্ত উপর্বরণ।
কারো কারো কহতব্য—কাব্য আর ভালই লাগে না।
কারণ, আজকাল যতো বিষ্টি হোক্, বন্যা হোক্,—তবু
হাঁপাতে হাঁপাতে নানা টেন্‌শনে শুধু ছুটোছুটি।
সময় উড়ছে যেন,—ধরাই যায় না তার ঝুঁটি।

সুন্দরের জন্যে টান বুকের তন্ত্রীতে বাজে বটে,
কোনো কাহিনীতে কিন্তু অফুরন্ত আনন্দের দোলা
কে আর পাচ্ছে আজ? সূচনার পরেই বিকার।
যেমন কৃতিত্ব খোঁজা ঘটে বহু ঝানু প্রবীণের,
তেমন সৌভাগ্য নেই শাদামাটা ভঙ্গুর মনের।

কবিতার সত্য তবু পুরোপুরি বানানো অলীক—
একথা বলেন যাঁরা, তাঁরাও বেদনা পেতে চান,
এবং বাদল দিনে হাতে পেলে প্রথম কদম
তাঁরাও বিমুখ নন—হলপ করে তা বলা যায়।
অপার কামনাসিন্ধুজলে সকলেই নাজেহাল।

শান্ত হওয়া সুকঠিন। ভোগবতী পার হয়ে, তবে
দেখা যায় বিশ্বময়ী প্রলয়ে সৃজনে সুরঙ্গিলা।
ইচ্ছের চাবুক যেন পাহাড়ের দুরন্ত নদীরা—
পাথর ভাঙ্‌তে-ভাঙ্‌তে অগাধ বালির স্তূপ গড়ে;
সাগর আছড়ায় যাতে অন্তহীন অর্থহীন স্বরে।

নির্ভার

শ্রীসুনীল বসু

খ্যাতনামা কবি, প্রবীণ উপ-সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা।

যদি তাঁর কাছে যেতে চাও
সহজ হয়ে নাও
আরও আরও সহজ সরল
সবুজ পাখির মতন, একটি ঘাসের শিসের মত

যদি যেতে চাও তুমি প্রভুর নিকটে
আয়োজন কমাও, এতো ভার
এতো সব কাণ্ড-কারখানা, কোনো
প্রয়োজন নেই, নির্জন নির্ভার হও

যেদিন অচেনা এই গ্রহে এসেছিলে
সেই পুত প্রভাতে অথবা স্বর্গীয় রাতে
হে প্রিয় তোমার কি ছিল
ছিল শুধু স্পন্দন, ছিল শুধু চিৎকার

অর্থাৎ ছোট্ট একটি দীপশিখা
তার একটু জ্বলা, সেইটকু
ক্ষণিক পরমায়ু, আর কিছু নয়
ক্ষণিক ফুটে ওঠা

সেই ফোটা ফুল নিয়ে
চলো যাই, চলো যাই—
তাঁর পায়ে তুমি-আমি হই অর্ঘ
জীবনের সেই সার্থকতা

যদি যেতে চাও ঈশ্বরের দিব্য দেশে
বাহুল্য দূর করো, আয়োজন দূর করো
থরো থরো হও পরম বিশ্বাসে আর সহজে
ভক্তিতে, হে বন্ধু হও লঘু পরম নির্ভার

কথামৃত

শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়

যশস্বী কবি—রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব কালচারে সংযুক্ত।

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ।
সে কথা বলতে পারে,
মনের ভাব প্রকাশ করে আনন্দ পায়।
সে কথা আবার কখনও অমৃত হয়ে যায়
যদি তা অবতারপুরুষের হয়
যখন জীবন মরুভূমির মতো শুষ্ক হয়ে যায়,
ফল্গুধারার মতো সে কথা জীবনে স্নিগ্ধতা
এনে দেয়—
জীবনের মানে খুঁজে পায়।
আমরা সাধারণ মানুষ
রোজ কত কথা বলি,
হিসেব করলে পৃথিবীর নিঃস্ব হয়ে
যাবার কথা ছিল
কিন্তু পৃথিবী নিঃস্ব হয় না।
এক-একটা ভাব মহাসমুদ্র হয়ে যায়,
মানুষ সেই মহাসমুদ্রে অবগাহন করে
মনুষ্যত্বের সন্ধান পায়।
এক-একটা ছোট গল্প মহাভারত হয়ে যায়
যখন তা অবতারপুরুষেরা বলেন।
দর্শনের যত কঠিন তত্ত্ব,
বেদ-বেদান্ত, ন্যায়-বৈশেষিক
সব সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়।
আম খেতে এসে পাতা গোনার
দরকার কী!
আম খেয়ে যাও।
জীবন একটা স্বপ্ন ?
যদি স্বপ্নই হয় তবে অবাস্তব।
কিন্তু জীবন যে ভীষণভাবে সত্য।
সব সমস্যার সমাধান—
জগত ও ব্রহ্ম—দুইই সত্য।
আমরা ক্ষুদ্র সত্য থেকে বৃহত্তর সত্যে যাই।
সব ধর্মই এক
যত মত তত পথ।
মন্ত্র একটাই—শিবজ্ঞানে জীব সেবা।
সব বিরোধের অবসান—যদি বুঝে
নিতে পার, তিনিই সব হয়েছেন।
ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, চিরন্তন ;
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তারই প্রকাশ।
আমি কালীর ভক্ত—ব্রহ্ম বুঝি না।
তাতে কী এসে গেল ?
জানো না, কালী ও ব্রহ্ম অভেদ!
আমি মন প্রাণ দিয়ে কেবল সংসার
করে যাচ্ছি
তোমায় ডাকব কেমন করে ?
কাজের মধ্যে—
কাজ যাই কর আমার উদ্দেশ্যে কর
দেখবে আমাকেই পেয়ে গেছ।
সংসারে থাকবে, সব কাজ করবে
কিন্তু মনটা ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে দিও।
জীবনের কামনা বাসনা ?
এরাও থাকবেই, এদের হাত থেকে
পরিত্রাণ নেই।
কেবল মোড় ঘুরিয়ে দাও।
পূবে যতই এগোবে
পশ্চিম ততই সরে যাবে দূরে।
শুধু এগিয়ে যাও।
কাঠুরিয়ার মতো এগোতে এগোতে
একদিন হীরকখনির সন্ধান পাবে।
সবই কথা—কিন্তু অমৃতমাখা।
আশ্বাসের কথা, জীবনের বাঁচবার কথা।
কথা যখন অমৃত হয়ে যায়
'কথামৃতের' সৃষ্টি হয়।

অর্চনা

শ্রীমতী হিমানী রায়

সুলেখিকা ও কবি।

যবে তুমি আসিবে সমুখে,
কি দিয়ে পূজিব বল ও রাঙ্গা চরণ ;
নাহি কোন উপচার পূজা আয়োজন।
নিভৃত অন্তর কোণে পাতিব আসন,
আঁখিবারি দিয়া নাথ ধোয়াব চরণ।
ভকতি চন্দন লয়ে সাজাব তোমায়,
চিন্তা মম অর্ঘ্য রূপে দিব তব পায়।
ধূপ দীপ জ্বালি দিব কামনা বাসনা,
মন পুষ্পাঞ্জলি দিয়া করিব অর্চনা।
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য হবে জয়ধ্বনি তব,
প্রেমের পশরা লয়ে নৈবেদ্য সাজাব।
আরতি প্রদীপ হবে এ দুটি নয়ন,
চিত্তপটে তব রূপ হেরি অনুক্ষণ।
কহি এ মিনতি নাথ করি জোড়কর,
যেভাবে যেথায় রাখো থেকো না অন্তর।
কণামাত্র কৃপা তব যদি মিলে যায়
জীবন সার্থক মম আসি এ ধরায়।

প্রার্থনা

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

প্রতিষ্ঠিত কবি।

বড় বিস্ময় লাগে—
আছো কি না আছো এই ভেবে মনে বড় সংশয় জাগে !
ঘরে ঘরে আজ ঘুরছে রাবণ, দুর্জয় যত দুর্যোধন—
গ্রামে ও গঞ্জে সহরে নগরে সদর্পে করে আস্ফালন।
কোথায় কৃষ্ণা—অনল-কন্যা—অগ্নিবন্যা আনগো তুমি,
নারীমাংসের লুব্ধ শকুন রয়েছে ভারতে ভাগাড়-ভূমি।
দুঃশাসনের পদভারে কাঁপে আজি এ নিখিল বসুন্ধরা,
বল কত দেরি মহাপ্রলয়ের—আর দেরি নয়—এসো গো ত্বরা।
সহেনা আঁধার প্রলয়শঙ্খ বাজাও এবার জগন্নাথ ;
উঠুক সূর্য যুগ-অবসানে কাটুক কুটিল গভীর রাত।

অশ্রুত-অদৃষ্টযোগ

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

বিশিষ্ট কবি ও লেখক—নেহরু পুরস্কারে সম্মানিত।

দিগন্ত-সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টা বাজে বহুদূরে,
ক্ষীণ দীপালোক ভেসে যায়—
মিশে যায় নক্ষত্র-আকাশে।
তুমি সেই ধ্বনি শুনতে শুনতে
আলোকে মিলাও।

স্তব্ধ বায়ু থমথমে আকাশ.
পাতাটি নড়ে না,
পাখিরা বাসায় ফিরে গেছে—
সর্বত্র প্রতীক্ষা এক কিসের উদ্দেশে।
তুমি অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হও ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

দুরন্ত আঁধার ভেঙে জেগে ওঠে জ্যোতির গোলক,
সুপ্তি ভেঙে বসুন্ধরা গায়ে মাখে আলোর পরাগ ;
তোমারি প্রেমেতে দোলে হীনবীর্য কালের দোলক
আস্তিক্যে উর্বর হয় আমাদের উন্মত্ত ভূভাগ।

তোমার মেধাবী মুখে বিচ্ছুরিত অমৃতের স্বেদ,
শান্তির স্তোত্রে তোমার ললিত আহ্বান ;
তোমার চেতনা ভাঙে জীবিকার কুটিল প্রভেদ.
দুঃখীর কুটীর যেন হয়ে যায় সাজানো বাগান।

যেসব জীবন ছিল অবিশ্বাসীর নির্মম পাথর,
নাস্তিক্যে আবিদ্ধ বুকে যন্ত্রণার দারুণ শায়ক,
একে একে ধসে পড়ে ছলনার নকল নায়ক ;
পাথর চৌচির হয়, জেগে ওঠে মমতার স্বর।

আকাশের নীলাঞ্জনে তুমি যেন সোনালি ঈগল।
ডানার আওয়াজে কাঁপে মর্ত্যলোকে বন্দীর দুয়ার,
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় লাঞ্ছিতের বেদনা-শৃঙ্খল,
আদিগন্ত অন্ধকারে ঢেউ তোলে আলোর জোয়ার।

সে-নির্জনে

শ্রীশান্তশীল দাশ

সুখ্যাত কবি ও গীতিকার।

কারুর কথা আনবো না আর মনে।
তুমিই শুধু থাকবে অমার সনে।
দেখবো তোমার প্রসন্ন মুখ,
জুড়িয়ে যাবে আমার এ বুক ;
তোমারই গান গাইবো সে-নির্জনে।

কত-না জন আসে আমার ঘরে,
কত কথায় আমার এ ঘর ভরে।
তার মাঝে নেই প্রাণের পরশ,
চিত্ত আমার হয় না সরস ;
তোমায় ডাকি সেই বেদনার ক্ষণে।

সেইখানেতে তোমার আসন পাতি,
দেব বলে তোমায় মালা গাঁথি।
মালাখানি তোমার গলে
দুলবে আমার চোখের জলে :
সফল হবে তোমার পরশনে।

দশমহাবিদ্যা

শ্রীমতী সাধনা মুখোপাধ্যায়

আনন্দবাজার পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট কবি ও লেখিকা।

বিশাল পক্ষ তোমার হাত দুটো
আমার বুকটাকে ধরে রাখো
বিশাল কক্ষ তোমার ক্রোড়ভূমি
আমার দেহটিকে ধরে থাকো
তুমি কি ধূমাবতী নাকি হে কালী তারা
নাকি মাতঙ্গী ভৈরবী
কনক-কন্দুক নিয়ে যে খেলা কর
দু-হাতে দুইটি শশী রবি
ভুবন-ঈশ্বরী, ছিন্নমস্তা
নাকি হে কমলা ষোড়শী যে
হৃদয়-মৎস্য করে যে ছটফট্
তুমি আকর্ষণ বঁড়শি যে
বগলারূপিণী হে দশবিদ্যা
দ্বিভুজা নাকি হে দশভুজা
ভক্তি-হিম জমে বরফ যদি হও
শক্তি দিয়ে আমি করি পুজা

মিনতি

শ্রীপ্রদোষকুমার পাল

লেখক ও কবি,—কথাসাহিত্য পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট।

আজীবন ভরে মন যে আকুল
তোমার চরণ ধরিতে
সারা দিনমান তাই তো ব্যাকুল
সেই সাধটুকু লভিতে ॥
তোমারই নামেতে তোমারই ধ্যানেতে
আছে যে সকল সুখ
তোমারে ভুলিয়া থাকি যে মোহেতে
পাই তাই এত দুখ ॥
সংসারে মোরা মায়াবন্ধনে
তোমারে ভুলিয়া থাকি
বেলা শেষে তাই ভাবি নির্জনে
তোমায় ডাকা যে বাকি ॥
তখন দেখি যে সময় নাইরে
দিন হল অবসান
ভগ্ন হৃদয়ে সখেদে তাইরে
করি তব গুণগান ॥
মিনতি আমার রাখিও হে প্রভু
দয়া করো তুমি সবে
তোমারে ভুলিয়া না রহি কভু
দুখে ভরা এই ভবে ॥

অনাম-অরূপ

স্বামী নিরাময়ানন্দ

'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি'—উদ্বোধন কার্যালয়ের লোকান্তরিত অধ্যক্ষ। 'বৈভব' ছদ্মনামে পরিচিত সুপ্রসিদ্ধ কবি।

কত নামে ডাকব তোমায়
বুঝতে পারি না—
অত নামে ডেকেও তবু
আশা যে পূরে না!
ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
তোমারি নাম উচ্চারণে
বেড়াই একা জীবনবনে—
তবু, মন যে ভরে না।
একটি নামে ডেকে তোমায়
আশা পূরে না—
একটি রূপে দেখে তোমায়
মনে ধরে না—
সকল নামে সকল রূপে
দাও গো ধরা চুপে চুপে—
ভালবাসি প্রেম-স্বরূপে
প্রাণ তো মরে না—
কার মাঝে যে কে যায় মিশে
বুঝতে পারি না।

সৃষ্টি-পত্তন

শ্রীসূর্যকুমার ভূঞা

পদ্মশ্রী-ভূষিত প্রখ্যাত অসমীয়া কবি—গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। কবিতাটি মূল অসমীয়া থেকে অনুবাদ করেছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী।

সেই প্রলয়ের দিন—
ওগো প্রভু তুমি হাতে তুলে নিলে
তোমার রুদ্র-বীণ।
আনন্দময় ছিল না বিন্দু
ছিল নির্জন অরুণ-ইন্দু
দিগ্‌দিগন্তে সমুদ্ভাসিল
ভীষণ উদ্দীপনা
যে দিনেতে তুমি হাতে তুলে নিলে
তোমার রুদ্র-বীণা।

চন্দ্র সে গেল এড়িয়ে কক্ষ,
শূন্যে মিলাল মালা-জ্যোতিষ্ক
সেদিন দীপ্তিহীনা
হে প্রভু! যেদিন হাতে তুলে নিলে
তোমার রুদ্র-বীণা।
আকাশটি হল অভ্র-আবৃত
মাটির ঠিকানা হারালো ত্বরিত
দিগন্তব্যাপী অথিরা সৃষ্টি
প্রকম্পে জল-লীনা,
তাহার উপরে উড়িল বিধাতা
তোমার রুদ্র-বীণা।

সেই তমসায় উদিল পুনঃ
লক্ষ লক্ষ তারা,
সেই বিনষ্টি করিল সৃষ্টি
অশেষ পুষ্প ধারা।
সুমুঞ্জরিল চিন্তালতিকা
নবীন সুরের নবীন কথিকা
এড়িয়ে বিশ্ব পরিল হিয়ায়
নতুন সৃষ্টি-কণা,
সেইদিন তুমি নামিয়ে রাখলে
তোমার রুদ্র-বীণা।

ধন্য-শিল্পী

শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যসেবিকা--কবি।

মাটি দিয়ে তোমা গ’ড়েছি বলিয়ে মাটির নও মা তুমি—
আমার হিয়ার সুষমা রয়েছে তোমার মূর্তি চুমি’।
আননে তোমার যে-সুধার ধাবা, নয়নে তোমার আলো—
তার সবখানি আমারই সৃষ্টি, আমাকে বেসেছ ভালো !
মোর তবে তোর স্নেহ-ভাণ্ডার লুকান রয়েছে জানি—
তারই সবটুক ঢালিয়ে দিয়েছি আমার হৃদয় ছানি !
আমার শিল্প, আমার সাধনা, কল্পনা মোর যতো—
তোমারে সৃজিতে হয়েছে সফল, মাটি হ’লো মা-র মতো !
সার্থক হলো সে-মাটির স্তূপ, তোব লাবণ্য ছানি—
সার্থক মাগো ! সন্তান আমি, আমাব জননী তুমি !
তিল তিল করে আমারে সৃজিলে, নেই যে তোমার সীমা—
আমার কল্প-সীমায় বেঁধেছি, তোমারে হে অনুপমা !
ভেঙে গড়ি, গড়ে ভাঙি, তবু তৃপ্তি নেই যে মনে—
কোন্‌খানে যেন, কম পড়ে গেল—বসে ভাবি নিরজনে !
যা পেয়েছি, তার তুলনা যে নেই, আর কত পার দিতে—
এ ভাঙা-গড়ার শেষ নেই, তাই সুখ যে হলো না চিতে !
অপটুতা মোর কবেছ যে-দূর, হেসে অপরূপ হাসি—
জননী আমার, শিল্পী আমার, তুমি সুর, আমি বাঁশি !
আপন করুণা-মাধুরী মিশায়ে ঢেকে দাও যত ভুল,
তোমারে সৃজিতে স্রষ্টা যে তাই পায় নাকো খুঁজে কূল !
আমার তুলিতে তোমার স্নেহের ধাবা বহে রঙ্ হয়ে—
মাতৃ-মূর্তি আপনি বিকাশে, স্রষ্টা—সে রয় চেয়ে !
কল্পনা তার সযতনে শুধু মাকে রেখেছিল ধরে’—
তুলিখানি তবু খুঁজেছে বৃথাই রূপখনি অগোচরে !
করুণা রাশির একটি কণায় আলো হলো ধরাতল,
মায়ের মুখানি উঠিল ফুটিয়ে যেন ফোটা শতদল !
অবাক্ শিল্পী ! হেরে সে মহিমা, লুটায় ও পদতলে
দু-নয়নে তার ধারা বয়ে যায়, অস্ফুটে ‘মা’ ! ‘মা’ ! বলে !

আমি সন্তান ! জননী আমার, আমারে সৃজিলে তুমি—
তোমারে গড়িতে সব রঙ্ লয়ে, তাই পরাজিত আমি !
তোমার করুণা মোর তুলিকায় যে-রঙ্ দিয়েছে ঢেলে—
তারই মহিমায় চিন্ময়ী তুমি, মৃন্ময়ী হয়ে এলে !
অরূপে তোমার মহিমা অপার, স্বরূপে জননী তুমি—
সন্তান-বুকে তাই মা সাধের জন্ম নিলে গো তুমি !
মৃন্ময়ী তুমি আবাহন পরে, বিসর্জনের শেষে—
আমার হৃদয়ে চিন্ময়ী হবে, এসে জননীর বেশে !
মূর্তি তোমার শিল্পী-মহিমা করুক্ প্রচার যত—
মর্মে আমার গাঁথা হয়ে রবে তুমি জ্যোতি শাশ্বত !
করুণা তোমার মাটিময় দেহে এনেছে অসীম প্রাণ—
অরূপ মহিমা স্বরূপে প্রকাশি' দিয়েছ স্নেহের দান !
তোমারই মাঝারে লভেছি জনম, তোমাতে কর গো লীন—
তব অপরূপ আলোকে আমার রূপ করো সমাসীন !

পঞ্চবটী

শ্রীকালীসাধন ঘোষ

লেখক ও কবি।

…বকুলতলার আরও কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া পরমহংসদেব অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং ভক্তসঙ্গে এখানে সর্বদা পাদচারণ করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখন কখন উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি…ঠাকুর নিজ তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন।…আশে-পাশে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী আবার পঞ্চমুখী জবা, চীন জাতীয় জবা।…
—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ

ধরিত্রীর সীমাপ্রান্তে কুসুমিত শ্যামল বনানী,
ছায়ান্বিতা কৃষ্ণচূড়া। আরক্তিম আবাহন দূর-দূরান্তরে।
মৌসুমী বাতাস দিল বকুলের দীর্ঘশ্বাস আনি,
ঘনশ্যাম সমারোহে বর্ষা নামে প্রসন্ন অন্তরে।
করবী, মল্লিকা যূথী, গন্ধরাজ বন্দিত কানন,
নিসর্গের মহিমায় সুভাস্বর পঞ্চবটী-তল।
জন্মলভে বসুন্ধরা, হেরি পরব্রহ্মের আনন।
বিভাবরী শব্দহীন। অন্ধকার নিবিড় কুন্তল।

অন্তহীন ছায়াপথে নক্ষত্রের নীরব ভাষণে
কাহার বন্দনা গীতি। হৃদয়ের মহামৌন-ধ্বনি।
শুভ মাতৃমন্ত্রের উদ্গাতা ধ্যানমগ্ন। পঞ্চবটী ছায়ে।
তোমার অমৃতবাণী শান্ত ধীর শুদ্ধ প্রবচনে
সরল শিশুর কণ্ঠ বিনন্দিত সে বিশ্বজননী।

মন্দির ও দেউল

ডক্টর শান্তিকুমার ঘোষ

(বিশিষ্ট লেখক ও কবি। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান।)

পাহাড়-চূড়ায় মন্দির ঃ
পাথরের ধাপ ভেঙে পৌছনো দেবতার সমুখে।
নিচে অশ্রুমতী নদী, যার সরস সবুজ দু-পাশে
গড়ে উঠেছে জনপদ—
জনসংঘ অধিকার করেছে নির্জনতাকে।
আমার ইচ্ছা ঢেউ তোলে নারকেল গাছ-ঘেরা ফসল খেতে,
ফোটায় শেষ গোলাপ বন্ধ্যা জমিতে।
দেবতা দেবেন স্থিতি, অবসর
উপচে-ওঠা ভালোবাসা হৃদয়ে-হৃদয়ে

*

ঘুমের ভিতর থেকে জেগে বইছে নদী
এই সকালে কুয়াশায় ঢেকে ফেলছে সাঁকো
এক-একটা বজরা বয়ে নিয়ে যায় শস্যভার বন্দর অবধি
সোনার মুহূর্তটিকে তুমি পারো যদি ধরে রাখো
আমি তাকাতে পারি না জলের দিকে—কে ধরবে
স্রোতে ভেসে-যাওয়া মালা
গোলাপ-বাগের বুকের উপর শুধু বয়ে যাচ্ছে সুবাতাস
বুলবুলির স্পষ্ট স্বর পুষ্পিত ডালে ;   কাঠবিড়ালী দ্যাখে
গাছের ছায়ায় রামসীতার পালা
মানুষ গড়লো করজোড়ের মতো দেউল,
যা ছুঁতে চাইছে হৃদয়াকাশ

বিজয়ী

ডক্টর নূপুর গুপ্ত

সাহিত্যসেবিকা ও কবি—কলিকাতা যোগমায়া দেবী কলেজের ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপিকা।

মৃত্যুকে শ্রদ্ধা কর,
সে এসে দাঁড়ালে বিনীত হয়ে মাথা নামাও।
জীবন এক অখণ্ড লড়াই সন্দেহ নেই,
কিন্তু সে দিতে পারে না বিজেতার গৌরব.
মৃত্যুই জীবনকে দেয় বিজয়ীর মুকুট।
জীবনের বড় পক্ষপাতিত্ব,
অনেক ভেবে, বিচার করে সে অলঙ্কার দেয়
প্রাপকের হাতে—
কাউকে শান্তি. কাউকে চিরজ্বালা,
কেউ পায় লক্ষ্মীর ঝাঁপির উপচে পড়া ধন
কেউ হাহাকার করে দু-মুঠো চালের জন্যে ;
ভরা আঁচলে আবার ঝরে নতুন উপহার
—হয়তো জীবনের খেয়াল থাকে না
কাকে কখন কি দেওয়া উচিত।
মৃত্যু কিন্তু অবিচল তার নির্বিচার আশীর্বাদ বিতরণে।
নিজের দান সে মাপে না জীবনের মাপকাঠিতে।
যুদ্ধের শেষে ক্লান্ত সৈনিকের জন্য
শান্তির প্রলেপ নিয়ে অপেক্ষা করে
চির আশ্রয়ের আশ্বাস নিয়ে।
তাই মৃত্যু নিরপেক্ষ দাতা, অবিচল দর্শনে.
সমদৃষ্টি তার মূল্যায়নে।
জীবনের চেয়ে সে মহান, নির্ভুলভাবে সার্থক।
মৃত্যু এলে তাকে শ্রদ্ধা জানাও,
শোকে বিনত হয়ে, নীরব অভিবাদনে॥

উদ্বোধনে মা

ব্রহ্মচারিণী অজিতা

শিক্ষাব্রতিনী লেখিকা ও কবি।

কলকোলাহলময় কর্মমুখর
চঞ্চল এ মহানগরী—রাজপথে জনস্রোত
বহে অবিরাম, জানে না চলেছে কেন?
সমাপিবে কোন কর্ম? উদ্দেশ্য বা কিবা
জীবনের? নাহি জানে কভু, অশ্রান্ত চরণে
তবু মিছে ছুটে চলা, কোথা? কত দূর?
কে দিবে উত্তর? নাহি তিলেক বিরাম,
নাহিক বিশ্রাম, পলকের তরে নাহি শান্তি
বৃথা যাত্রা লক্ষ্যহীন—শুধু গতি আর গতি!
সহসা থামিল পান্থ। কোন
যাদুমন্ত্রবলে বুঝি অন্ধ লভেছে দিঠি,
হেরিয়া সুমুখে ওই শান্তির আলয়
স্তব্ধ, বাক্যহারা, মরুভূ-মাঝারে মরূদ্যান!
লবণাম্বুরাশি মাঝে এ যে অমৃত-নির্ঝর!
শান্ত এবে শ্রান্ত চিত—জুড়ায় জীবন,
মাতৃস্নেহ সুধাস্বাদে তৃপ্ত তপ্ত প্রাণ।
ক্ষুদ্রায়তন সে নিলয়,—
নাই নয়ননন্দন কারু-কাজের চমৎকারিত্ব,
অথবা বিশাল প্রাসাদের বিপুলত্বের গৌরব,
স্থাপত্যে কি ভাস্কর্যেও নয় খ্যাতি
বিশ্বজোড়া,
অনুপস্থিত—বৈভবের গর্বিত জলুস।
নিরাভরণ, অনাড়ম্বর—তবু কী অপরূপ
মহিমায় মাখা! মহীতলে মেলে না
উপমা,
'ত্রিদিব-অধিক' এ যে 'মহতো মহীয়ান'
পরশিয়া মাতৃ-পদ-রজ-দিব্য অমৃত সম্পদ।

ত্যাগের দিব্যদ্যুতি ঝলকে
গৈরিক, পুষ্পচন্দনের পবিত্র সৌরভ,
ঘণ্টার ধীর-উদাত্ত ধ্বনি, সৌগন্ধ ধূপের,
কর্মব্যস্ত সন্ন্যাসীর প্রশান্ত আনন,—কক্ষ
প্রান্তে
পর্যঙ্কে আসীন অপরূপা মাতৃমূর্তিখানি
'প্রতিমা স্নেহের'। দিব্য এ আলয়ে সদা
বিরাজেন জননী আমার। নহে 'দশভুজা'
'দশপ্রহরণধারিণী' কিংবা 'দেবী অষ্টভুজা'।
নহে 'চতুর্ভুজা, ত্রিনয়নী, ত্রিদিববাসিনী'।
দ্বিভুজা মানবী—মাতা মম, মাতা সবাকার,
দুখানি নয়নে ক্ষরে স্নেহসুধা অনিবার।
অতুলন প্রেমের পাথার।
বুঝি 'করুণা' ধরিয়া কায় এসেছে ধরায়,
চরণকমলতলে নীরবে প্রণত নিত্য
তনয়-তনয়া 'মা'র—প্রাণের আকুতি শত,
আর্তি অন্তরের সকরুণ,—নিবেদিছে সবে।
'মা' বিনে বুঝিবে কেবা ব্যথা সন্তানের,
কে দিবে সান্ত্বন তারে,—হরিয়া সন্তাপ?
জগতের মাতা সবাকার।
প্রসাদে যাহার জাগে চিত্তে আনন্দ-অপার,
বাঞ্ছিত কৃপাকণা যাঁর, তপঃ সুকঠোর
যুগ যুগ ধরি' করে যোগিঋষিবর,
বারেক প্রণমি' পদে ধন্য পুর-নর,
পাবন সে অমৃতনাম—'মা সারদামণি'।
'উদ্বোধন' আলো করি রাজেন জননী
'মাতৃপীঠ'—পুণ্যতীর্থে নমি সদা নমি।

রামায়ণীঃ তৃতীয়-চতুর্থ সর্গ

(রামায়ণ রচনা—কুশ ও লবের রামায়ণ গান)

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

অসিতকুমার একাধারে শিল্পী, সাহিত্যিক ও কবি। তাঁর সাহিত্য ও কবি-প্রতিভা বিকাশের মূলেও ছিল রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ ও প্রেরণা। সমগ্র বাল্মীকি-রামায়ণের ভাবাবলম্বনে পদ্যানুবাদ 'রামায়ণী' অসিতকুমারের অক্ষয় কীর্তি। অপ্রকাশিত 'রামায়ণী'র একটি অধ্যায় (তৃতীয়-চতুর্থ সর্গ) এখানে মুদ্রিত হল। শিল্পী-কন্যা শ্রীমতী অতসী বড়ুয়ার সৌজন্যে 'রামায়ণী'র পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে।

ধীমান বাল্মীকি
ধর্মার্থ সহিত হিত শ্রীরামচরিত
নারদ ঋষির কাছে শুনিয়া সমগ্র
সমধিক জানিবারে
বিধিমত বসি দর্ভাসনে করি আচমন
রহি কৃতাঞ্জলিপুটে হইলেন যোগমগ্ন
অনন্তর ধ্যানে
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রজাবর্গসহ
ভার্যাদের সাথে
দশরথ রাজনের হাস্য বাক্য, গতি সর্ব ;
লক্ষ্মণ সীতার সনে বন-পর্যটনে
সত্যসন্ধ রামের বীক্ষণ
হেরিলেন ধর্মাত্মা বাল্মীকি
'করতলগত যেন আমলক ফল'।
যোগপথাশ্রিত হয়ে হরিয়া সকল
সাগররত্নের মতো ধর্মার্থ কামার্থগুণে
অতি সারবান সর্বশ্রুতিমনোহর
রচিলেন মহামতি
রঘুবংশ শ্রীরামচরিত নারদবর্ণিত
শুভ সন্দর্ভের সার।

মহামুনি গ্রন্থে তাঁর
রাম-লব্ধ রাজ্য আর রাবণ সংহার,
সীতার উদ্ধার, বহু শক্তি পরিচয়
লোকনিষ্ঠা, ক্ষমা, সাম্য সকল বিষয়
বিচিত্র পদেতে রচি
চতুর্বিংশ সহস্র শ্লোকেতে
পঞ্চশত সর্গভাগে
ছয় কাণ্ডে রচি
আরো সপ্তকাণ্ডে তাহা করিয়া সমাপ্ত
গাঁথিলেন সপ্তমণি সমুজ্জ্বল হার।
গ্রন্থশেষে উপজিল
চিন্তা শুধু তাঁর
হবে ইহা কিরূপে প্রচার
জগতের হিত-যোগ্য দিব্য সমাচার ?
হেনকালে মুনিবেশী
তরুণ কিশোর দুটি আশ্রম নিবাসী
কুশীলব ভ্রাতা আসি
বাল্মীকিরে করেন প্রণাম।
মেধাবী, বেদজ্ঞ, বুদ্ধি অতি সুমার্জিত
স্বরসংযুক্ত দেখিয়া বাল্মীকি
করুণানিলয় মুনি ত্রিকালজ্ঞ ধীর
সাদরে উভয়ে করিয়া গ্রহণ
রাবণ-নিধন আর রামের চরিত
স্বরচিত রামায়ণ করালেন গীত।
শিক্ষা লভি দুটি ভ্রাতা
পাঠে, গানে সুমধুর
দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত তানে
ষড়জ, ঋষভ আদি সপ্তস্বর দানে
তন্ত্রী বাদ্যে লয়ে সমে গীতিযোগ্য যাহা

কৃতান্ত রাবণ বধ
শ্রীরামের জয়
শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক,
বীর, আদি রসাত্মক গাহিলেন কাব্য মধুময়।
গন্ধর্বতত্ত্বজ্ঞ কুশলব গন্ধর্বের রূপ
মধুকণ্ঠ, সুধাভাষী
সর্বগুণে সুলক্ষণ রয়েছে প্রকাশি।
রাম অনুরূপ দুটি
তাঁরি বিম্বে সমুৎপন্ন প্রতিবিম্ব যেন।

মহানন্দে রামগান করে ভ্রাতৃদ্বয়
সাধু, ঋষি, দ্বিজ শুনি
প্রীত অতিশয়।
কুশীলব রামায়ণ গীতি
শ্রুতিমাত্র জাগে প্রীতি পুলক বিস্ময়
প্রেমাশ্রুতে গদগদ স্তব্ধ সবে রয়।
গীত-মুগ্ধ ঋষি মুনি সাধুবাদ দানি
তাঁহাদের তরে
কলস, বল্কল দেন সবারে আদরে।
কেহ কৃষ্ণাজিন কেহ যজ্ঞসূত্র, হার,
কমণ্ডলু, মৌঞ্জী, কেহ কৌপীন বসন,
কষায় বস্ত্রেরে আর জটার বন্ধনী
কাষ্ঠ সংগ্রহের রজ্জু, যজ্ঞপাত্র আনি
রাখেন তাঁদের কাছে
বহু কাষ্ঠ ভার,
উদুম্বরী রচা পীঠ, কুটজকুসুম
দেন উপহার
যথাসাধ্য যাঁর।
আর যারা করে নাই দান
রাখিবারে মান
বাল্মীকির অনুপম কবিত্বের প্রশংসা করিয়া
একবাক্যে কুশীলবে আশীর্বাদ দানি
'দীর্ঘজীবী হও' কহি গেলেন চলিয়া।

কুশীলব ভ্রাতৃদ্বয়
সুখোদ্দীপ্ত আয়ুষ্কর গাহি রামায়ণ
করিলেন সর্বত্রই সুখ্যাতি অর্জন।
একদা সহসা তাঁরা
রাজপথে অযোধ্যায় গীত গাহি ভ্রমিবার কালে
তাঁহাদের সাথে
রামচন্দ্র মহারাজ নয়নে নয়ন
ঘটিল মিলন।
রামায়ণ-গীতি শুনি নৃপতি শ্রীরাম
সাদরে তাঁদের ভবনে আনিয়া
বসালেন হেম সিংহাসনে।
লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন আর ভরতের সাথে
লইয়া আসন দিলেন আদেশ রাম
গাহিবারে গীত। কহিলেন পুনরায়
"দেবতুল্য নবীন তরুণ
ভ্রাতা দুটি এসেছেন হেথা
নিকটে তাঁদের
বিচিত্রার্থপ্রদ
অপূর্ব আখ্যান সবে করহে শ্রবণ।"
রামের অনুজ্ঞায়
গীতি-মার্গ বিধানের মতে
তন্ত্রীলয়ে সুমধুর
সর্বগাত্র মন হৃদি উল্লাসজনক
কুশীলব গীতে রত হলেন দুজনে।
নৃপ রাম শুনি রামায়ণ
কহিলেন অনুজেরে
"গায়কেরা মুনিবেশী
আছে তবু রাজ-চিহ্ন দেহেতে অঙ্কিত
উপাখ্যান গীতি এই মাধুর্যে ভরিয়া
মোর খ্যাতি যশেতে পূরিত।"
রামচন্দ্র সভাসীন
কীর্তি নিজ হবে স্থায়ী ভাবি
শুনিতে আসক্তি তাঁর হল সমধিক।

'নমো সম্বুদ্ধায়'

স্বামী বিবেকানন্দ

সঙ্কলক (গদ্য-ছন্দে) ঃ অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক—বিভাগীয় প্রধান।
সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত খ্যাতকীর্তি বিবেকানন্দ-গবেষক।

॥ ১ ॥

বুদ্ধ আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর।

তিনি এসেছিলেন আমার ঘরে, জীবনে আমার, একেবারে বাল্যকালে।
তখন স্কুলে পড়ি, ধ্যান করছি রুদ্ধ ঘরে,
অকস্মাৎ আবির্ভূত জ্যোতির্ময় পুরুষ, সম্মুখে,
মুখে অপূর্ব আলোক মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে প্রশান্ত সন্ন্যাসী,
ভাষাময় নয়নে তাকিয়ে আমার দিকে, যেন কিছু বলবেন।
অভিভূত আমি, প্রণাম করেছি সাষ্টাঙ্গে, কিন্তু ভয় পেয়েছি,
দ্বার খুলে বেরিয়ে এসেছি নির্বোধের মতো,
শোনা হয়নি তাঁর কথা।
জানি তবু জানি—প্রভু বুদ্ধই এসেছিলেন আমার কাছে।

তারপর একদিন বুদ্ধগয়ায় ধ্যানে বসেছি বোধিবৃক্ষতলে,
আর শিউরে উঠেছি—এও কি সম্ভব!—
যে-বায়ুতে নিশ্বাস নিয়েছিলেন তিনি—
তাতেই শ্বাস নিচ্ছি আমি!
যে-মাটিতে বিচরণ করেছিলেন—
তাতেই অবস্থিত আমিও!!

বুদ্ধ।
তিনি সেই একমাত্র যাঁতে আবির্ভূত এবং বিঘোষিত এই বার্তা—
'মৃত্যু মহা অভিশাপ—অভিশাপ এ-জীবন।
মৃত্যু ও জীবনের লয় যে-নির্বাণে—
তাই হোক মানবের ধ্রুব আশ্রয়।'

ওঁ নমো ভগবতে সম্বুদ্ধায়।

॥ ২ ॥

জগৎ দেখেনি তাঁর মতো সংস্কারক
যিনি বলেছেন স্থির কণ্ঠে :
কিছু শুনেছ বলেই তাকে বিশ্বাস করো না ;
বংশানুক্রমে কোনো মত পেয়েছ বলেই তাকে বিশ্বাস করো না ,
প্রাচীন কোনো ঋষির বাক্য বলেই তাকে বিশ্বাস করো না ,
কোনো তর্কে অভ্যাসে জড়িত হয়েছ বলেই তাকে বিশ্বাস করো না ,
বিচার করো, বিশ্লেষণ করো, ছাখো যুক্তির সঙ্গে মেলে কিনা ,
ছাখো তা সকলের কল্যাণকর কিনা,
যদি হয়, তবেই গ্রহণ করো,
আর জীবন যাপন করো সেই মতো ।

তার্কিক ব্রাহ্মণকে বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন—
আপনারা ব্রহ্মকে দেখেছেন ?
—না ।
আপনাদের পিতা ব্রহ্মকে দেখেছেন ?
—মনে হয় না ।
আপনাদের পিতামহ ব্রহ্মকে দেখেছেন ?
—জানি না ।
হে বন্ধুগণ ! যাঁকে না দেখেছেন আপনি,
না দেখেছেন আপনার পিতা বা পিতামহ,
সেই অদৃষ্টের দ্বারা দাবিয়ে রাখতে চান অন্যদের—
কি আশ্চর্য !

ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে চলেছে তুমুল তর্ক,
কোলাহল, বিষাক্ত বাক্য-বিনিময় ।
বুদ্ধ শান্তভাবে সব শুনলেন, পরে বললেন,
আপনাদের শাস্ত্র কি বলেছে—ঈশ্বর ক্রোধী ?
—না, বলেনি ।
আপনাদের শাস্ত্র কি বলেছে—ঈশ্বর অন্যের ক্ষতিকারক ?
—না, বলেনি ।
আপনাদের শাস্ত্র কি বলেছে—ঈশ্বর অপবিত্র ?
—না, অবশ্যই বলেনি ।
আপনাদের শাস্ত্র এ-বিষয়ে কী বলেছে ?

—শাস্ত্র বলেছে—ঈশ্বর পবিত্র, ঈশ্বর প্রেমময়, ঈশ্বর মঙ্গলময়।
স্নিগ্ধ হাসিতে বুদ্ধ বললেন, হে বন্ধুগণ!—
তাহলে কেন আপনারা চেষ্টা করেন না পবিত্র ও মঙ্গলময় হতে—
যাতে ঈশ্বরকে জানতে পারেন?

ধর্মে অলৌকিকতার প্রচণ্ড বিরোধী বুদ্ধের কাছে শিষ্যরা সোৎসাহে বললেন—
এক অলৌকিক ক্রিয়াকারীর কথা।
সে লোকটি নাকি শূন্য থেকে মৃৎভাণ্ড নামাতে পারে।
তেমন একটি পাত্র বুদ্ধকে দেখানোও হল।
লাথি মেরে সেটি ভেঙে বুদ্ধ বললেন—
কদাপি অলৌকিকতার উপরে ধর্মকে দাঁড় করাবে না।
অনুসন্ধান করো বিশুদ্ধ সত্যের,
অগ্রসর হও আত্মজ্যোতির আলোকে।

সত্যের জন্য বুদ্ধের নির্ভয় সন্ধান,
প্রতিটি প্রাণীর জন্য অপূর্ব প্রেম,
জগতে অনন্য।
ধর্মজগতের মহাসেনাপতি বুদ্ধ,
সিংহাসন অধিকার করেছিলেন
অপরকে দান করার জন্যই।

॥ ৩ ॥

বুদ্ধ প্রেরণ করতেন প্রেমপ্রবাহ—
উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, ঊর্ধ্বে ও নিম্নে—
যতক্ষণ না পূর্ণ হয়ে যায় সমগ্র জগৎ সে অনন্ত স্রোতে।
সম্মুখে রয়েছে আলোকিত বিশ্বজগৎ,
এ বিশ্বের সবকিছু আমাদের,
বাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গন করো জগৎকে।

মহারণ্যে বুদ্ধের ধ্যান আত্মমুক্তির জন্য নয়।
জগৎ জ্বলছে—নির্গমনের পথ চাই—
বাঁচার জন্য।
জগতে এত দুঃখ কেন—কেন—
সেই যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত তিনি।

অনুসরণ করো তাঁকে—বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে যিনি
পাঁচশতবার জন্মেছেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন—
সেই শ্রীবুদ্ধকে।

॥ ৪ ॥

বুদ্ধের ধর্ম দ্রুত ছড়িয়েছিল তাঁর দর্শনের জন্য নয়,
সে দর্শনের সব কথা গ্রাহ্যও নয়, যেহেতু যুক্তিসঙ্গত নয় সর্বদা,
বুদ্ধের বিস্তারের কারণ তাঁর অপূর্ব প্রেম।
মানব-ইতিহাসে সেই প্রথম একটি বিশাল হৃদয় করুণায় বিগলিত,
সিক্ত করেছিল সর্বপ্রাণীকে।

ঈশ্বরকে ভালবেসেছে মানুষ কিন্তু ভুলেছে মনুষ্য-ভ্রাতাকে।
ঈশ্বরের জন্য প্রাণ দিয়েছে সে—নিয়েছেও প্রাণ—
ঈশ্বরেরই নামে।
বলি দিয়েছে নিজ সন্তানকে, লুণ্ঠন করেছে অন্য দেশ ও জাতিকে,
খুন করেছে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে,
সিক্ত করেছে ধরিত্রী রক্তে শুধু রক্তে,
সবই ঈশ্বরের নামে—ঈশ্বরেরই নামে।
বুদ্ধের শিক্ষাতে মানুষ প্রথম মুখ ফেরাল অপর ঈশ্বরের দিকে,
সে ঈশ্বর—মানুষ।
বুদ্ধের ভিতর থেকে উঠেছিল বিশুদ্ধ প্রেম আর জ্ঞানের ঢেউ,
তা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেশের পর দেশ,
পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—সর্বদিক—সর্ব প্রান্ত।

অসাম্যের বিরুদ্ধে চির সংগ্রামী,
জাতিভেদ খণ্ডনকারী,
অধিকারবাদ নাশকারী,
সর্ব প্রাণীর সাম্যবিঘোষক,
লক্ষ-লক্ষ পদদলিতের পরিত্রাতা—
তিনি তথাগত—বুদ্ধ।

॥ ৫ ॥

বুদ্ধের এই দারুণ বার্তা :
উন্মূল করো নিজ হৃদয়ের স্বার্থপরতা,
উন্মূল করো সকলই যা স্বার্থে ভোলায় মানুষকে।

স্ত্রী নয়—পুত্র নয়—পরিবার নয়—না না—
আবদ্ধ হয়ো না সংসারে।
স্বার্থশূন্য হও! স্বার্থশূন্য হও!

অতন্দ্র বুদ্ধের বাণী:
তীব্রগতি কাল, নশ্বর জগৎ, দুঃখ সর্বস্ব যেখানে।
তোমার ঐ উত্তম খানা, সুন্দর বসন, আরামের আবাস!
হে মোহনিদ্রিত নর-নারী—
ভেবেছ কি কোটি-কোটি ক্ষুধাতুরের কথা যারা মৃত্যুপথযাত্রী!
শুধু দুঃখ, শুধু দুঃখ—ভুলোনা এই মহাসত্য।
জগতে প্রবেশের মুখে শিশু কাঁদে,
সেই তার প্রথম উচ্চারণ।
কান্নাই সত্য জগতে—সকলে কাঁদছে—কাঁদবে।
এই জেনে ত্যাগ করো স্বার্থ।

আচার্যদের মধ্যে বুদ্ধই সর্বাধিক শিখিয়েছেন
আত্মবিশ্বাসী হতে।
যেখানে স্বাধীনতা সেখানেই শান্তি—তিনি বলেছেন।
যেখানে অধীনতা সেখানেই দুঃখ—তিনি বলেছেন।
মানুষে রয়েছে অনন্ত শক্তি,
কেন সে কেবলই প্রার্থনা করবে ঈশ্বরের কাছে?
প্রতি শ্বাসে উপাসনা করছ তোমরা—একথা ভুলো না।
আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি—এও উপাসনা।
তোমরা শুনছ—এও উপাসনা।
শরীর-মনের এমন মুহূর্ত কি সম্ভব যখন মানুষ
দিব্যশক্তির প্রকাশলীলার অংশী নয়?
প্রার্থনা কি যাদুমন্ত্র যে শব্দোচ্চারণেই অলৌকিক ফল পাও?
না—না—প্রত্যেককে শ্রমে ও ঘর্মে পৌঁছতে হবে গভীরে,
অনন্ত শক্তির উৎসে।
শ্রমই সর্বোচ্চ প্রার্থনা—বাক্য নয়।
কর্মের দ্বারা উপাসনা করো—নীরবে।

প্রলোভন এসেছিল বুদ্ধের কাছে, হাতছানি দিয়ে বলেছিল,
ছেড়ে দাও সত্যের সন্ধান,

ফিরে যাও সংসারে, পুরনো জীবনে, জুয়াচুরি আর মিথ্যার জগতে,
ভ্রান্ত শব্দে চিহ্নিত করো সদ্‌বস্তুকে।
প্রলোভনের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে সেই মহাকায় পুরুষ বলেছিলেন,
সত্যের সন্ধানে মৃত্যুও শ্রেয়—অজ্ঞানের জীবনের চেয়ে,
যুদ্ধক্ষেত্রে বিনাশও শ্রেয়—পরাভূত জীবনের চেয়ে।

শত্রু বা মিত্র, কেউ কখনো বলতে পারেনি
সর্বজনের হিত ছাড়া বুদ্ধ একটি নিঃশ্বাসও নিয়েছেন,
একটুকরো রুটিও খেয়েছেন।
কল্যাণের জন্যই তিনি কল্যাণকৃৎ।
প্রেমের জন্যই তিনি প্রেমিক।

বুদ্ধের শিষ্যরা প্রশ্ন করলেন—আমরা সৎ হব কেন ?
বুদ্ধ বললেন—তোমরা সদ্‌ভাব পেয়েছ উত্তরাধিকারসূত্রে,
সদ্‌ভাবের উত্তরাধিকার রেখে যাও পরবর্তীদের জন্য।
এসো আমরা চেষ্টা করি সমষ্টিগত সাধুতার বৃদ্ধির জন্য,
এসো আমরা সদাচরণ করি সদাচরণের জন্যই।
মানুষের দুঃখের জন্য মানুষই দায়ী,
মানুষের সদাচরণের প্রশংসা মানুষই পাবে।
সমুদ্রের ঢেউ নেমে যাবার সময়ে সঞ্চারিত করে যায়
পরবর্তী ঢেউয়ে উত্থানের শক্তি,
তেমনি এক আত্মা দিয়ে যায় নিজের শক্তি—
ভবিষ্যৎ আত্মায়।

॥ ৬ ॥

হে পাশ্চাত্যবাসিগণ! তোমরা বলছ—
ক্রুশবিদ্ধ হলে বৃদ্ধি পেত বুদ্ধের মহিমা।
হায়—ঠিক!
রোমক নিষ্ঠুরতার হে পূজারীগণ!
তোমরা কেবলই চাও অসাধারণ কাণ্ড, এপিক গর্জন,
'হেঁটমুণ্ডে অতলস্পর্শে গহ্বরে নিক্ষেপের'
মিল্টনী চীৎকার।
খ্রীষ্টকে পেরেক ঠুকে মারা হয়েছে, তিনি ককিয়ে কেঁদেছেন,
খুবই পছন্দ তোমাদের।

জীবনের সামান্য ঘটনার কবিত্ব তুচ্ছ তোমাদের কাছে,
আমাদের কাছে কিন্তু নয়।
অপূর্ব লাগে বুদ্ধের জীবনের ছোটখাটো ঘটনাগুলি।
যেমন ধরো না কেন—
মৃতপুত্র বুকে নিয়ে মা এসেছে কাঁদতে-কাঁদতে—
'হে বুদ্ধ! হে প্রভু! জীবন দান করো পুত্রের,
সকলই সাধ্য তোমার।'
বুদ্ধ বললেন করুণা-কণ্ঠে,
'মাতঃ! প্রাণভিক্ষা করছ পুত্রের ?
তার আগে ভিক্ষা করে আনো এক মুঠা শ্বেত সরিষা,
এমন গৃহ থেকে যেখানে প্রবেশ করেনি মৃত্যু।'
শুধু এই ? এত সামান্য ? এখনই আনছি—
ছুটে বেরিয়ে গেল জননী, সারাদিন ঘুরল দ্বারে-দ্বারে,
কিন্তু পেল না, কারণ মৃত্যু নেই এমন গৃহ নেই।
মৃত্যুস্রোতের কূলে দাঁড়িয়ে পুত্রহারা মা জেনেছিল—
জীবনের অনিবার্য সত্য—
মৃত্যু।

আরও কাহিনী—
বুদ্ধ কাঁধে তুলে নিয়েছেন ছাগশিশুটিকে।
ছাগশিশু খুঁড়িয়ে হাঁটছিল যূপকাষ্ঠের দিকে—
বলির পশুদের সঙ্গে।
বুদ্ধ এসে দাঁড়ালেন রাজদ্বারে,
পুণ্যলোভাতুর নৃপতিকে বললেন,
হে মহারাজ! ছাগশিশুকে বলি দিলে যে-পুণ্য
তারো চেয়ে বহুগুণ পুণ্য পাবে মানুষকে বলি দিলে।
আমি প্রস্তুত—ছাগশিশুর স্থান নিতে।

হেলায় রাজসম্পদ ত্যাগ করে বুদ্ধ নেমেছেন পথে—
এর নাটকীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ তোমরা, হে, পাশ্চাত্যবাসী!
ওটা কোনো বিরাট ব্যাপার নয় ভারতবর্ষে।
এক ক্ষুদ্র রাজার পুত্র গৌতম, কি-বা ঐশ্বর্য তাঁদের,
তাঁর মতো ত্যাগ অনেকেই করেছেন পূর্বে।
কিন্তু কোনো তুলনা নেই নির্বাণ-পরবর্তী ঘটনার,

সহজের অপূর্ব সৌন্দর্যে পূর্ণ সেগুলি।—

রাত্রি গভীর, বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম।
বুদ্ধ দাঁড়ালেন এসে এক গোপের কুটীরে,
ছাঁচের নীচে দেওয়ালের গা-ঘেঁসে।
ছাঁচ দিয়ে জল ঝরছে। বাতাসের ঝাপট।
জানলা দিয়ে গোপ চকিতে দেখল সন্ন্যাসীকে।
'বা! বা! গেরুয়াধারী যে! থাকো ওখানে।
ওই তোমার ঠিক জায়গা।'
গান ধরল সে—
'গোরু-বাছুর উঠেছে গোয়ালে, আগুনে তপ্ত ঘর,
নিরাপদ পত্নী আমার, সুখে নিদ্রিত সন্তানেরা,
সুতরাং মেঘগণ! আজ রাত্রে—
তোমরা বর্ষণ করো স্বচ্ছন্দে।'
বুদ্ধ উত্তর দিলেন—
'আমার মন সংযত, ইন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত,
হৃদয় দৃঢ় ও সুস্থির।
সুতরাং হে মেঘগণ! আজ রাত্রে—
তোমরা বর্ষণ করো স্বচ্ছন্দে।'
গোপ গাইল—
'খেতের ফসল কাটা শেষ, খড় উঠেছে খামারে,
জলভরা নদী, মজবুত বাঁধানো পথ,
সুতরাং হে মেঘগণ! আজ রাত্রে—
তোমরা বর্ষণ করো স্বচ্ছন্দে।'

গাইতে—গাইতে—লাগল গোপ,
উত্তর দিয়ে গেলেন বুদ্ধ একই ভাবে।
ক্রমে নম্র হয়ে এল গোপের কণ্ঠ,
নত হল সে বুদ্ধের চরণে,
অনুতপ্ত হৃদয়ে—শিষ্যত্বের জন্য।

মৃত্যুতে মহীয়ান বুদ্ধ—জীবনের মতোই।
অন্ত্যজ জাতির এক মানুষ আহার্য দিল তাঁকে,
দুষ্ট উপাদানে, অশুচি পরিবেশে প্রস্তুত খাদ্য।
বুদ্ধ শিষ্যদের বললেন, তোমরা খেয়ো না এ-জিনিস,
কিন্তু আমি তো পারব না প্রত্যাখ্যান করতে।

যাও, বলে এসো ঐ মানুষটিকে,
আমার সর্বোচ্চ সেবা সে করেছে,
আমাকে মুক্ত করেছে এই দেহের বন্ধন থেকে।

বুদ্ধ বিদায় নেবেন পৃথিবী থেকে,
বৃক্ষতলে বিছানো চীর,
সিংহের ন্যায় দক্ষিণপার্শ্বে শয়ান আনন্দময় পুরুষ,
মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।
প্রিয় শিষ্য আনন্দ কাঁদছিলেন।
বুদ্ধ তিরস্কার করে বললেন,
জেনে রাখো, বুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষ নন,
ওটি এক উচ্চ অবস্থা, যে-কেউ লাভ করতে পারে।
অন্য কাউকে অর্চনা নয়—
আত্মদীপো ভব।
সিংহ যেমন ভীত নয় শব্দে,
জালবদ্ধ নয় বায়ু, জললিপ্ত নয় পদ্মপত্র,
তেমনি একাকী বিচরণ করো গণ্ডারের মতো।
দৃষ্টি দিও না পথের দিকে, গ্রাহ্য করো না কোনোকিছু,
অগ্রসর হও গণ্ডারের মতো একাকী।

শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে তথাগতের,
সকলে নীরব, রুদ্ধশ্বাস।
দূরাগত একজন সহসা ছুটে এল সেখানে,
উপদেশপ্রার্থী।
হবে না, সম্ভব নয়—শিষ্যরা ফেরালো তাকে।
বুদ্ধ থামালেন।
বুদ্ধ বললেন, ওকে আসতে দাও,
তথাগত সর্বদা প্রস্তুত।

সত্য—গভীরভাবে সত্য—এই কাহিনী।
আমি দেখেছি রামকৃষ্ণকে
অন্তিমক্ষণে একই কাজ করতে।
রামকৃষ্ণ সদা প্রস্তুত।

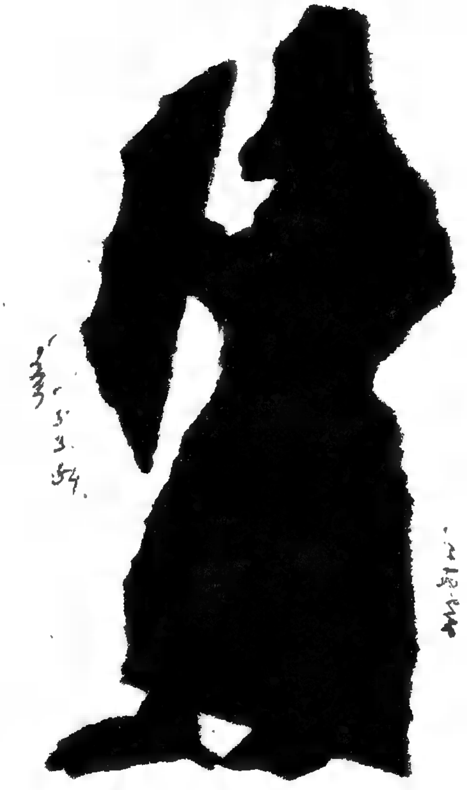

'সাবধান'

(ছেঁড়া কাগজ জুড়ে চিত্ররূপ)

শিল্পাচার্য নন্দলালের রচনা

সৌজন্যে : বিশ্বরূপ বসু।

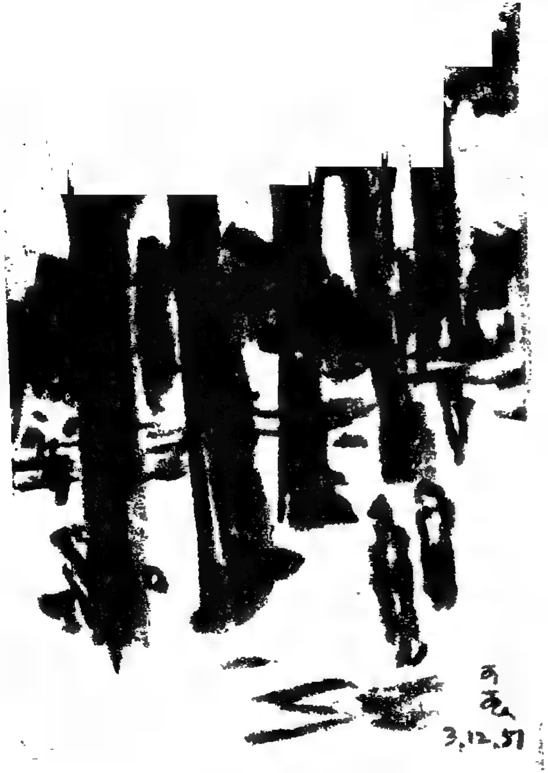

শান্তিনিকেতন (শাল বীথি)

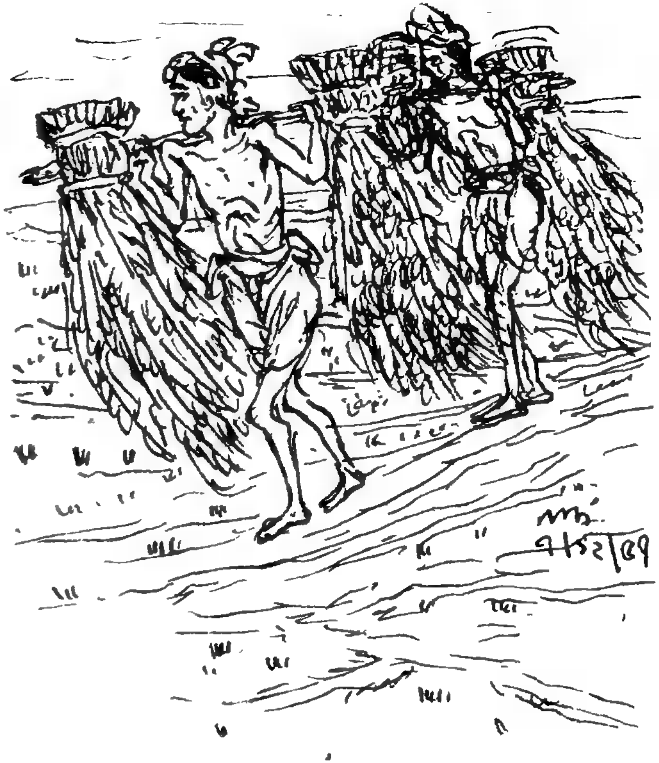

নতুন ধান

শিল্পাচার্য নন্দলালের চিত্র।

সৌজন্যে : বিশ্বরূপ বসু

বিমলেশ্বরের পথে

স্বামী চৈতন্যানন্দ

বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী—‘উদ্বোধন’ পত্রিকার সংশ্লিষ্ট।

উত্তরকাশী। ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৪। রাত ৪টা। স্বামী ব্রজেশানন্দ ও আমি শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির থেকে বেরিয়ে পড়লাম। দুজনের গায়ে গরম জামা, চাদর। মাথায় কান-ঢাকা টুপি। হাতে লাঠি, টর্চলাইট, ভিক্ষাপাত্রে গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র। হেঁটে মাইলখানেকের মতো রাস্তা গেলাম। উজেলীতে। এখানে সাধু-মহাত্মারা থাকেন। এক মহাত্মার কুটিয়ায় গিয়ে আমরা দুজন হাজির হলাম। কুটিয়াতে দুজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা যেতেই তাঁরা কফি তৈরি করে ফেললেন। চারজন মিলে কফি ও বিস্কুট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় ভোর ৬টা। তখনও কিছু অন্ধকার—আকাশ পরিষ্কার হয়নি। বেশ শীত আছে। উত্তরকাশীর বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে হেঁটে চললাম। আমরা যাব বিমলেশ্বর শিবজীকে দর্শন করতে। উত্তরকাশীর পশ্চিমে যে সুউচ্চ পাহাড় তার শিখরে বিমলেশ্বর-মন্দির। শিখরের উচ্চতা ৭২ হাজার ফিটের মতো। আমরা যে-রাস্তা দিয়ে যাব সেভাবে না গিয়ে শর্ট-কাট রাস্তা ধরেও যাওয়া যায়। তবে আমরা একটু ঘুরে যাচ্ছি পথে কিছু দর্শনীয় জিনিস আছে বলে।

হরিদ্বারের বাসরাস্তা ধরে জ্ঞানসুতে চলে এলাম। এখান থেকেই পাহাড় চড়াই আরম্ভ। পাহাড়ের গা-বেয়ে আমরা উঠছি। মাঝে মাঝে গ্রাম পড়ছে। সকালবেলা। পূর্ব পাহাড়ের চূড়া থেকে সূর্য উঠছে। গ্রামের শিশু থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সব্বাই হাতজোড় করে ‘ওঁ নমো নারায়ণায়, স্বামীজী’ বলে আমাদের প্রাতঃশুভেচ্ছা জানাচ্ছে। একেবারে ছোট শিশুরা ‘ওঁ নমো নারায়ণায়, স্বামীজী’ সম্পূর্ণ বলতে পারছিল না। তারা আধ-আধ করে ‘ওঁ, স্বামীজী’ বলছিল। শুনতে ভারী ভাল লাগছিল। আজও পাহাড়ী মা-বাবারা ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের সাধু-মহাত্মাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শেখায়!—ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলাম।

চড়াই ভেঙে উঠছি। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছি। সাধু-মহাত্মাদের জীবন-কাহিনী আলোচনা করছি। কখন-বা স্বামীজীব ‘সন্ন্যাসীব গীতি’ থেকে কিছু কিছু স্তবক আবৃত্তি করছি। আবার কখন উঠে আসা নিচের পথের দিকে তাকিয়ে দেখছি দেওদার ও চিরগাছের জঙ্গল। মনে হচ্ছিল, নিচের গাছগুলি যেন পাহাড়েব গায়ে সবুজের একটি আস্তরণ বিস্তীর্ণ করেছে।

কখন আমরা এসে গেছি সান্ড গ্রামে। গ্রামে ঢোকার মুখে জগন্নাথের মন্দিব পড়ে। মন্দিরটি বহু প্রাচীন বলে লোকমুখে প্রচলিত। এখানকার মূর্তি পুরীর জগন্নাথের মতো নয়। বিষ্ণুমূর্তি। বসা অবস্থা। হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। জগতের নাথ বলে তাঁর নাম জগন্নাথ। মনে হয়, সেই হিসাবে মন্দিরের নাম জগন্নাথ-মন্দির। ত্যাগভূমি হিমালয়ে জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশের সময় মনে মনে প্রাণের প্রার্থনা জানালাম :

> ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
> ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্।
> সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
> জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

পরিবেশ শান্ত। কোন বাতাস বইছে কি বইছে না বোঝা যাচ্ছে না। দেওদার ও

চিরগাছগুলি উন্নতশিরে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে আছে। প্রভঞ্জনের সঙ্গে বায়ুক্রীড়া করে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করার তাদের যেন কোন অধিকার নেই। মন্দিরের ভিতর গাঢ অন্ধকার। টর্চের আলো জ্বেলে প্রভু জগন্নাথকে প্রণাম করে মন্দিরের চার-কোণে আমরা চারজন বসে পড়লাম। মন আপনা আপনি শান্ত হয়ে গেল। জোর করে শান্ত করতে হল না। গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে একটি সোঁসোঁ শব্দে মন তন্ময় হয়ে গেল। মনে হল, সারা হিমালয় জুড়ে যেন অনাহত ওঁ-কার শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। এমন সময় মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক সাধুটি চা-পানের জন্য আমাদের ডাকলেন। আমাদের উঠতে ইচ্ছা করছিল না। উঠতে বাধ্য হলাম—নতুবা আমাদের গন্তব্যস্থান বিমলেশ্বরে যেতে দেরি হবে। চা-পানের পর জগন্নাথদেবকে পুনঃপ্রণাম করে সান্ড গ্রামে প্রবেশ করলাম।

এই গ্রামে মাধুকরী করার ইচ্ছা হল আমাদের। বেলা ৮½।৯টা। এত সকালে কি মাধুকরী পাওয়া যাবে? সাধারণত গ্রামের মানুষ দুপুর ১।১½টার কমে খায় না। এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। মেয়েরা রান্না-বান্না এবং সংসারের অন্যান্য কাজ সেরে, খাওয়া-দাওয়া করে মাঠে কাজ করতে যায়। পুরুষরা বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা করে। আর লাঙল দিয়ে জমি চাষ করে দেয়। তারপর ফসল রোপণ করা থেকে ঘরে ফসল কেটে তোলা পর্যন্ত মেয়েদের কাজ। মেয়েরা ঘরে এবং বাইরের সমস্ত কাজ করে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলছেন: 'ঋষিরা কত খাটত। সকালবেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা করত, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে ফলমূল খেত।' একথা প্রসঙ্গে আমাদের পথপ্রদর্শক শুভ্রকেশ-শ্মশ্রুমণ্ডিত গৌরবর্ণ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বললেন, এই ট্রাডিশন এখনও কিছুটা আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কিরকম? তিনি বললেন, প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা বনে-জঙ্গলে যখন তপস্যা করতে যেতেন তখন তাঁদের পরিবারের মেয়েরা সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করতেন। তা না হলে তাঁদের পক্ষে সংসারনির্বাহ করা সম্ভব হত না। মুনি-ঋষিরা সারাদিন তপস্যা করে বন-জঙ্গল থেকে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়তেন, আবার ভোরে উঠে চলে যেতেন। সেজন্য সংসার চালাবার জন্য মেয়েদের খুব খাটতে হত। সে-ধারা এখনও কিছুটা দেখা যায়—পাহাড়ী গার্হস্থ্য জীবনে। পুরুষরা তপস্যা করতে বনে-জঙ্গলে যায় না, তারা ঘরে ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা ও ক্ষেতে হালচাষ করে—এই পর্যন্ত তাদের কাজ। সংসারের বাকী আর সব কাজ মেয়েরাই করে।

সান্ড গ্রামে আমরা যখন মাধুকরী করতে ঢুকছি তখন গ্রামবাসীদের যাদের সঙ্গে পথে আমাদের দেখা হল তারা 'ওঁ নমো নারায়ণায়, স্বামীজী' বলে অভ্যর্থনা জানাল। আমরাও প্রতি নমস্কার করলাম। আমরা কয়েকটি বাড়িতে 'নারায়ণ হরি' বলে দাঁড়ালাম। যাদের রান্না হয়ে গেছে তারা খুব শ্রদ্ধাসহকারে ভাত-ডাল, মাঠা (ঘোল) ভিক্ষা দিল। যাদের রান্না হয়নি তারা ভিক্ষে দিতে না পারায় মনে কষ্ট পাচ্ছিল। তারা বারবার বলছিল: 'স্বামীজী, শুকা ভিক্ষা লে যাইয়ে'—স্বামীজী, আপনারা শুকা (রান্না না করা চাল-ডাল) ভিক্ষা নিয়ে যান। আমরা বললাম: 'নহী পুক্কী ভিক্ষা চাইয়ে'—না, আমাদের পুক্কী (রান্না-করা) ভিক্ষা চাই। কোন কোন বাড়িতে কাঁচা শাক-ডাল নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। গ্রামবাসীদের সহৃদয় ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এরা গরীব কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের খাওয়ানোর জন্য নিজেদের মুখের অন্ন তুলে

দিতেও এদের এতটুকু দ্বিধা হয় না। এখানে এসেই বুঝলাম 'অতিথিদেবো ভব' কথার তাৎপর্য।

ভারতের আবহমানকালের ট্রাডিশন অশিক্ষিত গ্রামের মানুষগুলি আজও বহন করে চলেছে। যেখানে বিংশশতাব্দীর তথাকথিত শিক্ষিত মানুষগুলি শিক্ষার আলোক পেয়েও দিন দিন হয়ে যাচ্ছে কুটিল, বক্র, সদা সন্দেহপরায়ণ। সেখানে অশিক্ষিত এই মানুষগুলি সহজ, সরল, সেবাপরায়ণ। ত্যাগে মহীয়ান। ভারতের চিরন্তন আদর্শ ত্যাগ ও সেবাকে বহন করে চলেছে।

মাধুকরী জিনিস নিয়ে আমরা গ্রামের বাইরে এলাম। খানিকটা সমতল দেখে বসে পড়লাম আমরা। চারজনে ভাগ করে নিলাম মাধুকরীর সমস্ত জিনিস। ইষ্টদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে খুব তৃপ্তিসহকারে খেলাম। খাওয়ার পর আবার পাহাড় চড়াই। ভরা-পেটে পাহাড় চড়াই মোটেই আনন্দদায়ক নয়। তবু আমাদের চড়াইয়ে উঠতে হবে নতুবা বিমলেশ্বরে পৌছাতে দেরি হয়ে যাবে। চড়াইয়ের মাঝে জেঞ্জা (বা গেঞ্জা) নামে একটা গ্রাম পড়ল। এর পরে আর কোন গ্রাম নেই। শুধু চড়াই ও দেওদার ও চিরগাছের গভীর জঙ্গল। গাছগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, তারা যেন পাহারা দিচ্ছে কেউ কোন শব্দ করে গিরিরাজের ধ্যানভঙ্গ না করে। সদা জাগ্রত প্রহরী তারা। কোন পাখির ডাকও শুনতে পাচ্ছিলাম না। শুধু মহামৌনতার সোঁসোঁ শব্দ। সঞ্চরমান বাতাস বৃক্ষপাতায় মৃদু মরমর ধ্বনি তুলতেও যেন সাহস করছিল না। যেন নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদেরও কোন কথা বলে এই অপূর্ব নীরবতা ভঙ্গ করতে ইচ্ছা করছিল না, তবু মাঝে মাঝে 'ওঁ' শব্দে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে ধ্যানমগ্ন গিরিরাজকে সম্ভাষণ করছিলাম। ওই ওঁ-কার ধ্বনি পাহাড় থেকে পাহাড়ান্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। যেন গিরিরাজ ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হয়ে আমাদের আন্তরিক সম্ভাষণের প্রতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন। গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি শুনে আমাদের সমস্ত শরীর শিহরিয়ে উঠছিল।

চড়াই উঠতে উঠতে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছিলাম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মেয়েরা ঘাস কেটে পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে একটি যুবকের সঙ্গে দেখা হল। সে আমাদের বলল : এই জঙ্গলে লাল রঙের একটা ষাঁড় এসেছে সম্প্রতি। মানুষ দেখলেই সে শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে দিচ্ছে। আপনারা একটু সাবধানে যাবেন। আমরাও চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সাবধানে চড়াইয়ে উঠতে লাগলাম।

পৌছে গেলাম খড়িয়ানি পাহাড়ে। এই পাহাড়ের চূড়ায় এক 'বিরকত' মহাত্মা থাকেন—বৈদান্তিক সাধু। পাণ্ডিত্য ও সাধুজীবনের জন্য তিনি উত্তরকাশী সাধুসমাজে সুপরিচিত। এই নির্জন জঙ্গলে কুটিয়া বেঁধে তিনি একান্তে বাস করেন। কয়েকদিন পূর্বে সেই লাল রঙের ভয়ঙ্কর ষাঁড়টি শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে তাঁকে পাহাড় থেকে ফেলে দেয়। তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সম্প্রতি ছাড়া পেয়ে তিনি কুটিয়ায় ফিরে এসেছেন। আমাদের পথপ্রদর্শক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে এই 'বিরকত' মহাত্মার খুব পরিচয় আছে। তিনি আমাদের ভাল সাধু দর্শন করাবেন বলে এখানে নিয়ে এসেছেন। মহাত্মার নাম স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ। তিনি কৈলাস আশ্রম থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন। বাঙালী শরীর। এই পাহাড়ের চূড়ায় ১১ বছর ধরে আছেন। পাহাড়ী গ্রামবাসীরা কুটিয়া তৈরি করে দিয়েছে।

মহাত্মার কুটিয়ায় পৌছে গেলাম। তিনি কুটিয়ার বাইরে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। কুটিয়ার ভিতরে গিয়ে বসার জন্য অনুরোধ করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে

ভিতরে প্রবেশ করতেই চমকে উঠলাম। তিনি যেখানে বসে শাস্ত্রাদি পাঠ করেন, তার ঠিক ডানদিকের দেওয়ালে টাঙানো কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় একটি ছবি। হিমালয়ের এমন দুর্গম অঞ্চলে ওইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রপট দেখে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হলাম। মনের ভাব গোপন রেখে তাঁকে প্রশ্ন করলাম: ষাঁড়ে কি করে গুঁতিয়ে দিল? তিনি বললেন: কুটিয়ার কিছুটা নিচে ব্যাসকুণ্ডে জল আনতে গিয়েছিলাম। রোজ যেরকম যাই সেদিনও সেরকম গিয়েছিলাম। সে-সময়ে ষাঁড়টি গুঁতিয়ে দেয়। আমি পাহাড় থেকে গড়িয়ে একটি গর্তের মধ্যে পড়ে যাই।

—তারপর কি হল?

—আমি অচৈতন্য হয়ে পড়ি। কিছু সময় পরে জ্ঞান ফিরে এলে শুনতে পাই যে, ষাঁড়টি পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে তখনও রাগে গর্জন করছে।

—তারপর আপনি কি করলেন?

—আমি গর্ত থেকে উঠে জঙ্গলের অন্য-একটি রাস্তা ধরে কোনরকমে হাঁটতে চেষ্টা করি—কুটিয়ায় ফিরে আসার জন্য। এমন সময় পথে ভারত-তিব্বত-সীমান্তের দুজন জওয়ানের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তাঁরা আমাকে ধরাধরি করে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে খুব ভালভাবে তাঁরা আমাকে চিকিৎসা করেছেন। সুস্থ হয়ে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ফিরেছি।

এই সব কথা যখন আমাদের বলছিলেন তখন তাঁর মুখে কোন ভয়ের চিহ্ন দেখিনি। স্মিতমুখে কথাগুলি বলছিলেন, আর তাঁর পায়ের ও হাতের বাঁধা-ব্যাণ্ডেজ এবং কপালে ও পায়ে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতচিহ্নগুলি আমাদের দেখাচ্ছিলেন। সহসা তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন: ঈশ্বরের কী করুণা! হঠাৎ দুটি লোক পাঠিয়ে আমাকে সরকারী ভাল হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে দিলেন! অন্য কোন হাসপাতালে এত ভাল চিকিৎসা হত কিনা সন্দেহ আছে। তিনি সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কথাগুলি বলতে বলতে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। তাঁর ঈশ্বরনির্ভরতা দেখে আমরা অভিভূত হয়ে পড়লাম। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করলাম: আচ্ছা মহারাজ, এই নির্জন স্থান আপনার কেমন লাগছে?

—ভাল লাগছে। ভাল লাগছে বলেই তো আজ ১১ বছর এখানে পড়ে আছি।

—এই জঙ্গলের মধ্যে আপনি খাবার ব্যবস্থা কি করেন?

—দু-তিন মাস অন্তর একদিন গ্রামে ভিক্ষা করতে যাই। চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি ভিক্ষা পাই।

—একসঙ্গে দু-তিন মাসের অত জিনিস একা বয়ে নিয়ে আসতে পারেন?

—গ্রামের একটি যুবক কুটিয়ায় বয়ে দিয়ে যায়। যুবকটি আমার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ে।

—রাত্রে কোন জন্তুজানোয়ার উপদ্রব করে না?

—বাঘ-ভালুক এই জঙ্গলে আছে। বাঘের সঙ্গে কখন কখন আমার সাক্ষাৎ হয়। এই কুটিয়ার সামনে মাঝে মাঝে বসেও থাকে।

বাঘের কথা শুনে আমরা ঘাবড়ে গেলাম। আমাদের ভয় হতে লাগল। এই জঙ্গল দিয়েই তো আবার আমাদের ফিরতে হবে! যাই হোক, ভয়ের কথা প্রকাশ না করে, মুখে সাহস দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: কিরকমভাবে কুটিয়ার সামনে বসে থাকে? তিনি বললেন: একবার সন্ধ্যার কিছু আগে ঘরের দরজার সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। একটা বাঘ হাত কুড়ি দূরে বাইরে বসে

আছে। আমি বাঘটির দিকে তাকিয়ে আছি, আর সেও আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমার মনের ভাবটি এই যে, বাঘটি যেই দরজার দিকে এগিয়ে আসবে, আমি অমনি দরজাটা বন্ধ করে দেব। কিন্তু দেখলাম, কিছু সময় পরে বাঘটি উঠে জঙ্গলে চলে গেল। আমরা আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: এইরকম ঘটনা আর কখনও ঘটেছে? তিনি স্মিতমুখে বললেন: হ্যাঁ, ঘটেছে। একদিন রাত্রে শুয়ে আছি। রাত তখন ১২।১টা হবে। হঠাৎ দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। কয়েকবার ধাক্কা দেওয়ার পর আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। কিছু সময় পর আবার ধাক্কার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর আর কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। সকালে উঠে দেখি, বারান্দায় বাঘের পায়ের ছাপ, আর দরজায় (অঙ্গুলি নির্দেশ করে) ওই যে গেরুয়া-কাপড়ের পর্দা আছে তার উপর থাবার চিহ্ন। মহাত্মাজী উঠে গিয়ে পর্দায় থাবার ছাপটি আমাদের দেখালেন। তিনি এমন-ভাবে কথাগুলি বলছিলেন যে, শুনে মনে হচ্ছিল আমরা যেন প্রাচীন যুগের কোন অরণ্যবাসী সাধু-মহাত্মার কাহিনী শুনছি।

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দের সাধন-ভজনের কক্ষটি দেখার ইচ্ছা হল আমাদের। সঙ্গী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ও আমি উঠে কুটিয়ারই সংলগ্ন নির্জন অন্ধকার একটা কক্ষে প্রবেশ করলাম। ঘরের কোথায় কি আছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিশ্বেশ্বরানন্দজী একটা টেমি আমাদের কাছে এনে দিলেন। ক্ষীণালোকে দেখলাম মেঝেয় কম্বল-পাতা। দেওয়ালের গা-ঘেঁষে একটি ছোট পূজার বেদী। বেদীর উপরে কোন্ কোন্ দেবতার ছবি আছে বোঝা যাচ্ছিল না। টেমিটি বেদীর কাছে নিয়ে দেখলাম, কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো দুর্গার ও মা-কালীর দুটি ছবি। মা-কালীর ছবিটি—মা-কালী দাঁড়িয়ে, আর তাঁর পায়ের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা বসে আছেন। তাঁকে একবার নিভৃতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণের ও মায়ের ছবিও আপনার পূজা-বেদীতে রেখেছেন! অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণের বই পড়েই তো আমার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। তাঁর কৃপাতেই তো সংসার ত্যাগ করতে পেরেছি।' কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাদের জানালেন, শ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে সংস্কৃতে একটি স্তব রচনাও করেছেন।

কুটিয়া থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম। দূরে যমুনোত্রীর তুষারশৃঙ্গ, জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের চূড়া এবং নিচে গেঙ্গা গ্রাম। অপূর্ব পরিবেশ, মন আপনা থেকে শান্ত হয়ে যায়। তবে জন্তুজানোয়ারের ভয়ে মন বিক্ষিপ্তও হয়।

বিশ্বেশ্বরানন্দজীকে দেখতে উত্তরকাশীর সিরোর গ্রামের বয়স্ক ব্রহ্মচারী দেবচৈতন্য গত-কাল এসেছিলেন। তিনি আমাদের চা তৈরি করে খাওয়ালেন। এই চায়ের ব্যবস্থা আগে থাকতে করে রেখেছিলেন আমাদের পথপ্রদর্শক সেই স্বামীজী।

চা-পানের পর আমরা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ২য় শিখরেশ্বরের দিকে রওনা হলাম। শিখরেশ্বরের উচ্চতা ৮½।৯ হাজার ফিট। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। গভীর জঙ্গল। স্বামীজীর 'সন্ন্যাসীর গীতি'র অপূর্ব সেই স্তবকটি মনে পড়ে গেল:

উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান,
হিমাদ্রিশিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে পর্বত-প্রদেশে
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে,
যে সঙ্গীত-ধ্বনি-প্রশান্ত-লহরী

সংসারের রোল উঠে ভেদ করি ;
কাঞ্চন কি কাম কিম্বা যশ-আশ
যাইতে না পারে কভু যার পাশ ;
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী—
সাধু যায় স্নান করে ধন্য মানি,
উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও, গাও সেই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

স্তবকটি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে আমরা পথ চলতে লাগলাম। পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হতে লাগল। আমাদের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হতে লাগল। এইভাবে পথ চলতে চলতে ১ম শিখরেশ্বরে এসে পৌঁছলাম। শিখরেশ্বরের মাথায় সঙ্গে-আনা গঙ্গাজল ঢেলে স্নান করালাম। তাঁকে আমাদের অন্তরের প্রণতি জানিয়ে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দু-চোখভরে দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর হৃষ্টচিত্তে আমরা খাড়াই পাহাড় ধরে নিচে নামতে লাগলাম। পাহাড়ী রাস্তা না ধরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বেপথে ধীরে ধীরে নামছি। খাড়াই পাহাড়। জংলী কাঁটাঘাসে ভর্তি, ইতস্তত পাথরের বোল্ডার পড়ে আছে। সন্তর্পণে তার উপর দিয়ে নামছি। আবার সবার হাতে লাঠিও নেই। আমাদের পথপ্রদর্শক বৃদ্ধ সাধুর কাছে শুধু ছাতা, তার উপর তাঁর কাঁধে প্রায় দশ কেজি ওজনের একটি ঝোলা। পায়ে আবার হাওয়াই চপ্পল। যদিও তিনি পাহাড় চড়াই-উতরাইয়ে সুদক্ষ। তবু তাঁর খাড়াই-এ নামতে অসুবিধা হচ্ছিল। কাঁটাঘাস পায়ে ফুটছিল। আমাদেরও পায়ে কাঁটা ফুটছিল। পায়ে বেদনা হচ্ছিল।

খড়িয়ানি পাহাড়ের বিশ্বেশ্বরানন্দজীকে দেখতে-যাওয়া ব্রহ্মচারী দেবচৈতন্যও আমাদের সঙ্গে আসছিলেন। আমরা মোট পাঁচজন এই-ভাবে পথ চলছি। হঠাৎ আমার পায়ের তলা থেকে একটা বড় পাথর সরে গেল। কোনরকমে শরীরের ভার সামলে নিলাম। একটু অসাম্য হলেই কয়েক শত ফিট নিচে গড়িয়ে পড়তাম। আমার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না। যাই হোক ভগবৎকৃপায় বেঁচে গেলাম। পায়ের তলা থেকে সেই বিরাট পাথর খণ্ডটি গড়িয়ে নিচে একটা গাছের গায়ে লেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমার বুক কেঁপে উঠল। ভাবলাম—পড়লে আমারও অবস্থা ওইরকম হত। দেবচৈতন্যজী আমাকে বললেন: সাবধানে নামুন। পাথর গড়িয়ে পড়লে—নিচে হয়তো পাহাড়ী মেয়েরা ঘাস কাটছে—তাদের গায়ে পাথর লাগলে মৃত্যু অবধারিত। আমার ভয় হতে লাগল—ওই পাথরের টুকরো কারোর গায়ে লাগেনি তো! নিচে থেকে কোন করুণ আর্তনাদের আওয়াজ শোনা গেল না। অবশ্য অত উপর থেকে শোনাও সম্ভব নয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, কারোর গায়ে যেন পাথরের টুকরো না লাগে।

আমাদের মধ্যে পথপ্রদর্শক ছাড়া আর-একজন বৃদ্ধ ছিলেন। পথপ্রদর্শকের চেয়ে তাঁর বয়স কিছু কম। তিনি কিছুটা স্থূলকায়। খাড়াই-এ নামতে নামতে তিনি কয়েকবার পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিয়েছেন। তবে তাঁর মনের জোর খুব। তরুণদেরও হার মানায়। প্রচণ্ড উৎসাহ। সদা হাস্যমুখ। পথপ্রদর্শক সাধুটি সবার থেকে বয়সে বড়। তবু তিনি রাস্তায় আমাদের খাওয়ার জন্য ফ্লাস্ক ভর্তি কফি, বাদাম, ডালমুট, রাস্ক বিস্কুট প্রভৃতি কাঁধে করে বহন করছিলেন সারাটা পথ। একহাতে ছাতা, আর কাঁধে ওই সব জিনিস-ভর্তি ঝোলা। পথ চলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে, তবু মুখে সদা হাসি। তাঁরও প্রচণ্ড উৎসাহ। কোন বাধাকে পরোয়াই করেন না। তাঁর উৎসাহেই এই বেপথের আমাদের অভিযান।

অজানা পথে এইভাবে নামতে নামতে হঠাৎ আমরা একটা রাস্তার উপর এসে পড়লাম। সেখান থেকে দেখা গেল বিমলেশ্বরজীর মন্দির। 'জয় বাবা বিমলেশ্বরজী কি জয়' বলে আমরা আনন্দে জয়ধ্বনি দিতে লাগলাম।

বিমলেশ্বর-মন্দিরে পৌঁছালে ওখানকার একজন গ্রামবাসী আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা খাড়া পাহাড় থেকে সোজা নেমে পড়লেন যে! রাস্তা ভুল করে কি এভাবে এলেন? উত্তরে আমরা বললাম: না, এমনি। অজানা পথে চলতে ভাল লাগে, তাই এভাবে এলাম। তিনি আর কিছু বললেন না। শুধু আমাদের মুখের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। হয়তো ভাবলেন—বিপদসঙ্কুল পথে চলতে ভাল লাগে—এতো বড় অদ্ভুত কথা!

মন্দিরে পৌঁছিয়ে আমাদের সঙ্গে-আনা গঙ্গাজল, বেলপাতা, ধূপ দিয়ে বাবা বিমলেশ্বরজীকে পূজা ও প্রার্থনা করলাম। কিছু সময় পরে মন্দিরের বাইরে এলাম। মন্দির সংলগ্ন যজ্ঞবেদীর পাশে এক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী বসে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলে আমরা তাঁকে নমস্কার করলাম। তিনিও প্রতি-নমস্কার করলেন। তিনি ঠাণ্ডা জল পান করালেন আমাদের। আমরাও পথশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঠাণ্ডা জল পান করে পরিতৃপ্ত হলাম।

উত্তরকাশী সাধুসমাজের অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিমলেশ্বর শিবজীর মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে। অনেকদিনের পুরানো। তবে কত বছর আগের তৈরি তা তিনি সঠিক জানেন না বলে আমাদের জানিয়েছিলেন। বিমলেশ্বরজীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি তাঁর নিজের জীবনের একটি ঘটনা আমাদের বলেছিলেন:

শিবচতুর্দশী উপলক্ষে বিমলেশ্বর শিবজীকে পূজা দিতে তিনি গিয়েছিলেন। সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসিব্রহ্মচারী ছিলেন। পূজান্তে তাঁরা শিবমহিম্নঃস্তোত্র সমবেত কণ্ঠে পাঠ করছিলেন। এমন সময় শিবলিঙ্গের পাশ থেকে একটি বড় কালো সাপ বেরিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। তাঁরা আবিষ্ট হয়ে স্তোত্র পাঠ করছিলেন, সাপের দিকে দৃষ্টি পড়লেও তাঁদের মনে কোন ভয়ের সঞ্চার হয়নি। পাঠশেষে সাপটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তাঁদের মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। তাঁদের ধারণা হয়, সাক্ষাৎ শিবজী শিবমহিম্নঃস্তোত্র শোনার জন্য সাপের রূপ ধরে বেরিয়ে এসেছিলেন।

প্রত্যেক বছর শিবচতুর্দশী উপলক্ষে এখানে বহু ভক্ত নরনারী পূজা দিতে আসেন। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস বিমলেশ্বর শিবজী খুব জাগ্রত। তারা এই মন্দির খুব প্রাচীন বলে দাবী করে। মন্দিরটি বিভিন্ন সময়ে কোন কোন ধর্মপ্রাণ মহান্ ব্যক্তির দ্বারা সংস্কৃত হয়েছে।

যজ্ঞবেদীর কাছে উপবিষ্ট সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীর নাম স্বামী অদ্বৈতানন্দ। তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-সম্প্রদায়ের। বয়স মনে হল চল্লিশের মতো। গ্রামবাসীদের কাছে শুনলাম, তিনি ১৬ ডিসেম্বর পৌষসংক্রান্তির দিন কুটিয়ার ভিতর চলে যাবেন। অনেকদিন আর বাইরে বেরুবেন না। আরও শুনলাম, তিনি কয়েক মাস আগে একাদিক্রমে ২০ দিন একাসনে বসে কিছু না খেয়ে ধ্যানস্থ ছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে দেবতার মতো দেখে। তারা মন্দিরের সব কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। তাঁর খাবার গ্রাম থেকে কুটিয়ায় বয়ে দিয়ে যায়। উত্তরকাশীর অনেক সাধু তাঁকে সম্ভ্রমের চোখে দেখেন, আবার কেউ কেউ বিদ্রূপ কটাক্ষও করেন। যাই হোক, এই স্বল্পভাষী সৌম্যদর্শন মহাত্মাকে আমাদের ভাল লেগেছে।

আবার পাহাড়ী রাস্তা না ধরে বেপথে আমরা নেমে পড়লাম। অজানা পথ। 'সন্ন্যাসীর গীতি' থেকে আবৃত্তি করতে করতে চলতে লাগলাম। বিকেল হয়ে এল। সমতল দেখে এক জায়গায় আমরা পাঁচজনে বসে পড়লাম। পথপ্রদর্শক স্বামীজী কফি, বিস্কুট, বাদাম প্রভৃতি যেগুলি এতটা পথ বয়ে আনছিলেন, এবার সে-গুলির সদ্ব্যবহার করা হবে। তাঁর কাঁধের বোঝাটাও খালি হবে বলে তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। এতটা চড়াই-উতরাইয়ের পথ দশ কেজির মতো ভারী জিনিস বহন করা আরামদায়ক মোটেই নয়। যিনি বহন করেন তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন। স্থূলকায় সাধুটি সন্ধ্যার পূর্বে পৌঁছানোর জন্য তাড়াতাড়ি আমাদের খেতে বলছিলেন। তাঁর ভয়—বাঘ-ভালুকের জঙ্গল! তার উপর আবার সেই বদমেজাজী ষাঁড়টি ঘুরে বেড়াচ্ছে! কখন যে কোথা থেকে আমাদের উপর চড়াও হবে তার ঠিক নেই। সদা সন্ত্রস্ত—চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি। কফি ও অন্যান্য জিনিস খাওয়ার জন্য আমাদের সময় দিলেন মাত্র পাঁচ মিনিট। কিছুতেই তার বেশি সময় দেবেন না। এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে বার কয়েক আবার তাড়াও দিলেন তাড়াতাড়ি খাওয়ার জন্য। আমাদের মধ্যে একজন তাঁকে একটু রাগাবার জন্য বললেন: আপনি ষাঁড়ের ভয়ে আমাদের তাড়াতাড়ি খেতে বলছেন। আপনার এত ভয়! তাড়াতাড়ি খেয়ে কি আরাম হয়? গলায় যে বিষম লাগবে। তিনি অমনি ধমক দিয়ে বললেন। বাঘ অথবা ষাঁড় এলে কে কোথায় চোঁচা দৌড়িয়ে পালিয়ে যাবে তার ঠিক নেই! এখন মুখে খুব বড় বড় সাহসের কথা বলছে! সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। সন্ধ্যার আগে আমাদের উত্তরকাশীতে ফিরতেই হবে। আমরা আর তাঁকে রাগাবার সাহস পেলাম না। সুবোধ বালকের মতো তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। সন্ধ্যা হয়ে এলে বেপথে হাঁটা যাবে না। যদিও আমাদের কাছে টর্চলাইট আছে, তবু জঙ্গলের মধ্যে খাড়াই পাহাড় থেকে নামা অসম্ভব।

আমরা দ্রুত খাড়াই থেকে নামার চেষ্টা করলাম। ফলে স্থূলকায় মহাত্মাজী কয়েকবার পড়ে গেলেন। কোনরকমে লাঠি আর পাহাড়-গায়ের ঘাস ধরে নিচে গড়িয়ে পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেলেন। একবার পড়লে কয়েক শত ফিট নিচে। হাড়-গোড় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

খুব কষ্টে উত্তরকাশীতে আমরা সন্ধ্যা ৫½টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। সারাদিনের হাঁটা-হাঁটিতে আমাদের খুব খিদে পেয়েছে। এই সময় ভিক্ষে কোথায় পাওয়া যাবে? সত্রে সকালে ভিক্ষা দেয়। এখন কি করা যায়—ভাবছি আমি আর ব্রজেশানন্দ। এই চিন্তা বেশিক্ষণ আমাদের উদ্বিগ্ন করেনি। অভিজ্ঞ দুই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বিমলেশ্বরে যাওয়ার আগে থাকতে সব ব্যবস্থা করে গেছেন। বৃদ্ধ শুভ্রকেশী সন্ন্যাসী রান্নায় খুব সুদক্ষ। কুটিয়াতে এসেই তিনি খিঁচুড়ি চাপিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে খিঁচুড়ি রান্না হয়ে গেল। সারাদিনের হাঁটায় পেটে প্রচণ্ড খিদে, বাইরে ঠাণ্ডা পড়ছে। এই সময়ে গরম গরম খিঁচুড়ি খেতে দারুণ লাগছিল। খাওয়ার পর প্রফুল্লচিত্তে ব্রজেশানন্দ ও আমি দুজনে আমাদের কুটিয়ায় ফিরে এলাম।

রাস্তায় স্মরণ করতে করতে আসছিলাম আজকের তীর্থযাত্রার কথা। মনের আনন্দে পথে চলেছি। সহসা চিন্তাধারার ছেদ পড়ল। সাধু-মহাত্মাদেরই স্থান উত্তরকাশীতে বর্তমান জগতের আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। এই আধুনিকতার সংস্পর্শে এসে পাহাড়ী গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলির মনও দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আধুনিকতার সঙ্গে কি সহজ-সরলতার সহাবস্থান কখনও হতে পারে না?

মনে মনে

শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ-পুরস্কারে সম্মানিত যশস্বী লেখক। 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় সংযুক্ত খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক, গল্পকার, সাংবাদিক। কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সুপরিচিত।

আমার একাধিক বুদ্ধিজীবী বন্ধু ভূতে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তাঁদের বিলক্ষণ ভূতের ভয় আছে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন, কিন্তু অলৌকিক কিছু দেখাতে পারলে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করতে রাজি আছেন, এঁরা অনেকেই জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে, কিন্তু নিজের কোষ্ঠীর ছকটি এঁদের মুখস্থ। বুদ্ধিজীবীদের কথা বাদ দিচ্ছি, সাধারণ মানুষের কথাই ধরা যাক। আজকের দুনিয়ায় অধিকাংশ সাধারণ মানুষই এই মানা না-মানার আলো-আঁধারেতে বাস করেন। কোন্‌টা কুসংস্কার, কোন্‌টা ধর্ম, কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য, কোন্‌টা অলৌকিক আর কোন্‌টা ঈশ্বরপ্রেম সে বিষয়ে তাঁদের ধাঁধা এবং বিভ্রান্তি বেশ প্রকট।

যাঁরা নাস্তিক তাঁরাও নমস্য! এঁরা জ্ঞানের কথা বলেন, জ্ঞানীর ভান করেন। কিন্তু কথা হল, জ্ঞানী হওয়া কি সোজা? ঈশ্বর শুধু বাইরে নেই, অন্তরেও—একথাটা যিনি বলবেন তাঁকে তো দুনিয়া হাঁটকে-মাটকে, সৃষ্টিরহস্য ভেদ করে সব কিছু জানার পর বলতে হবে, আমি সব জানি, সব দেখেছি, তারপর বলছি যে, ঈশ্বর আমাতেই, এখানেই—সর্বত্র সকলের মধ্যে, ভালতে মন্দতে। প্রকৃত জ্ঞানীকে সর্বজ্ঞ হতেই হবে, হতেই হবে ত্রিকালদর্শী। প্রকৃত জ্ঞানী তাই প্রকৃতই প্রণম্য, তাঁদের কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তাঁদের নিয়ে, যাঁরা নিজেরাই সহস্র সমস্যায় জড়িয়ে—অথচ জ্ঞানীর মতো ভাব দেখিয়ে চলেন ফেরেন। এঁরা কিন্তু নিজেদের নাস্তিক ভেবে গর্বিত!

সমস্যা দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত মানুষকে নিয়ে, যাঁরা মুখে বলেন, এটা মানি না, ওটা স্বীকার করি না, তমুকটা কুসংস্কার। অথচ মুখে বললেও ভিতরে ভিতরে তাঁদের একটা ভয়, অস্বস্তি, মানার ইচ্ছা ও দুর্বলতা থেকেই যায়।

এছাড়া আর একদল আছেন যাঁরা আস্তিকও নন, নাস্তিকও নন, এঁরা অকৌতূহলী, প্রশ্নশূন্য, ঈশ্বর নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, তাঁদের মাথা ব্যথা নেই, ঈশ্বর থাকতে পারেন, না থাকতেও পারেন, তাঁদের কোন কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

এই সমাজেই আবার পাশাপাশি আর-এক প্রবণতা লক্ষ্য করি, সেটা গুরুবাদের ব্যবসা, গড বিজনেস। কিছু মানুষ হঠাৎ গায়ে গুরুর তকমা লাগিয়ে আবির্ভূত হন, নিজেদের ঈশ্বরপ্রতিম—ঈশ্বরপুত্র—স্বয়ং ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেন এবং তা প্রমাণ করতে চটজলদি লেগে যান নানা অলৌকিক কাণ্ড প্রদর্শন করতে। এই নিয়ে লেগে যায় গুরু বা গডম্যানদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও। সাধারণ মানুষের ধারণা জন্মাতে থাকে যে, ধর্ম মানেই হচ্ছে অলৌকিক, অঘটন, ভূতুড়ে কাণ্ডমাণ্ড। এইসব প্রবণতা প্রকৃত ধর্মের পথ থেকে মানুষকে বহুদূর ভ্রষ্ট করে দেয়, মায়ামৃগের হাতছানি তাকে নিয়ে যায় নানা আঘাটায় নাকানি চোবানি খাওয়াতে।

কিছুকাল আগে অযোধ্যায় এক সাধুর আশ্রমে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কয়েকজন বাঙালী শিষ্যের সঙ্গে আমি একই ঘরে অবস্থান করি। তাঁরা প্রায়ই গুরুর মহিমা কীর্তন করতেন। আমি মন দিয়ে শুনতাম এবং বুঝবার চেষ্টা

করতাম তাঁদের গুরুর জীবনদর্শন কী। কিন্তু তিনদিন ধরে তাঁরা যে আলোচনা করলেন তা সবই ছিল গুরুদেবের নানা অলৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ড। কাকে কীভাবে তিনি কোন্ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন তারই বিবরণ। গল্পগুলো আমি একটুও অবিশ্বাস করিনি, প্রকৃত সাধকদের মধ্যে কিছু ক্ষমতা জন্মায় একথা আমি জানি। কিন্তু সেই ক্ষমতার উপরে তাঁরা নির্ভর করেন না বা সেই ক্ষমতার ভিতর দিয়ে তাঁকে চেনা যায় না। প্রেম এবং জ্ঞানই সেই দুই মহা অলৌকিক যার ভিতর দিয়ে সাধুকে চিনতে হয়। ওই শিষ্য-কতিপয়ের সঙ্গে তিনদিন আলোচনার পরেও আমি যখন বুঝে উঠতে পারলাম না যে, তাঁদের গুরুদেবের প্রচারিত আদর্শ কী, তখন একদিন তাঁদের বললাম, আপনাদের গুরুদেব ক্ষমতাবান মানুষ, তিনি আপনাদের বিপদে আপদে সদা রক্ষা করেন এও বুঝলাম। এখন বলুন যিনি গুরু হয়েও শিষ্যদের এত সেবা করছেন তাঁর জন্য তাঁর শিষ্যরা কী করেছেন? তাঁর আদেশ বা উপদেশ আপনারা কতটা প্রতিপালন করেন? বলা বাহুল্য এসব প্রশ্নের সদুত্তর পাইনি। এঁদের উপাস্য দেবতা রামচন্দ্র, আশ্রমে রামসীতার বিগ্রহই পূজা হয়। আমি জানতে চেয়েছিলাম, আপনারা কি বর্ণাশ্রম মানেন? তাঁরা বললেন, না, আমরা ওসব মানি না। অসবর্ণ বিয়ে? তাঁরা জবাব দিলেন, ওতে ওঁদের কোনও বাধা নেই। তখন আমি বললাম, আপনারা যাঁর উপাসক সেই রামচন্দ্র কিন্তু বর্ণাশ্রম মানতেন। ভক্ত শম্বুক বর্ণাশ্রম ভেঙেছিলেন বলে রামচন্দ্র তাঁকে হত্যা করতে দ্বিধা করেননি। তাহলে আপনারা মানেন না কেন? এ প্রশ্নেরও সদুত্তর মেলেনি।

আসলে এখানেও সেই দ্বিধা, সেই আলো-আঁধারি, শুধু সাধারণ মানুষকে দোষ দিয়ে কী হবে? এই দ্বিধার দোলাবলে আমাদের গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র এবং প্রশাসনও দোদুল্যমান নয়? খবরের কাগজে প্রায়ই গণ-বিবাহের কথা পড়ি, সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে অসবর্ণ বিবাহের পাত্র-পাত্রীকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা থাকে, পড়ে শঙ্কিত হই। এই রাষ্ট্রনেতারাই তো কথায় কথায় গীতার বাণী স্মরণ করেন এবং গীতাকে অনুসরণ করার কথা বলেন; আশ্চর্য এই গীতায় স্বয়ং ভগবান যে চতুর্বর্ণ তাঁরই সৃষ্ট বলে ঘোষণা করেন এবং বর্ণসংকর সৃষ্টির বিরুদ্ধাচরণ করেন।

কালপ্রাচীন প্রথাপ্রকরণের মধ্যে অনেক ময়লা জমে উঠতেই পারে, কিন্তু তা বলে গোটা প্রথাটাকেই বর্জন বা পরিহার এক হঠকারী অবিমৃষ্যকারিতা। কারণ ওই প্রথার সৃষ্টি যে মৌলিক শ্রেণীবিভাগের উপর তা উৎখাত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গোটা প্রকৃতির মধ্যেই প্রকট রয়েছে ওই শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণীবৈশিষ্ট্য এবং তাদের বিভিন্ন উপযোগ। গুণ এবং কর্ম অনুসারে মানুষের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাজন হয়েছিল তার মধ্যে অবৈজ্ঞানিক কিছু নেই। বরং সেটিকে জোর করে উড়িয়ে দিয়ে “মানুষ সব সমান” গোছের ফতোয়া জারি করাটাই অবৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবিরোধী। তবে বর্ণাশ্রমকে কেন্দ্র করে যে স্বার্থের লড়াই বা মানুষকে অবদমিত রাখার চক্রান্ত ও প্রয়াস বড় হয়ে উঠেছিল সেই ময়লাটুকুর অপসারণ বড় দরকার। আর সেই জরুরী কাজটুকু হয়নি বলেই এখনও ভারতবর্ষে ধর্ম নিয়ে, শ্রেণীভেদ নিয়ে, ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে এত বাদ-বিবাদ, এত দাঙ্গা ও নরমেধ। বামুন কায়েত শূদ্রে বিয়ে দিলেই কি সব চুকে যাবে? না কি সবাইকে পঙ্‌ক্তিভোজনে বসিয়ে দিলেই জাতপাতের গোঁড়ামির অবসান ঘটবে? আমাদের সরকারের বা প্রশাসনের কাজে ব্যাপারটা বোধ হয় তত স্বচ্ছ নয়।

ধর্মের গোড়ার কথায় একজন ব্যক্তি-ঈশ্বর নন, —সকল জীবের আত্মা পরম ঈশ্বর—অস্তি-ভাতি প্রিয়ই সেখানে মুখ্য। ঈশ্বরকে বুঝি বা না বুঝি, আমরা যে আছি, এটা বুঝি সবাই—এবং এই বুঝা বা জানাটা সকলেরই প্রিয়। এই অস্তিত্ব, অস্তিত্ববোধ এবং আনন্দময় অস্তিত্ব—এটাই তো আমাদের সকলেরই কাম্য। বৃদ্ধি, উন্নতি আমরা চাই—ওই অস্তিত্বের, বোধের ও আনন্দের। আর সেই বৃদ্ধিকে অবাধ করতে গেলে যে-আচরণ অবশ্যপালনীয়, তাকেই বলি ধর্ম।

একা তো কেউ বাঁচে না, তার বাঁচার উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে তার পারিপার্শ্বিক থেকে, সমাজ বা রাষ্ট্রের বাতাবরণের ভিতর থেকে। পারিপার্শ্বিক না বাঁচলে মানুষই বা বাঁচবে কিসের নির্ভরতায় ? তাই নিজের স্বার্থেই মানুষকে ওই পারিপার্শ্বিকের সেবা করতে হয়। সেই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তু সব কিছুই আছে। আর জীবসেবা তাই হয়ে ওঠে শিবসেবা, সেটাই শ্রেষ্ঠ ধর্মলক্ষণ। শুধু পরের উপকার করাই তো নয়, তাতে যে নিজেরই উপকার। পাড়ার ছোঁড়াগুলো আড্ডাবাজ, খারাপ কথা বলে, নানা কু-অভ্যাসের দাস আর তাদের সঙ্গে মিশে আমার ছেলেটাও গোল্লায় যাবে—এই আশঙ্কায় কোনও পিতা যদি নিজ পুত্রকে রক্ষা করতে ওই পাড়ার ছেলেদেরও সৎপথে ফেরানোর চেষ্টা করেন, তবে সেটা ধর্মও হল, কর্মও হল, আর এই নেশা যদি একবার পেয়ে বসে, তবে মানুষ ক্রমে ক্রমে বৃহৎ জগৎ-সংসারের চিন্তায় অগ্রসর হতে থাকে। বাণপ্রস্থ বা ব্রহ্মভাবনা যাই বলি না কেন দুইয়েরই অর্থ বৃহৎ বা বিস্তারের দিকে যাওয়া। নিজের চতুষ্পার্শ্বের সমাজ সংসারের ভালর জন্য কিছু না করে কখনই ওই বৃহতের দিকে যাওয়া যায় না।

কিন্তু সে অনেক বড় কথা। ছোটো কথায় বলি, ধর্ম হল ভালবাসা। ভালবাসা কথার অর্থ যাকে ভালবাসি তার ভালতে বাস করি। ছোট্ট কথা বটে, কিন্তু তলিয়ে ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। আজকাল তো দেখি স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে ভুলভাবে ভালবাসছে। সংসারে শান্তি নেই তাই, মা-বাবা যে ভালবাসছে পুত্র-কন্যাকে তার মধ্যে থেকে যাচ্ছে কত ভুল। মা-বাপের সঙ্গে ছেলেমেয়ের বাড়ছে প্রজন্মগত ব্যবধান। বন্ধুতে বন্ধুতে ভালবাসাবাসি ? তাই আর সেরকম টিকে থাকছে কই ? আস্তে আস্তে বুঝি ভালবাসাটাও উবে যাচ্ছে দুনিয়া থেকে।

তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাত-কাপড় নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান নয়, টাকা-পয়সা নয়, বিংশ শতাব্দীর মানুষ দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে ওই একটা জিনিসেই, ভালবাসা।

ঠাকুর আমাদের রক্ষা করুন।

প্রথমে অজ্ঞান এবং যাহা কিছু মিথ্যা তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সত্যের প্রকাশ হইবে। যখন আমরা সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিব, তখন প্রথমে আমরা যাহা কিছু ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আর একরূপ ধারণ করিবে, নূতন আকারে প্রতিভাত হইবে, তখন সবই—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই —ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে, তখন সবই উন্নত ভাব ধারণ করিবে, তখন আমরা সকল পদার্থকে নূতন আলোকে বুঝিব।

—স্বামী বিবেকানন্দ

আণ্টার্কটিকা অভিযান

ডক্টর সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

প্রখ্যাত ভূতাত্ত্বিক, প্রথম বাঙালী তথা অন্যতরা ভারতীয় মহিলা যিনি সম্প্রতি পৃথিবীর তলদেশে হিমময়ী দুর্জ্ঞেয় কুমেরুতে ভারতীয় অভিযানে অংশ নিয়েছেন। পর্বতাভিযানেও খ্যাতকীর্তি—হিমালয়ের 'রটি' প্রভৃতি অভিযানে সফল যাত্রী। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'ললনা' অভিযানের সহনেত্রী—হিমালয়ের এক অজেয় অনামী শৃঙ্গ (২০,১০০ ফিট) জয়ের গৌরব অর্জনকারিণী। লণ্ডনের ইম্পিরিয়েল কলেজে রয়েল কমিশনের প্রাক্তন ফেলো। সুইডেনের উপাসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা। স্কটিশ হাইল্যাণ্ড, স্পেন, সুইডেন ও নরওয়ের আর্কটিক অঞ্চলে ভূতত্ত্বের গবেষিকা। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়াতে প্রাক্তন বিজ্ঞানী। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব-বিভাগে অধ্যাপিকা। সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুশিল্পে সুকুশলা—বিশিষ্ট লেখিকা।

পৃথিবীর একেবারে দক্ষিণ কোণায় যে এক বিশাল মহাদেশ লুকিয়ে আছে সেকথা গ্রীকেরা কল্পনা করেছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির যুগেই। এই মহাদেশের নাম দিয়েছিলেন তাঁরা আণ্টার্কটিকোস—যার অর্থ হল সপ্তর্ষিমণ্ডলের বিপরীতে। দক্ষিণের এই মহাদেশ থেকে উত্তর আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যাবে না বলেই এই নামকরণ। তারপর বহু শতাব্দী কেটে গেছে এই মহাদেশকে জানতে। দুঃসাহসী নাবিক ক্যাপটেন জেমস কুক ১৭৭২ থেকে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ এই মহাদেশ আবিষ্কারের আশায় বরফ-জমা দক্ষিণ সমুদ্রে অভিযান চালিয়েছেন। কিন্তু প্যাক্ আইসের দুস্তর বাধা ভেদ করে আণ্টার্কটিকাতে পৌঁছতে পারেননি। তবে আণ্টার্কটিকা মহাদেশ পরিক্রমা করে তিনি প্রমাণ করলেন যে, যদি কোন মহাদেশ থেকেও থাকে দক্ষিণ মেরুতে তার সঙ্গে উত্তরের ভূখণ্ডের কোন যোগ নেই। তিনিই প্রথম কুমেরু বৃত্ত অতিক্রম করেছিলেন।

জেমস কুক দক্ষিণ সমুদ্রে তিমি আর সীলের প্রাচুর্যের কথাও উল্লেখ করেছিলেন; ফলে ইওরোপ ও আমেরিকা থেকে দলে দলে তিমি-শিকারীর দল পাড়ি জমাল দক্ষিণ সমুদ্রে। এমনই এক তিমি-শিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাথানিয়েল পামার ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে দাবী জানান যে, তিনি মূল মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন। একই খ্রীষ্টাব্দে রুশ অভিযাত্রী ভন বেলিংসহাওসেন ও ব্রিটিশ অভিযাত্রী জন ব্র্যান্সফিল্ড একই দাবী জানান। আজ সঠিক জানা মুশকিল তাঁরা সত্যিই মূল ভূখণ্ড দেখেছিলেন, অথবা বরফে ঢাকা কোন দ্বীপের অংশকেই মূল মহাদেশ ভেবে ভুল করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই শুরু হল একের পর এক অভিযান। এই সময় বেশ কয়েকটি অভিযান হয় আণ্টার্কটিকাতে। তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানগুলি পরিচালিত হয় এই দুর্গম মহাদেশে। ধীরে ধীরে এই মহাদেশের নানান অংশ আবিষ্কৃত হল—বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংকলিত হল। পাল-তোলা জাহাজে চেপে এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা যে মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছেন, নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেও, তার মূল্য আজও আণ্টার্কটিকা অভিযানের ইতিহাসে অনন্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার এই অংশকে তাই বলা হয় আণ্টার্কটিকা অভিযানের 'হিরোয়িক পিরিয়ড'। স্কটের ডিসকভারি ও টেরানোভা অভিযান, আমুণ্ডসেনের ফ্রামহাইম অভিযান, শ্যাকলটনের নিমরোড

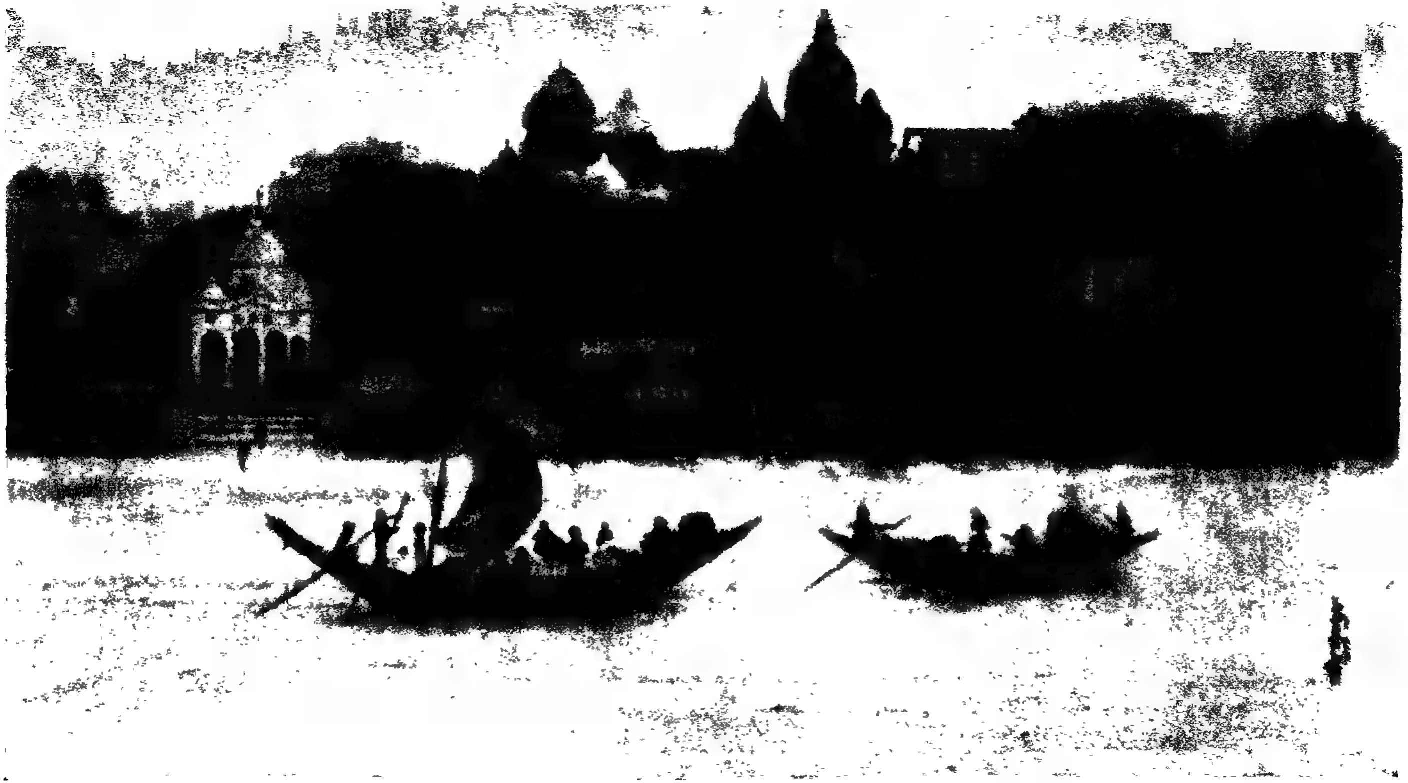

এপারে বরাহনগর ওপারে বেলুড়। বর্ষাকাল। সবে বৃষ্টি হয়ে গেছে। গঙ্গায় গেরুয়া জল। বরাহনগরের ঘাটে বসে আঁকা। সিল্কের ওপর জলরঙের ওয়াশ। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু যে ধারার প্রবর্তক, সেই ধারায় অঙ্কিত 'বর্ষণস্নাত বেলুড় মঠ'।

শিল্পী : শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

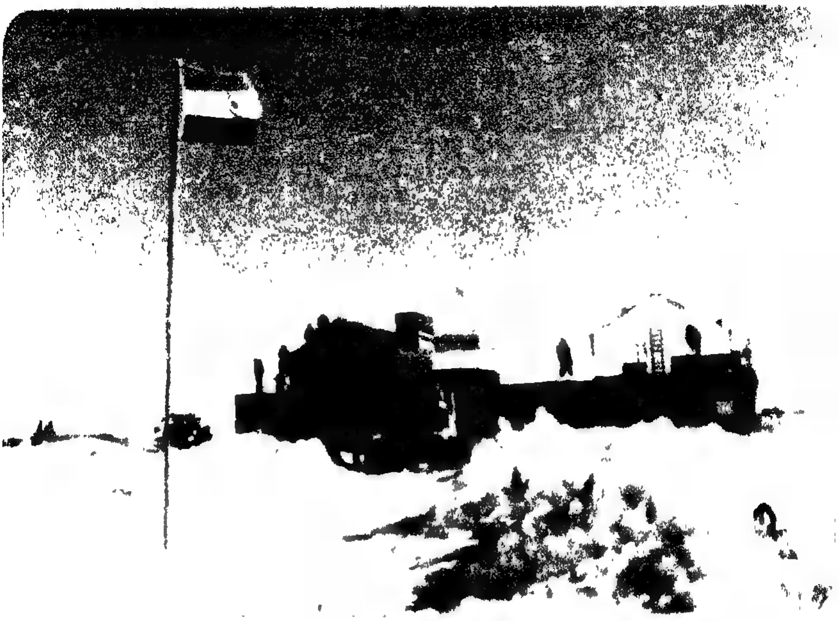

আণ্টার্কটিকার 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী'-তে ভারতীয় স্থায়ী গবেষণা-কেন্দ্র

আন্টার্কটিকায় সূর্যাস্ত

আলোকচিত্রী : সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

ও অরোরা অভিযান এই সময়েই হয়েছে। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর আমুণ্ডসেন দক্ষিণ মেরুতে ওড়ালেন নরওয়ের জয়পতাকা। স্কট একমাস পরে পৌঁছলেন সেখানে তাঁর চারজন সঙ্গী নিয়ে। আমুণ্ডসেন সুস্থদেহে সদলবলে ফিরে এসেছেন কিন্তু স্কট ও তাঁর সঙ্গীদের প্রাণ দিতে হয়েছিল প্রতিকূল প্রকৃতির কাছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আণ্টার্কটিকা অভিযানের রূপও পালটাতে লাগল। এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার, আইসব্রেকার জাহাজ, স্নোট্রাক্টর আর নানান রকম আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হতে লাগল প্রতিকূল প্রকৃতিকে জয় করার জন্য। একটি দুটি উৎসাহী ব্যক্তির পরিবর্তে সরকারী ব্যবস্থাপনায় অভিযান পরিচালনা হতে শুরু হল। ১৯৫৭—৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বছরে আণ্টার্কটিকাতে বিশদ সমীক্ষা করার কর্মসূচী নিয়ে বারোটি দেশ সেখানে স্থায়ী গবেষণাগার স্থাপন করল। এই সম্মিলিত গবেষণার ফল এত ভাল পাওয়া গেল যে, আণ্টার্কটিকাকে বিজ্ঞানের মহাদেশ বলে চিহ্নিত করে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে আণ্টার্কটিকা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তির বলে আণ্টার্কটিকাতে কোন দেশের মালিকানা গ্রাহ্য করা হবে না, এই মহাদেশে কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণাই চলবে, কোনরকম মিলিটারি কার্যকলাপ চলবে না, আণ্টার্কটিকার প্রাণী ও পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় এমন কিছু করা সেখানে বারণ। আর্জেন্টিনা, চিলি, ব্রিটেন, নরওয়ে, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান, সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল মূল স্বাক্ষরকারী। ক্রমে ক্রমে এই চুক্তিতে যোগ দিয়েছে পোল্যাণ্ড, স্পেন, পূর্ব জার্মানি, ব্রেজিল, ভারত ও চীন।

ভারতবর্ষ আণ্টার্কটিকা গবেষণায় যোগ দেয় ১৯৮১—৮২ খ্রীষ্টাব্দে। ডক্টর সৈয়দ জহুর কাশিমের পরিচালনায় প্রথম অভিযান হয়। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জানুআরি আণ্টার্কটিকা মহাদেশে প্রোথিত হল ভারতীয় পতাকা। ১৯৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরায়নার নেতৃত্বে হল দ্বিতীয় অভিযান। এই অভিযানে ভারতীয় স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র বানাবার প্রাথমিক সমীক্ষা চালানো হয়। ১৯৮৩—৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় অভিযান হয় ডক্টর হর্ষ গুপ্তার নেতৃত্বে। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ছাড়াও এই অভিযানের প্রধান দায়িত্ব ছিল একটি স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের। আর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সক্রিয় উৎসাহে দুজন মহিলা বিজ্ঞানীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হল তৃতীয় অভিযাত্রী দলে। ন্যাশনাল ইন্‌স্টিট্যুট অফ ওশেনোগ্রাফির মেরিন বায়োলজিস্ট ডক্টর অদিতি পন্থ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি ভূতত্ত্ববিদ্ হিসাবে নির্বাচিত হলাম।

তৃতীয় অভিযান শুরু হল ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর গোয়ার মার্মাগাও বন্দর থেকে। দলে ছিল একাশীজন সদস্য। আর্মির কোর অফ ইঞ্জিনিয়র্স-এর আটত্রিশজন, তাঁদের দায়িত্ব স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্রটি বানানোর। নেভী ও এয়ারফোর্স থেকে এসেছে তেরজন করে সদস্য। তাদের দায়িত্ব কুমেরু অঞ্চলে হেলিকপ্টারের সাহায্যে অভিযাত্রী ও অভিযানের মালপত্র পৌঁছে দেওয়া। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য ছিলেন ষোলজন বিজ্ঞানী ও ডকুমেণ্টারি ফিল্ম তোলার জন্য একজন ক্যামেরাম্যান। ফিনল্যাণ্ড থেকে আইসব্রেকার জাহাজ ফিনপোলারিস ভাড়া করা হল। ভারতীয় সদস্য ছাড়া জাহাজের অফিসার ও কর্মী ছিলেন আটাশজন। ১০ ডিসেম্বর মরিশাস পৌঁছুই।

সেখানে চারদিন থাকা হয় কিছু খাদ্যসামগ্রী, খাবার জল ও কিছু যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার জন্য। ১৪ ডিসেম্বর শুরু হয় আবার সমুদ্রযাত্রা। এবারে আণ্টার্কটিকাতেই পৌঁছে হল যাত্রা শেষ।

গর্জনশীল চল্লিশাতে খুব একটা ঝড়-জলের সম্মুখীন হতে হয়নি, কিন্তু তারপর থেকেই শুরু হল প্রবল ঝড়। পঞ্চাশ ও ষাট ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর বিশেষ কোন ভূখণ্ডের বাধা না থাকাতে এই অংশের সমুদ্র সদাই উত্তাল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। আমাদের জাহাজখানা পাঁচদিন ধরে সেই উত্তাল সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে প্রবেশ করল প্যাক আইসের সীমানায়। তখন সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য। যেদিকে দু-চোখ যায় কেবল ভাঙা বরফের রাশি। আণ্টার্কটিকাকে ঘিরে রয়েছে এই দক্ষিণ সমুদ্র—ভারত, প্রশান্ত ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ অংশ। বছরের বেশির ভাগ সময়ই এই দক্ষিণ সমুদ্রের উপরিভাগ জমে বরফ হয়ে থাকে। এই সামুদ্রিক বরফ সাধারণত তিন-চার মিটার পুরু হয়। গ্রীষ্মকালে এর কিছুটা অংশ ভেঙে সমুদ্রের স্রোতের টানে উত্তরে চলে আসে। পরের শীতে আবার এই ভাঙা টুকরোগুলি নতুন করে জমে যায়। আণ্টার্কটিকাকে ঘিরে এই জমে যাওয়া ভাঙা সামুদ্রিক বরফের এক বলয় তৈরি হয়। এই অঞ্চলকেই বলা হয় প্যাক আইস। কুমেরু অঞ্চলে প্রবেশের প্রধান বাধাই হল এই প্যাক আইসের বেড়াজাল।

২৬ ডিসেম্বর আমরা এই বেড়াজাল ভেদ করে পরিষ্কার নীল জলে এসে পড়লাম। অদূরে অক্ষত সামুদ্রিক বরফ—ফাস্ট আইস। ২৭ ডিসেম্বর আমাদের জাহাজ সেই ফাস্ট আইসে গিয়েই নোঙর করল। সেখানকার তিন মিটার পুরু বরফ কাটার ক্ষমতা আমাদের ফিনপোলারিসের ছিল না। সেখান থেকে মূল হিমসোপান তিন কিলোমিটার দূরে। পৌঁছনো মাত্র ছুটে এল পেঙ্গুইনের দল। আণ্টার্কটিকা ছাড়া অন্য কোথাও এই পেঙ্গুইনদের দেখা যায় না। কুমেরু অঞ্চলের পাঁচটি প্রজাতির মধ্যে প্রধান হল অ্যাডেলি ও এম্পেরর পেঙ্গুইন। এম্পেরর পেঙ্গুইন আকারে বড়, লম্বায় প্রায় সাড়ে চার ফুট। অ্যাডেলিরা লম্বায় আড়াই ফুট মতন হয়। এদের প্রধান খাদ্য হল দক্ষিণ সমুদ্রের চিংড়ি মাছ—ক্রিল। আণ্টার্কটিকার অন্যান্য প্রাণী—যেমন সীল এবং তিমিদেরও প্রধান খাদ্য এই ক্রিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই ক্রিলই হয়তো ভবিষ্যতে পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা সমাধান করবে। পেঙ্গুইন ছাড়া আণ্টার্কটিকাতে আরও দু-তিন ধরনের পাখি দেখা যায়। শিকারী পাখি স্কুয়া, যাকে বলা হয় আণ্টার্কটিকার বাজ, এদের মধ্যে প্রধান। পেঙ্গুইনের ডিম বা শিশু এবং ছোট পাখি পেট্রেলই এই শিকারী স্কুয়ার প্রধান খাদ্য। তবে আজকাল রিসার্চ স্টেশনের ধারেও এরা উড়ে বেড়ায় খাবারের লোভে।

আণ্টার্কটিকায় পৌঁছনোর দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল কর্মব্যস্ততা। মূল শিবির ও স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করে ফেলা হল প্রথম দিনেই। ২৮ ডিসেম্বর আটাশজন ইঞ্জিনিয়র ও জওয়ানদের একটি দল চলে গেল মূল শিবির স্থাপন করতে। স্নো ট্র্যাক্টরগুলিকে সামুদ্রিক বরফের উপর দিয়েই চালিয়ে নিয়ে মূল বরফভূমিতে রেখে আসা হল। জওয়ানদের একটি দল ও বিজ্ঞানীদের উপর ভার দেওয়া হল অভিযানের মালপত্র ও বাড়ি তৈরি করার সরঞ্জাম হেলিকপ্টারে বোঝাই করার। আশা ছিল সাতদিনের মধ্যেই এই মাল খালাসের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর বিজ্ঞানীরা নিজের নিজের সমীক্ষা শুরু করতে পারবেন। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল দুর্ঘটনা।

সমস্ত মালপত্র পাঠানো হচ্ছিল হেলিকপ্টারের

তলায় নেটে ঝুলিয়ে। বড় হেলিকপ্টার প্রতাপ এভাবে আড়াই টন মাল বহন করতে পারে। এভাবে মাল পাঠানোর ফলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হতে লাগল। আমরা একবারের মাল পাঠিয়ে হেলিকপ্টার ফিরে আসার আগেই দ্বিতীয় দফার মাল তৈরি করে রাখতাম। মূল শিবিরে গিয়ে হেলিকপ্টার নেট নামিয়েই ফিরে আসত। পরের বার আবার মাল নামিয়ে আগের বারের নেট ফেরত নিয়ে আসত। ততক্ষণে মূল শিবিরে ওরাও মাল নামিয়ে নেট খালি করে রেখেছে। উনত্রিশ তারিখও এভাবেই মাল নিয়েছিল প্রতাপ হেলিকপ্টার। প্রথম দফায় মাল পৌঁছনোর পর আবার দ্বিতীয় দফায় মাল নিয়ে উড়বার সময় জাহাজের ক্রেনের দড়িতে হেলিকপ্টারের রোটর ব্লেড গিয়ে ধাক্কা খেল। মুহূর্তের মধ্যে হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ল হিমশীতল জলে। আমরা নিরুপায় দর্শকের মতো জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখছি জানলা ভেঙে বেড়িয়ে আসবার চেষ্টা করছেন পাঁচজন আরোহী। নেভীর চেতক হেলিকপ্টার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে দড়িতে ঝুলিয়ে উদ্ধার করল একজনকে। বাকীদের রেসকিউ বোট নিয়ে উদ্ধার করা হল। হেলিকপ্টার ততক্ষণে তলিয়ে গেছে গভীর সমুদ্রে। এত ঠাণ্ডা জলে মানুষের পক্ষে আধঘণ্টার বেশি সময় বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমাদের সৌভাগ্য পাঁচজনকেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। একজনের চোট কিছুটা গুরুতর ছিল, তার সুস্থ হতে সপ্তাহ তিনেক লেগেছিল। বাকীরা কয়েকদিন বাদেই আবার কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

চোদ্দ মিলিয়ন পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের আন্টার্কটিকা মহাদেশের শতকরা আটানব্বই ভাগই দু-তিন কিলোমিটার পুরু হিমবাহে ঢাকা। হিমবাহের গভীরতা কোন কোন জায়গায় সাড়ে চার কিলোমিটারেরও বেশি। এই মহাদেশীয় হিমবাহে সঞ্চিত আছে পৃথিবীর আটাত্তর শতাংশ মিষ্ট জলের ভাণ্ডার। বর্তমানে আন্টার্কটিকা ছাড়া কেবলমাত্র গ্রীনল্যাণ্ডেই মহাদেশীয় হিমবাহ আছে। তবে তা আয়তনে আন্টার্কটিকার তুষারক্ষেত্রের দশভাগের একভাগ। এই ২৯,০০০০০ ঘন কিলোমিটার বরফের চাপে আন্টার্কটিকার ভূপৃষ্ঠ ৬০০ মিটার নিচে নেমে গেছে। যদি কোনদিন এই বরফ গলে যায় তবে সারা পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠ ৬০ মিটার বেড়ে যাবে, অর্থাৎ সমস্ত বন্দর প্লাবিত হয়ে যাবে।

১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুআরি আমরা পাঁচজন বিজ্ঞানী শির্মাকার পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। মূল শিবির স্থাপিত হয়েছে তীর থেকে ১৩ কিলোমিটার অভ্যন্তরে। আরও ৭০ কিলোমিটার ভিতরে এই শির্মাকার ওয়েসিস মাউণ্টেন রেঞ্জ অবস্থিত। ভারতীয়রা নাম দিয়েছেন দক্ষিণ গঙ্গোত্রী পর্বতমালা। চারিপাশের বরফের মধ্যে যখন ছোট একটি পর্বতশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তাকে বলা হয় ওয়েসিস মাউণ্টেন রেঞ্জ। এখানে যদি পাহাড়ের উচ্চতা হিমবাহের গভীরতা থেকে বেশি হয় তবেই তা বরফ ভেদ করে দৃশ্যমান হয়, ঠিক যেমন জলের মধ্যে মাথা তুলে থাকে দ্বীপ। শির্মাকার পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করাই আমাদের প্রধান কাজ। তিনজন ভূতত্ত্ববিদ—ডক্টর মদনলাল, রবীন্দ্র সিং ও আমি, জীববিজ্ঞানী প্রভু মাতোন্দকর ও ডক্টর অলক ব্যানার্জি, সেখানে তাঁবু করে একমাস থাকব। বাকীরা হয়তো দু-একদিন করে কাটিয়ে যাবেন, তবে তাঁদের প্রধান কাজ হয় মূল শিবিরে নয়, জাহাজে থেকেই।

ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রায় দু কোটি বছর আগে আন্টার্কটিকা গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড নামে

এক বিশাল মহাদেশের অংশ ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই বিশাল মহাদেশ ভেঙে তৈরি হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া আণ্টার্কটিকা ও ভারতবর্ষ। আণ্টার্কটিকার প্রাচীন যুগের পাথরের সঙ্গে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অন্যান্য মহাদেশগুলির পাথরের খুবই সাদৃশ্য। আণ্টার্কটিকাতে পাওয়া গিয়েছে কয়লার স্তর এবং গ্লসপটেরিস পাতার ফসিল যার ফলে প্রমাণিত হয় সেখানে এককালে ছিল উষ্ণ নিরক্ষীয় আবহাওয়া।

আমরা শির্মাকার পাহাড়ের পঁয়ত্রিশ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। একটি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করা ছাড়াও নানান নমুনা সংগ্রহ করে এনেছি ভারতবর্ষে ফিরে গবেষণাগারে পরীক্ষা করার জন্য। আমবা সাধারণত সকাল নটায় কাজে বেরোতাম, ফিরতে রোজই রাত নটা হয়ে যেত। জানুআরি মাসের প্রথম দিকে সেখানে চব্বিশ ঘণ্টাই দিনের আলো। ২৩ জানুআরি প্রথম রাত হল আধঘণ্টার জন্য। তারপর থেকে ধীরে ধীরে রাতের পরিধি বাড়তে লাগল। আমরা যখন মার্চ মাসে আণ্টার্কটিকা থেকে রওনা দিলাম তখন সেখানে ঘণ্টা তিনেকের মতো রাত হত।

প্রায় মাসখানেক বাদে শির্মাকার রেঞ্জের ফিল্ডওআর্ক সমাপ্ত করে আমরা ফিরে এলাম বেস ক্যাম্পে। সেখানে হিমবাহ গবেষণার কিছু কাজ করা হবে। তখন ফেব্রুআরি মাসের মাঝামাঝি। তাপমাত্রা অনেক নিচে নেমে গেছে। জানুআরি মাসের গড় তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ফেব্রুআরি মাসে প্রায়ই মাইনাস ২০ পর্যন্ত নামত। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সেই সময় তুষার-ঝড়ও অনেক বেশি হতে লাগল। জানুআরি মাসে ব্লিজার্ডের সংখ্যা ছিল মাত্র দুই। ফেব্রুআবি মাসে তিন-চারদিন পব পরই প্রবল ব্লিজার্ড শুরু হয়ে যেত, আব সেই ঝড় চলত পাঁচ-ছয়দিন ধরে। তবে সৌভাগ্যের কথা, তখন আমাদের গবেষণাকেন্দ্রেব বাইরের কাঠামো সম্পূর্ণ। ভিতরের কাজ ব্লিজার্ড হলেও চলতে থাকে।

২৪ ফেব্রুআরি ভাবতেব স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র "দক্ষিণ গঙ্গোত্রী"-র উদ্বোধন হল। ভারতীয় পতাকাব নিচে সব ধর্মের উপাসনা কবার পর দলনেতা ডক্টর হর্ষ গুপ্তা শীতেব অধিনায়ক কর্নেল সত্যস্বরূপ শর্মাব হাতে বাড়ির ভার অর্পণ কবলেন। ভাবতীয় ইঞ্জিনিয়ব ও জওয়ানদের অসীম অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতায়ই এই দুঃসাধ্য কাজ সম্পূর্ণ হল মাত্র দু-মাসে। গর্বের কথা এই যে, এখন পর্যন্ত আর কোন দেশ মাত্র দু-মাসে আণ্টার্কটিকাতে একটি স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র সম্পূর্ণ করতে পারেনি। দোতলা এই বাড়িটি দু-ভাগে ভাগ করা। একদিকে আছে গবেষণাগাব, সার্জাবি ও মেডিকাল রুম, লাউঞ্জ, লণ্ড্রি, বান্নাঘব, স্নো মেলটিং প্লাণ্ট ও বয়লার রুম। এই দিকের দোতলাতে আছে কমিউনিকেশন রুম, অফিস ঘর, ডার্করুম, শোবার ঘর, শাওয়ার এবং টয়লেট। অন্য ব্লকে আছে জেনারেটর রুম, নানা ধরনের ওআর্কশপ, জ্বালানী রাখার এক বিশাল ট্যাঙ্ক এবং গ্যারাজ। তার দোতলায় আছে স্টোর। সারা বছরের রসদ সেখানে জমা করা আছে। সারা বছরের জ্বালানী তেল রাখা হয়েছে বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরের ফুয়েল ডাম্পে। সপ্তাহে একদিন সেখান থেকে ড্রাম এনে বাড়ির ট্যাঙ্কে ভর্তি করে রাখতে হবে। বাড়িটি সম্পূর্ণ তাপনিয়ন্ত্রিত। ভিতরের তাপমাত্রা আরামদায়ক পনেরো ডিগ্রী সেলসিয়াস।

পেংগুইন—আন্টার্কটিকার খোদ অধিবাসী।

‘দক্ষিণ গঙ্গোত্রী’ পর্বতমালা—শির্মাকার রেঞ্জ।

আলোকচিত্রী ঃ সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

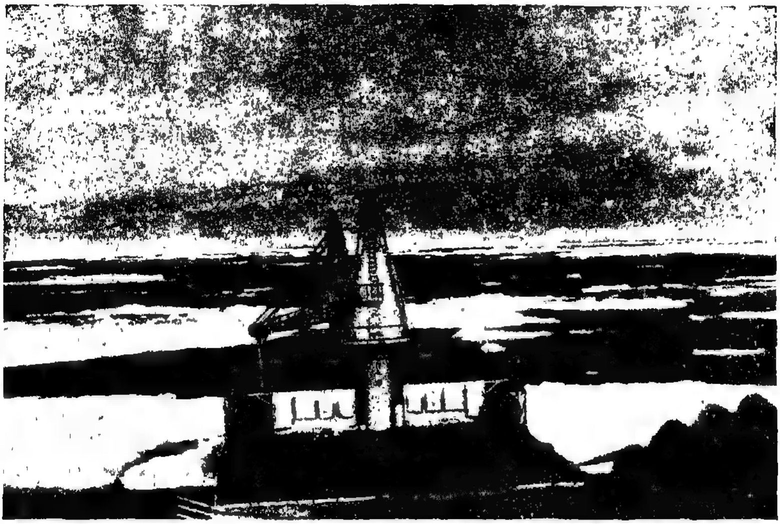

প্যাক আইসের বাধা ভেদ করে ফিনপোলারিস এগিয়ে চলেছে। দিগন্তে হিমশৈল।

বরফ-জমা সমুদ্র।

আলোকচিত্রী : সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

এছাড়া বাড়ির ঠিক মধ্যিখানে বসানো হয়েছে একটি গম্বুজ। এটির সাহায্যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব। এখান থেকে পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় টেলিফোন করা যায়, টেলেক্স পাঠানো যায়।

উদ্বোধনের পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল প্রবল তুষার-ঝড়। এবারের ঝড়ের দাপট সবচেয়ে বেশি, ঘণ্টায় দুশো কিলোমিটার বেগে হাওয়া চলছে, তাপমাত্রা মাইনাস ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং দৃশ্যমানতা শূন্য; তবে এবারে আমরা আর তাঁবুর মধ্যে বন্দী নেই, আমরা সবাই উঠে এসেছি নতুন গবেষণাকেন্দ্রের নিরাপদ আশ্রয়ে। ইঞ্জিনিয়রদের সুবিধেই হল যে, ফেরবার আগে ঝড়ের মুখে বাড়ির খুঁটিনাটি ব্যবস্থা কেমনভাবে কাজ করে সে-সম্বন্ধে আন্দাজ পাওয়া গেল, যাতে দরকার মতো ডিজাইনের অদলবদল করা যায়। আর কিছুদিন বাদেই বারোজন বাদে আমরা সবাই ফিরে আসব ভারতবর্ষে। শীতের দলের এই বারোজনকে এই বাড়িতে থেকেই কুমেরুর দীর্ঘ শীতের রাত্রির মোকাবেলা করতে হবে।

ঝড় আসল ২৮ ফেব্রুআরি। ততদিনে বাড়ির সামনে ঝড়ে উড়ে আসা বরফ জমে দোতলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। একতলার মূল দরজা দিয়ে বেরোনো অসম্ভব। আমরা দোতলার ইমার্জেন্সী দরজা দিয়ে সোজা বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে তখন ঝকঝকে সূর্যের আলো। আমাদের বরফে চলার গাড়ির প্রায় সবটাই ডুবে গেছে বরফে, বাড়ির চারপাশেও তখন একতলা সমান উঁচু বরফের রাশি। কুমেরুর বরফ একেবারে শক্ত জমাট বাঁধা। সেই বরফ পরিষ্কার করা বিশেষ সহজ কাজ নয়। দুটো গাড়িকে উদ্ধার করতে লেগে গেল প্রায় চার ঘণ্টা। প্রায় বিকেল চারটের সময় শীতের দলকে বিদায় দিয়ে আমরা বাকীরা ফিরে এলাম জাহাজে।

জাহাজ তখন মূল হিমসোপানে নোঙর করা। সামুদ্রিক বরফ সবই ভেঙে চলে গেছে। তবে আরও একটি শীত আসছে; তাই সমুদ্র আবার নতুন করে জমতে শুরু করেছে। সমুদ্র জমে যাওয়ার আগেই আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে কুমেরু অঞ্চলের বাইরে।

১ মার্চ দুপুর তিনটেতে আমাদের যাত্রা হল ঘরের দিকে। তার আগে শীতের দল এসেছিল আমাদের বিদায় জানাতে, তাদের আর-একটি বছর কাটাতে হবে এই হিমশীতল মহাদেশে। দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রিযাপনের পর আবার সূর্য উদয় হলে পরের গ্রীষ্মে চতুর্থ অভিযান তাঁদের ফিরিয়ে আনতে আসবে, তখন আবার নতুন দল থেকে যাবে তাঁদের জায়গায়। দক্ষিণের এই হিমভূমিতে স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে এইভাবেই চলবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণা। বরফের পাড়ে দাঁড়ানো কয়েকটি মানুষকে শুভকামনা জানিয়ে তাঁদের ও আণ্টার্কটিকাকে বিদায় জানালো বাকী সদস্যরা। ধীরে ধীরে ফিনপোলারিস এগিয়ে চলল উত্তরে। যাত্রা শেষ হল গোয়ার মার্মাগাও বন্দরে ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ দুপুর বারোটায়।

তিনদিন পরে ফিরে এলাম কলকাতায়। আবার শুরু হয়ে গেল গতানুগতিক জীবন; তবে সঞ্চিত রইল অমূল্য কয়েকটি দিনের অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

ভক্ত ভবনাথ

শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়

আনন্দবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব সাংবাদিক—সুপরিচিত লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক—বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারে সংশ্লিষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর গৃহী-ভক্তদের মধ্যে ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরকোটি রূপে চিহ্নিত করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর নির্দেশ সমসময়ে লিপিবদ্ধ। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল—এই তিনটি নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করে তিনি বলেছেন : '…এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।' (কথামৃত, ১।৭।৬)। ভবনাথের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর সাক্ষাৎ নারায়ণকে দর্শন করতেন। (কথামৃত, ২।২।১)। কথামৃতকার শ্রীম তাঁর স্বগত-চিন্তায় বলছেন : '[ঠাকুর] বলেন, এরা [নরেন্দ্র, নারায়ণ] ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম, ইত্যাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহধারণ করে এসেছে !' (কথামৃত, ১।১৪।১০)। ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বসুকে তিনি নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ প্রভৃতিকে খাওয়াতে বলতেন। বলতেন : 'এদের খাইও, তাহলে অনেক সাধুকে খাওয়ানো হবে।' (কথামৃত, ৪।৩।১)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একান্ত প্রিয়, উচ্চকোটির এই ভক্ত ভবনাথের কিছু পরিচয় কথামৃত গ্রন্থে আছে। এছাড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থে এবং আরও এক বা একাধিক অন্য বইয়ে এবং কিছু পত্র-পত্রিকায় ভবনাথের উল্লেখ পাওয়া যায় ; তাঁর জীবন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ তথ্যও। ভবনাথের জীবৎকাল মোটামুটি বত্রিশ কিংবা তেত্রিশ বছর ধরা যেতে পারে। এই স্বল্পস্থায়ী জীবনের পূর্ণ বৃত্তান্ত বোধ হয় কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। ভবনাথ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত পাঠকদের চিত্তে অনেক জিজ্ঞাসা—যা সম্যক পূর্ণ করা আজ অত্যন্ত কঠিন। যাই হোক, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সামান্য তথ্য-উপাদানের সাহায্যে তাঁর জীবনচরিতের মোটামুটি একটি কাঠামো নির্মাণের চেষ্টা করা যেতে পারে। কোনও গবেষক অদূর ভবিষ্যতে এই প্রয়াসের অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি দূর করে দেবেন, এই আশায় আমরা বর্তমান কর্মে ব্রতী হয়েছি।

*

দক্ষিণেশ্বরের নিকটে বরাহনগর বা বরানগরের কলুপাড়ায় [বর্তমান অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জি লেনে] ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম—সম্ভবত ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে। পিতা রামদাস চট্টোপাধ্যায়, জননী ইচ্ছাময়ী দেবী (কালীজীবন দেবশর্মা-সংকলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-অভিধান', ১৩৮৯, পৃঃ ২৩৪)। ভবনাথের জন্মকাল নির্ধারণে শ্রীম-র একটি বিবরণ সহায়ক। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মার্চ তারিখের দিনলিপিতে ভবনাথের বর্ণনায় তিনি বলছেন : 'ভবনাথ এখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই। বয়স ১৯।২০, গৌরবর্ণ, সুন্দর দেহ।' (কথামৃত, ২।২।১)। এখানে মনে হয়, শ্রীম বলতে চেয়েছেন, উক্ত সময়ে ভবনাথ ১৯ অতিক্রম করেছেন, কিন্তু ২০-তে উপনীত হননি। তখন তাঁর বয়স সাড়ে উনিশ ধরলে জন্মসময় দাঁড়ায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর। স্বামীজীর চেয়ে ভবনাথ কয়েক মাসের ছোট ছিলেন বলেই মনে হয়।

ভবনাথ ছিলেন তাঁর পিতামাতার একমাত্র পুত্র (লীলা-অভিধান, পৃঃ ২৩৪)। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কিছু আগেই তিনি

বরানগরের আদর্শনিষ্ঠ কর্মবীর শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সামাজিক সৎকর্মে প্রবৃত্ত হন। ধর্মবিশ্বাসে ব্রাহ্ম, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একান্ত উদারচেতা ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম 'রসদদার'-রূপে কথিত শম্ভুনাথ মল্লিকের গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে শশিপদবাবুর পরিচয় হয় (কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, 'নবযুগের সাধনা', দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৪২৬)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি শশিপদবাবুর গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ স্নেহভালবাসাও তিনি লাভ করেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন, নানাধর্মের সমন্বয়-সাধন, শ্রমিকদের লেখাপড়া শেখানো প্রভৃতি ছিল তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্গত। বরানগর তাঁর কর্মক্ষেত্র। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা নৈতিক পুনরুজ্জীবনের উপর জোর দেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৮৭৫ ?) একটি সংস্থা গঠিত হয়; নাম 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা'। যেসব নবীন যুবক ও কিশোর এই সভায় যোগ দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কালীকৃষ্ণ দত্ত, দাশরথি সান্যাল ও ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়। সানডে স্কুল, নীতি বিদ্যালয় প্রভৃতি এই সভার মাধ্যমে পরিচালিত হত। সংস্থার সদস্যরা ধর্ম, নীতিশিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজনে একটি লাইব্রেরি স্থাপন করেন—নাম 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার পুস্তকালয়'। এই পুস্তকালয় বা পাঠাগার দেখাশুনার দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল তাদের মধ্যে ভবনাথের নাম অগ্রগণ্য। কিশোরদের মধ্যে তিনি অল্পদিনেই অনেকের নজরে আসেন। কর্মী হিসাবে তিনি ছিলেন অমিততেজ। নরেন্দ্রনাথ দত্তের (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং ক্রমে সেই পরিচয় পরিণত হয় গভীর বন্ধুত্বে। নরেন্দ্রনাথ কখন কখন আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার আলোচনার আসরে যোগ দিতেন। (সুজিত সেনগুপ্ত, 'বরানগর পিপলস লাইব্রেরি', দেশ, ১০ জুলাই ১৯৮২, পৃঃ ৩২ ; 'নবযুগের সাধনা', পৃঃ ৪২৩)।

নবীন যুবক ভবনাথের কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁর অনুরক্তির মূলে ছিল সম্ভবত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত' গ্রন্থে ভবনাথের যে-পরিচয় দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছেন: '[ভবনাথ] ব্রাহ্মণতনয় হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানী…।' (১৯৮৩ সং, পৃঃ ১৭৬)। এই পরিচয় যথার্থ হলে আমাদের বুঝতে হবে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। সে যাই হোক, আমরা তাঁর আচরণে দেখতে পাই, তিনি ধর্মবিষয়ে মুক্তচিত্ত। ভক্তি, বিশ্বাস এবং পরমজ্ঞান লাভ যে ধর্মের সার কথা, এই বোধ তাঁর মধ্যে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। এক্ষেত্রেও প্রথম দিকে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব কার্যকর হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া অবশ্যই ছিল পূর্বসংস্কারের শক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হলেন কেমন করে ? এই প্রশ্নের বিচারে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, শশিপদবাবুর কাছেই তিনি প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট ভক্তদের নিকট তাঁর কথা শুনেছিলেন। তাছাড়া কেশবচন্দ্রের পত্রিকার মাধ্যমেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসাধারণ ঈশ্বরানুরাগের বিষয়ে জেনে থাকতে পারেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে কবে তিনি প্রথম উপনীত হন, সঠিক সেই তারিখ নির্দেশ করা আপাতত সম্ভব নয়। শ্রীম কথামৃত

প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় বলেছেন : 'ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তরা ইং ১৮৭৯, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন।···১৮৮১-র শেষ ভাগ ও ১৮৮২-র প্রারম্ভ এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগীন আসিয়া পড়িলেন।' এই বিবরণ থেকে মনে হয়, ভবনাথ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে উপনীত হয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল বলেছেন : '[ভবনাথ] পড়িবার সময়ই প্রভুর কৃপাভাজন হন।' (লীলামৃত, পৃঃ ১৭৬)। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভবনাথের কলেজে পড়াশুনা চলার কথা।

দক্ষিণেশ্বরে ভবনাথের প্রথম আগমনের মুহূর্তেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিশ্চিতই তাঁর এই বিশিষ্ট ভক্তকে চিনে নিয়েছেন, ভক্তও বাঁধা পড়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অহেতুক, সীমাহীন ভালবাসার সূত্রে। ১৮১৮-র শেষভাগ থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট—প্রায় পাঁচ বছর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য সঙ্গ ও পারমার্থিক উপদেশলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল ভবনাথের। পড়াশুনা এবং আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার সময় করে নিতেন। প্রথম দিকে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়, নবানুরাগের কালে, মনে হয়, তিনি সেখানে ঘন ঘন যেতেন। সাংসারিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার পর এই যাতায়াত হয়তো একটু কমে যায়—যে-কারণে আমরা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুআরি দেখছি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে বলছেন : 'তুই এত দেরীতে দেরীতে আসিস কেন?' উত্তরে ভবনাথ বলেছিলেন : 'আজ্ঞে, পনের দিন অন্তর দেখা করি।' (কথামৃত, ৫।১৬।১)। যাই হোক, অনায়াসে অনুমান করা চলে যে, পাঁচ বছরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটেছে শতাধিকবার। কথামৃত গ্রন্থে সহজবোধ্য কারণেই ভবনাথের দেখা আমরা এতবার পাই না, পাই তার চেয়ে অনেক কম। শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ থেকে। তিনি সাধারণত রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে যেতেন। সেইসব বিশেষ দিনের কতকগুলিতে মাত্র ভবনাথ উপস্থিত থাকতে পেরেছেন। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভবনাথ সংবাদ প্রায় কুড়িটি পর্যায়ে আছে। তাছাড়া কয়েক জায়গায় তাঁর উল্লেখ রয়েছে, যেক্ষেত্রে আসরে তিনি অনুপস্থিত। কথামৃতে যে-বিবরণ ও তথ্য-উপাদান আছে, প্রধানত তার সাহায্যেই কিন্তু আমরা ভবনাথের অনুপম চরিত্র ও আধ্যাত্মিক মানসিকতার ছবিটি মনে মনে রচনা করে নিতে পারি। সেই সঙ্গে ভবনাথের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভালবাসা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি ভবনাথের ভক্তি ও আনুগত্যের চিত্রটিও। কথামৃত অনুসরণ করে ভবনাথকে যেমন আমরা দক্ষিণেশ্বরে দেখি, তেমনই আবার দেখি বলরাম-ভবনে, গিরিশচন্দ্রের গৃহে, অধরচন্দ্র সেনের বাড়িতে, সুরেন্দ্রের বাগানে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আলয়ে—পানিহাটির মহোৎসবেও।

১৮৮৩, ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ এই তিন বছরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তরা তাঁর জন্মোৎসব পালন করেন। এই বিশেষ তিনটি দিনেই ভবনাথ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন। (চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা'য় দেখা যায়, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব খুব সংক্ষেপে সারা হয়েছিল। সেই উৎসবে উপস্থিত বিশিষ্ট ভক্তদের তালিকায় ভবনাথের নাম নেই [পৃঃ ২৬৬]।) কথামৃতে উক্ত তিনদিনের আনন্দসংবাদের যে-বিবরণ আছে, সেখানে ভক্তদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন ভবনাথ। ১৮৮২-র জন্মোৎসবে ভবনাথ তাঁর বন্ধু কালীকৃষ্ণের

ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়

(কাশীপুর উদ্যানবাটীতে)

সঙ্গে একটি গান গেয়েছিলেন : 'ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী,/সবে মিলে তব সত্যধর্ম ভারতে প্রচারি।' শ্রীম লিখেছেন : 'ঠাকুর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এক মনে গান শুনিতেছেন। গান শুনিতে শুনিতে মন একেবারে ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।' (কথামৃত, ২।২।১)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভবনাথ সুকণ্ঠ ছিলেন এবং তাঁর গান শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই ভালবাসতেন। ভক্ত বলরামের গৃহে একবার দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথের গানের পর তিনি ভবনাথকে গাইতে বলছেন। ভবনাথ সেদিন গেয়েছিলেন : 'দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী !/সুখে দুঃখে সম, বন্ধু এমন কে, পাপ-তাপ-ভয়হারী।' (কথামৃত, ৪।৩।১)। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার নবমী দিবসে একবার তিনি গেয়েছিলেন : 'গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না।/ও দুটি চরণ বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না॥ গান শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হন।' (কথামৃত, ২।১৭।১)। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ভবনাথের গাওয়া আর-একটি গানের উল্লেখ পাওয়া যায় বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৬)। সেখানে তিনি বলেছেন : ' "তুমি বন্ধু, তুমি নাথ নিশিদিন তুমি আমার", তাঁর [ভবনাথের] এই গীতটিতে প্রভু সমাধিস্থ হইতেন···।'

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জন্মোৎসব শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির অনেক পরে, ২৫ মে তারিখে, পালিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই বিলম্ব। সেদিনের উৎসবের একটি দৃশ্য : '[কীর্তনের আসরে] ঠাকুর গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস কথা শুনিতে শুনিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। অমনি ভক্তেরা গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন। ভবনাথ, রাখাল ঠাকুরকে ধারণ করিয়া আছেন—পাছে পড়িয়া যান।' (কথামৃত, ৪।১৩।৩)। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সমাধিস্থ অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর যে-কয়েকজন শুদ্ধচিত্ত ভক্তের স্পর্শ সহ্য করতে পারতেন, ভবনাথ তাঁদের অন্যতম। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালও এইকথা বিশেষভাবে বলেছেন তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৬)। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জন্মোৎসবে দেখি, নরেন্দ্রনাথের 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি' গানটি শ্রবণমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর বাহ্যশূন্য, সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হলে, ভক্তেরা ঠাকুরকে আহারের জন্য বসিয়েছেন। কিন্তু তখনও ভাবের আবেশ রয়েছে ; ঠিক মতো খেতে পারছেন না তিনি। ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ভবনাথকে বেছে নিয়ে বলছেন : 'তুই দে খাইয়ে।' 'ভাবের আবেশ রহিয়াছে, তাই নিজে খাইতে পারিতেছেন না। ভবনাথ তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেছেন।' (কথামৃত, ৫।১৬।১)।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে ভবনাথকে অধিকাংশ সময়ে দেখি স্বল্পবাক্। দ্রষ্টা-আচার্যের নিকট অনুগত শিক্ষার্থী-শিষ্যের ভূমিকাই তিনি পালন করেছেন। এই শিষ্যের কাজ তখন প্রধানত শ্রবণ এবং সেই সঙ্গে মনন। আর মাঝে মাঝে, লক্ষ্য করা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-ঋদ্ধ কথা শুনে ভক্তের আনন্দ প্রকাশ। উদাহরণ স্বরূপ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সত্ত্বরজস্তম—এই ত্রিগুণ-সম্পর্কিত অসাধারণ কথিকাটি শোনবার পর ভবনাথ তাঁর ভাবোচ্ছ্বাস গোপন করতে পারেননি। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বললেন, তিনগুণের মধ্যে সত্ত্ব শ্রেষ্ঠ হলেও সেও অন্য দুটির মতো তস্করসদৃশ, সে 'বন্ধন খোলে বটে ; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না।···ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়'—ভবনাথ তখন, যেন স্বগত, বলে উঠেছেন : 'কি চমৎকার কথা !' (কথামৃত, ৪।১৩।১)। কখন কখন তিনি দুই-একটি প্রশ্ন করেছেন, নিবেদন করেছেন দুই-একটি সংশয়ের কথা। যেমন, শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করে

তিনি কতকটা বিভ্রান্ত, সেকথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জানাচ্ছেন : 'আমি চণ্ডী বুঝতে পারছি না। চণ্ডীতে লেখা আছে যে, তিনি টক টক মারছেন। এর মানে কি ?' শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিয়েছেন : 'ওসব লীলা। আমিও ভাবতুম ঐ কথা। তারপর দেখলুম সবই মায়া। তাঁর সৃষ্টিও মায়া, সংহারও মায়া।' (কথামৃত, ২।২৪।১)। ভবনাথ সম্পর্কে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের বিচার : 'এমন প্রেমিক কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।' (লীলামৃত, পৃঃ ১৭৬)। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন ঈশ্বরপ্রেমিক এবং মানবপ্রেমিক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একদিন তিনি বলেন : 'লোকের সঙ্গে মনান্তর হলে মন কেমন করে। তাহলে সকলকে তো ভালবাসতে পারলুম না।' ওই প্রসঙ্গে পরে আবার : 'খৃষ্ট, চৈতন্য, এঁরা সব বলে গেছেন যে, সকলকে ভালবাসবে।' ঠাকুর ভক্তের দুশ্চিন্তা দূর করে দেন এই বলে যে, সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন বলেই সকল মানুষকে ভালবাসতে হয়। ভক্তের কাজ ভগবানের শরণাগত হওয়া, তাঁর চিন্তা করা। অন্য চিন্তা বৃথা, তাঁকে পেলে সকলকেই পাওয়া যায় (কথামৃত, ২।১৭।৪)।

ভবনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে উচ্চকোটির ভক্তরূপে চিহ্নিত করেন, সেকথা এই রচনার প্রারম্ভেই বলা হয়েছে ; নানা সময়ে তিনি ভবনাথের ভক্তিভাবের প্রশংসা করতেন। এই ভক্তটির কোমল স্বভাব লক্ষ্য করে ঠাকুর তাঁর মধ্যে প্রকৃতির ভাব মূর্ত দেখতেন। নরেন্দ্রনাথ ও ভবনাথ তাঁর দৃষ্টিতে যথাক্রমে পুরুষ ও প্রকৃতি। উভয়ের সম্পর্কে তিনি বলেছেন : ওদের 'অরূপের ঘর।' (কথামৃত, ৪।১৪।১ ; ৪।২০।২)। স্বামী সারদানন্দ বলেছেন : 'বিনয়, নম্রতা, সরলতা ও ভক্তিবিশ্বাসের জন্য ভবনাথ ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল। তাহার রমণীর ন্যায় কোমল স্বভাব ও নরেন্দ্রনাথের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা দেখিয়া ঠাকুর কখন কখন রহস্য করিয়া বলিতেন, "জন্মান্তরে তুই নরেন্দ্রের জীবনসঙ্গিনী ছিলি বোধ হয়।"' (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫/পৃঃ ২১২)। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের মন্তব্য : '[ভবনাথের] অঙ্গকান্তি যেমন গৌর, অন্তরও সেইরূপ। …ভগবানের ভজন সময় ইনি এমন রোদন করিতেন তাতে পাড়ার লোক জমা হয়ে যেত। যেন একটা কি কাণ্ড ঘটছে। প্রভু…বলিতেন—নরেনের পুরুষভাব, তাই গম্ভীর, ভবনাথের প্রকৃতিভাব, তাই প্রেমবিভোর।' (লীলামৃত, পৃঃ ১৭৬)। ভবনাথের ভক্তিবিশ্বাস এবং নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভাবপ্রসঙ্গে ঠাকুরের আরও কয়েকটি উক্তি উদাহৃত হল : 'আহা তার [ভবনাথের] কি ভাব! গান না করতে করতে চক্ষে জল আসে। হরিশকে দেখে একেবারে ভাব। বলে, এরা বেশ আছে। হরিশ বাড়ী ছেড়ে এখানে [দক্ষিণেশ্বরে] মাঝে মাঝে থাকে কিনা!…ভবনাথ এসব ছোকরার কেন উদ্দীপন হয় ? কি জান ? মানুষ সব দেখতে একরকম, কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর! যেমন পুলির ভিতর কলাইয়ের ডালের পোরও থাকতে পারে, ক্ষীরের পোরও থাকতে পারে, কিন্তু দেখতে একরকম। ঈশ্বর জান্‌বার ইচ্ছা, তাঁর উপর প্রেমভক্তি, এরই নাম ক্ষীরের পোর।' (কথামৃত, ২।৬।৩)। 'ভবনাথের কেমন ভক্তি দেখেছ ? নরেন্দ্র, ভবনাথ—যেমন নরনারী। ভবনাথ নরেন্দ্রের অনুগত।' (কথামৃত, ২।৭।২)। 'ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ী—দুজনে যেন স্ত্রীপুরুষ! তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে বললুম।' (কথামৃত, ৪।২০।২)। ভগবানের নামে ভবনাথ যে পরম প্রশান্তি অনুভব করতেন সেকথা তিনি নিজমুখেই একবার ঠাকুরকে বলেন : 'হরিনামে আমার গা যেন খালি হয়।'

ভক্তের এই কথায় স্বভাবতই প্রসন্ন হয়েছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনি তখন বলেন: 'যিনি পাপ-হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন।' (কথামৃত, ৪।১৯।৩)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে ভবনাথ ক্রমশ বৈরাগ্যবান হয়ে ওঠেন। তাঁর অন্তরে জাগে ত্যাগের স্পৃহা। উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন শুনলেন, ভবনাথ পান ও মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। একথা শুনে ঠাকুর বলেছেন: 'সে কি রে! পান মাছে কি হয়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না! কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।' (কথামৃত, ৪।৩।১)। বস্তুত ভবনাথের মনোগত ইচ্ছা ছিল সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করা। কিন্তু, আমরা জানি, তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। পিতামাতার আগ্রহে তাঁকে বিবাহ করতে হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে অথবা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশে তাঁর বিবাহ হয় মল্লিকপুরের অভয়চরণ ভট্টাচার্যের কন্যা কিরণশশীর সঙ্গে (লীলা-অভিধান, পৃঃ ২৩৫)। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল জানাচ্ছেন, পত্নী যাতে ধর্ম-চর্চায় সহায়ক হন এই অভিপ্রায়ে তিনি শ্রীমতী কিরণশশীকে দক্ষিণেশ্বরে এনেছিলেন এবং প্রভু 'নবদম্পতিকে শুভাশিস করেন।' (লীলামৃত, পৃঃ ১৭৬)। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভবনাথ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন: 'ভবনাথ কেমন সরল! বিবাহ করে এসে আমায় বলছে, স্ত্রীর উপর আমার এত স্নেহ হচ্ছে কেন? আহা! সে ভারি সরল! তা স্ত্রীর উপর ভালবাসা হবে না? এটি জগন্মাতার ভুবনমোহিনী মায়া।' (কথামৃত, ৫।১৪।১)। জগন্মাতার মোহিনী মায়া ভবনাথকে অব্যাহতি দেয়নি ঠিকই, কিন্তু তিনি তবুও তাঁর অন্তরে ত্যাগের ইচ্ছা কিছুকাল পর্যন্ত জাগিয়ে রেখেছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর আমরা দেখি, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সম্মুখে হঠাৎ তিনি ব্রহ্মচারী বেশে উপস্থিত—'গায়ে গৈরিক বস্ত্র, হাতে কমণ্ডলু, মুখে হাসি।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন বলেন: 'ওর মনের ভাব ঐ কিনা, তাই ঐ সেজেছে।' (কথামৃত, ২।১৭।৩)। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভবনাথ প্রসঙ্গে বলছেন: 'ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্মকথা কয়! ঈশ্বরের কথা নিয়ে থাকে দুজনে। আমি বললুম, পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি, তখন রেগে রোখ করে বললে, কি! আমরাও আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে থাকবো?' (কথামৃত, ৩।১২।১)।

মহামায়ার মায়া ভবনাথকে নিষ্কৃতি দেয়নি। ১৮৮৫-র শেষের দিক থেকে ঠাকুরের নিকট তাঁর যাতায়াত কমে আসে বলে মনে হয়। নিদারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন শ্যাম-পুকুরে এবং পরে কাশীপুরে, সেই সময়ে ভবনাথ তাঁর কাছে গিয়েছেন বটে, কিন্তু পূর্বের মতো অল্পদিনের ব্যবধানে নয়। নিজের শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও ঠাকুর ভবনাথের জন্য ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন বোধ করেছেন, সেই সঙ্গে ভক্তের ব্যবহারে ব্যথিতও। এই ভাবের প্রকাশ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর শ্রীম-র নিকট তাঁর কথায়: 'এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা "কেমন আছেন মশাই?" জিজ্ঞাসা করে তারা বহিরঙ্গ। ভবনাথকে দেখলে না? শ্যামপুকুরে বরটি সেজে এলো। জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন আছেন?" তারপর আর দেখা নাই। নরেন্দ্রের খাতিরে ঐরকম তাকে করি, কিন্তু মন নাই।' (কথামৃত, ৪।৩১।১)। উদ্ধৃত অংশটি পড়ে আমরা যদি ভেবে বসি, ঠাকুর ভবনাথকে প্রত্যাখ্যান করছেন অথবা মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখছেন, তাহলে

কিন্তু আমরা ভুল করব। ঠাকুরের ওই উক্তিতে স্পষ্টত রয়েছে বেদনার সুর; বালকস্বভাব ঠাকুরের অভিমানই বুঝি প্রকাশ পেয়েছে এখানে। মুখে 'মন নাই' বললে কী হবে, ভবনাথের চিন্তা যথার্থই রয়েছে ভক্তবৎসল ঠাকুরের অন্তর জুড়ে। তার প্রমাণ আমরা পাই শ্রীম-র ১১ এপ্রিল ১৮৮৬-র বিবরণে—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় ও ব্যবহারে। শ্রীম জানাচ্ছেন: 'ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন;—কর্মকাজের চেষ্টা করিতেছেন। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরকে দেখিতে আসিতে পারেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথের জন্য বড় চিন্তিত থাকেন, কেননা ভবনাথ সংসারে পড়িয়াছেন।' সেদিন ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলেন: 'ওকে [অর্থাৎ ভবনাথকে] খুব সাহস দে।' আবার ভক্তকে স্বয়ং সাহস দিয়ে বলছেন: 'খুব বীরপুরুষ হবি। …ভগবানেতে মন ঠিক রাখবি;…। পরিবারের সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় কথা কবি।' পরে ভবনাথকে ইসারা করে বলেছেন: 'আজ এখানে খাস।' (কথামৃত, ২।২৭।২)।

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে ভবনাথকে আর আমরা দেখতে পাই না। তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে ভবনাথ আরও কয়েকবার কাশীপুরে এসে থাকতে পারেন,—সম্ভবত এসেছিলেন কিন্তু সেই-রকম ঘটনার বিবরণ বা উল্লেখ আমাদের সন্ধানে আসেনি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির সংবাদ পাওয়ার পর তিনি অবশ্যই কাশীপুরে এসেছিলেন; কাশীপুর মহাশ্মশানে যাত্রার পূর্বে ভক্তদের নিয়ে তাঁর যে আলোকচিত্র গৃহীত হয়, সেই চিত্রে অন্যদের সঙ্গে বিষণ্ণ ভবনাথকে দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর তাঁর ত্যাগী শিষ্যরা বরানগরে যে-মঠ স্থাপন করেন, দশ টাকা ভাড়ায় সেই বাড়ির ব্যবস্থা করে দেন ভবনাথ। 'মুনশীদের বাড়ি' নামে অভিহিত এই গৃহের এক অংশে আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার পাঠাগার ছিল—যে-পাঠাগারের সঙ্গে একদা ভবনাথ বিশেষভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই পাঠাগার দেখাশুনা করতে পারতেন না বলেই মনে হয়। কুলদাপ্রসাদ মল্লিকের 'নবযুগের সাধনা' গ্রন্থে এ-ব্যাপারে অনুরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় (পৃঃ ৪২৭)। তিনি তখন বরানগর মঠে আসার যথেষ্ট সুযোগও করে উঠতে পারতেন না। এ-বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানাচ্ছেন ('শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী'—২ / পৃঃ ৪৪): 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর ভবনাথের বরাহনগরের মঠে যাতায়াত অতি কম হইয়াছিল, তখন তিনি পুনরায় **B. A.** পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় বাদুড়বাগানের এক মেসে থাকিতেন। তাহার পর তিনি **School Sub-Inspector**-এর কর্ম লইয়া অপর স্থানে গিয়াছিলেন। এইজন্য বরাহনগরের মঠে আসিতে পারিতেন না, আলমবাজারের মঠে অবসর পাইলেই মাঝে মাঝে আসিতেন এবং পূর্বের ন্যায় আনন্দ করিয়া সকলের সহিত মিশিতেন।' যে-কর্মের উল্লেখ এখানে দেখি, সেটি তিনি সম্ভবত ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পেয়েছিলেন। মোটামুটি ওই সময়ে তিনি দক্ষিণ কলকাতায় চলে আসেন (লীলা-অভিধান, পৃঃ ২৩৫)।

বরানগরের মঠে ভবনাথ যে-কয়েকবার আসতে পেরেছিলেন তার মধ্যে বিশেষ একটি দিনের স্মৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের পঞ্চম অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধানন্দের মানসপটে দীর্ঘকাল অঙ্কিত ছিল। শুদ্ধানন্দজীর সেই স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন স্বামী কমলেশ্বরানন্দ তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরিকর প্রসঙ্গ' গ্রন্থে (পৃঃ ৬৫)। স্মৃতিচারণ করতে করতে স্বামী শুদ্ধানন্দ বলেছিলেন: 'বরাহনগর মঠে ভবনাথবাবু এসেছেন। তিনি দুঃখ করছেন:

"তোমরা সব ত্যাগ করে ভগবানকে ডাকছ আর আমরা সংসারে হাবুডুবু খাচ্ছি।" ভবনাথবাবু একটি গান গেয়েছিলেন মনে আছে: "কেন অমিয় ভ্রমে গরল কর পান। / কেন আপাত-সুখেতে মজি ভুল পরিণাম। / ভেবেছ কি সার ভবে চিরদিন এইভাবে যাবে ?" ইত্যাদি। শশী মহারাজ [স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দিলেন : "গৃহস্থ কতগুলি মাছ এনে কতক জিইয়ে রেখে দিয়েছে এবং কতক খোলায় চাপিয়ে ভাজছে। আমাদের এখন তিনি ভাজছেন। তোমাদের জিইয়ে রেখে দিয়েছেন। আবার সময় হলে তোমাদেরও খোলায় চাপাবেন।"'

সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার জন্য ভবনাথের মনে যে-বেদনাবোধ ছিল তার একটি পরিচয় পাওয়া যায় উক্ত বিবরণে। শ্রীশ্রীঠাকুর কবে এবং কীভাবে তাঁকে 'খোলায় চাপালেন', সে-বৃত্তান্ত আমাদের জানা নেই। তবে আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে একদিন বলেছিলেন : 'অবতারের উপর ভালবাসা এলেই হোলো।' (কথামৃত, ৫।১২।৬)। অর্থাৎ সেই ভালবাসা থাকলে আর কিছুর দরকার হয় না। আমরা একথাও জানি যে, ঠাকুরের প্রতি ভবনাথের ভক্তি ও ভালবাসায় বিন্দুমাত্র খাদ ছিল না। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাক বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের কথা : 'ঠাকুরের প্রতি ইঁহার [ভবনাথের] যেরূপ ভালবাসা তার কণামাত্র পেলে আমরা কৃতার্থ হই।' (লীলামৃত, পৃঃ ১৭৬)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনের পর ভবনাথ প্রায় দশ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবনের এই শেষ কয়েক বছরের ঘটনা সম্পর্কে তথ্য দুর্লভ। আবার যে-কয়েকটি ঘটনা জানা যায় সেগুলির পারম্পর্য নির্ণয় করাও কঠিন। যাই হোক, মোটামুটি বলা যায় যে, ভবনাথ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শেষ আট বছর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সরকারী কর্ম করেন। সেই কর্ম উপলক্ষে তাঁকে কিছুকাল কলকাতার বাইরে থাকতে হয়। কলকাতায় যখন তিনি থাকতেন তখন গুরুভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করতেন। সুযোগ সুবিধা মতো তাঁর বরানগর ও আলমবাজার মঠে যাতায়াতের কথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া তিনি ঠাকুরের গৃহী ভক্তদের কাছেও যেতেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ভক্ত মনোমোহনের গৃহে সৎ প্রসঙ্গ করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যেসব ভক্ত আসতেন তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থে (পৃঃ ২১০—১১)। এই তালিকায় একটি বিশিষ্ট নাম ভবনাথ। কলকাতার বাইরে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, থাকার সময়ে তিনি নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ক্রমে হীনস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। ভবনাথের দুই কন্যার মধ্যে একটি—সম্ভবত বড়টি—আড়াই বছর বয়সে মারা যান। অপর কন্যা শ্রীমতী প্রতিভার বয়স যখন আনুমানিক ছয় বছর, ভবনাথের তখন দেহত্যাগ হয়—দক্ষিণ কলকাতার একটি ভাড়াবাড়িতে। ঘটনার কাল ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ (সম্ভবত এই খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধের কোন সময়)। আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে শ্রীমতী প্রতিভা (মুখোপাধ্যায়) এক সাক্ষাৎকারে ভবনাথ-স্বামীজীর সৌহার্দ্য সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন : 'বাবার অবর্তমানে আমার বিয়েতে বেলুড় মঠ থেকে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।' (সতীশচন্দ্র নাথ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিজন ভবনাথ', উদ্বোধন, কার্তিক ১৩৭৭)।

স্বামীজী ও ভবনাথের মধ্যে প্রীতি-ভালবাসার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে বিশেষ করে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতার আকস্মিক মৃত্যু এবং সাংসারিক

অভাব-অভিযোগ নরেন্দ্রনাথের মনে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল ; কিছুদিন পরে তিনি চিত্তের অশান্তি ও সংশয় অতিক্রম করতে সক্ষম হন। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিকর কথা শোনা যায়, যা ভবনাথও বিশ্বাস করে বসেছিলেন এবং ব্যথিত চিত্তে সাশ্রুনয়নে ঠাকুরের কাছে বিবৃত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেকথা শুনে ভবনাথকে তিরস্কার করে বলেন : চুপ কর, মা বলেছেন, সে কখনও ওইরকম হতে পারে না। আর কখনও আমাকে ওই সব কথা বললে তোদের মুখ দেখতে পারব না। (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।২১৮—১৯)। এখানে আমাদের বুঝতে হবে, ভবনাথ ঠাকুরের নিকট উক্ত প্রসঙ্গ যে তুলেছিলেন তার মূলে ছিল তাঁর তীব্র দুঃখবোধ ; আর এই দুঃখের মূলে ছিল নরেন্দ্রনাথের প্রতি গভীর, ঐকান্তিক ভালবাসা। বলা বাহুল্য, ঠাকুরের স্পষ্টোক্তিতে তিনি আশ্বস্ত বোধ করেন এবং তাঁর ভুল ভেঙে যায়। নরেন্দ্রনাথ ও ভবনাথের বন্ধুত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। বিদেশে গিয়েও স্বামীজী তাঁর বন্ধুকে ভোলেননি। বিদেশ থেকে লেখা স্বামীজীর বেশ কয়েকটি পত্রে ভবনাথের উল্লেখ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে ভবনাথ কী দিয়েছেন? এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে সঙ্ঘের প্রথম মঠবাড়ির কথা। বরানগরের মুনশীদের বাড়ির ব্যবস্থা যে তিনি করে দেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। শুধু বাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া নয়, সেটি বাসযোগ্য করে তুলতেও তিনি বিশেষভাবে হাত লাগিয়েছিলেন (চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, ‘শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা’, পৃঃ ২৯১)। দ্বিতীয়ত, তিনি সঙ্ঘকে দিয়েছেন—শুধু সঙ্ঘকে নয়, সারা বিশ্বের শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীকে—ঠাকুরের মহাযোগী-মূর্তির সেই বিখ্যাত ফোটোগ্রাফটি। এ-বিষয়ে নানা গবেষণার ফলে এখন নিশ্চিতরূপে জানা গিয়েছে যে, আলোকচিত্রটি গৃহীত হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, রবিবার, এবং ভবনাথের উদ্যোগেই এটি তোলা সম্ভব হয়েছিল (সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ‘শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোপ্রসঙ্গে’, উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৬৯, পীযূষকান্তি রায়, ‘শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত ফটো’, দেশ, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ; দেবপ্রসাদ গর্গের চিঠি, দেশ, ২৭ অক্টোবর ১৯৮৪)। আমরা জানি, ওই আলোকচিত্রটিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং পুষ্পার্ঘ দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পুষ্পার্ঘের ফুল তিনি ভবনাথকে দিয়ে আনিয়েছিলেন (‘শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা’ পৃঃ ২৬৬)। ওই আলোকচিত্র-গ্রহণ কর্মের প্রধান হোতা যে ভবনাথ, তারই স্বীকৃতিস্বরূপ বুঝি ঠাকুর তাঁকে দিয়েই বিশেষ ফুলটি আনিয়ে নিলেন।

ভবনাথ ছিলেন সুলেখক। কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ‘নবযুগের সাধনা’য় ভবনাথের লেখা দুখানি বইয়ের উল্লেখ করেছেন : ‘নীতিকুসুম’ ও ‘আদর্শ নরনারী’। এছাড়া ‘সখা’ পত্রিকায় তাঁর একটি বিশিষ্ট রচনার (১৮৮৮) কথা জানা যায়। এই রচনার বিষয় : শ্রীরামকৃষ্ণ।

নিবন্ধটির কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত হল :

‘…আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি ঠিক চৈতন্যের ন্যায় ঈশ্বরভক্ত এবং তাঁহারই ন্যায় ভাবুক। অনেকে স্বচক্ষে ইঁহার ঐশ্বরিক ভাব দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিয়াছেন। সহজ সহজ কথায় কঠিন ধর্মকথাসকল এমন পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে বালক ও মহিলাগণ অবাধে তাহা বুঝিতে পারিতেন।…

‘পরমহংসকে দেখিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র সেন মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, কখন তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিতেন না।…

'তিনি গুরুগিরি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার নিকট যাহারা সর্বদা গমনাগমন করিতেন তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও তাহাদিগকে প্রণাম করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমি সকলের দাসানুদাস।" স্ত্রীলোকমাত্রকেই তিনি আনন্দময়ী মা'র ছায়া জানিয়া মাতৃবোধে প্রণাম করিতেন। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না…

'কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম, কি শিখ যিনি যে ধর্মাক্রান্ত হউন সকলকেই তিনি তাহাদের উপযোগী উপদেশ প্রদান করিতে পারিতেন।…তিনি সত্যবাদীকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন, নিজে যাহা বলিতেন তাহা নিশ্চয়ই করিতেন।…

'অনেকের বিশ্বাস মানুষ পুস্তক পাঠ না করিলে জ্ঞানী এবং ধার্মিক হইতে পারে না। পরমহংস-চরিত পাঠে সে সন্দেহ দূর হইবে সন্দেহ নাই।' (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস', পৃঃ ৮১—৮৩)।

লেখক এখানে অল্প কথায় শ্রীরামকৃষ্ণচরিত সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁর সমকাল সম্পর্কে গবেষণায় প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান।

ভক্ত ভবনাথের মূর্তিখানি শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের চিত্তে অম্লান। আর তাঁর স্মৃতি সশ্রদ্ধভাবে ধারণ করে রেখেছে বরানগরের একটি প্রতিষ্ঠান: বরানগর পিপলস্ লাইব্রেরি। এই নিবন্ধের প্রথম দিকে আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার যে-পাঠাগারের কথা বলা হয়েছে, সেই পাঠাগার এবং দক্ষিণ বরাহনগর পাবলিক লাইব্রেরি নামে একটি সংস্থা সংযুক্ত হয়ে বরানগর পিপলস্ লাইব্রেরি গঠিত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। নানা উত্থান-পতনের পর ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশে বরানগর পিপলস্ লাইব্রেরি বরানগরের কুঠিঘাট রোডে তার নিজস্ব ভবনে সংস্থিত হয়। পুরাতন ইতিহাস স্মরণ করে বর্তমান পাঠাগারের পরিচালকরা ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়কে এই সংস্থার প্রধান প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা দিয়েছেন। পাঠাগারভবনে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে ভবনাথের একটি বৃহৎ তৈলচিত্র। আর দেখা যাবে শ্বেতপ্রস্তরফলকে মুদ্রিত ভবনাথ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই বিখ্যাত উক্তি: 'নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল; এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।'

মুখের ভিতরের ক্যানসার

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

মেডিকেল এন্‌ট্যামল্যাজির প্রধান অধ্যাপক এবং প্যারাসাইটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান, স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা। ১৯৮৫-তে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত।

বহুবছর ধরেই জানা আছে যে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে মুখের ক্যানসারের হার পৃথিবীর অন্য জায়গার তুলনায় বেশি। অনেক আগে, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রতিবেদনে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছিল, ভারতে তামাক ব্যবহারের সঙ্গে মুখের ক্যানসারের সম্পর্ক রয়েছে। পরে আরেকটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, যাদের ক্যানসার হয়নি, তাদের তুলনায় যাদের মুখের ক্যানসার হয়েছে, তারা বেশি তামাক চিবোয়। মুখের ক্যানসারের হার উত্তর ভারতে কয়েক শতাংশ মাত্র, যদিও কোন কোন গোষ্ঠীতে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। জাতিগতভাবে, যে কোন জাতির তুলনায় ভারতীয়দের মধ্যে মুখের ক্যানসারের হার বেশি—এবং সম্ভবতঃ এটা পানসুপারির সঙ্গে তামাক চিবানোর জন্যে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বেশির ভাগ মানুষই মুখের ক্যানসার নিয়ে যখন চিকিৎসকের কাছে আসেন, তখন অনেক দেরি হয়ে যায়, রোগ অনেকটা এগিয়ে যায়। সারার সম্ভাবনা থাকে না। ক্যানসার প্রথমে আরম্ভ হয় দাঁতের মাড়িতে নির্দোষ একটা ছোট সাদা ছোপের মতো আকার নিয়ে এবং মারাত্মক পরিণতি এড়ানো যেতে

পারত এরকম অনেক ক্ষেত্রেই যদি তখন, সেই মুহূর্তে তামাকের ব্যবহার বন্ধ করা যেত—তাহলে দুষ্ট ফোঁটকে রূপান্তরিত হতে আর পারত না ঐ নির্দোষ সাদা ছোপটা।

মুখের ক্যানসারের, অতএব, একটা ক্যানসার পূর্ববর্তী স্তর আছে। যদিও এমন কোষকলায় এটা শুরু হয়, সেখানে পরীক্ষা করে সব সময় এই ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তর ধরা খুব সহজ হয় না। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তর হল একটা সাদা ছোপ—ইংরেজীতে যাকে বলা হয়—লিউকোপ্লেকিয়া অথবা লাল ছোপ (ইরাইথ্রো-প্লেকিয়া), এর মধ্যে লাল ছোপ কদাচিৎ দেখা যায়, কিন্তু সাদা ছোপ দেখা যায় অনেক সময়েই, মুখের ভিতর মাড়িতে, জিভে, গালে, টাগরায় বা তালুতে।

ভারতে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫,০০০ লোকের উপর একটা সমীক্ষা করা হয়। এরা সবাই তামাক খেতে অভ্যস্ত ছিল। এই সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল, গ্রামের লোকেরা, যারা তামাক খায়, তাদের কতজনের ভিতর ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এবং যাদের মধ্যে ঐ ক্যানসার-পূববর্তী স্তর খুঁজে পাওয়া যাবে, তারা যদি ধূমপান বন্ধ করে, তাহলে তাদের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা কমে যায় কিনা এটা দেখা।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তামাক খাবার ধরন-ধারণও বিভিন্ন। উত্তরাঞ্চলে কিছুটা তামাক নিচের ঠোঁটের পিছন দিকে রেখে দেবার রেওয়াজ আছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অভ্যাস হল একটা ছোট মাটির নলের ভিতর দিয়ে ধূমপান করা, দক্ষিণে পানের সঙ্গে তামাকসও রেখে দেয় লোকে গালে পুরে, এবং পূর্বাঞ্চলে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের একটা অদ্ভুত অভ্যাস—সিগারেটের জলন্ত অংশটা মুখের ভিতর নিয়ে ধূমপান করা (উল্টো ধূমপান—বা চুট্টা)—বেশি দেখা যায় অন্ধ্রে—স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে। যে সব লোক নিয়মিত এইভাবে সিগারেট খায়, তাদের তালুতে ক্যানসার হবার ঝুঁকি থাকে খুব বেশি।

সাদাছোপের প্রাদুর্ভাবের হার দেখা গেল এক-এক জায়গায় এক-একরকম—০'২ শতাংশ উত্তরাঞ্চলে, কিন্তু ৫ শতাংশ তাদের মধ্যে যারা মুখের ভিতর জলন্ত সিগারেট নিয়ে ধূমপান করে। এই সাদাছোপ ধরতে গেলে শুধু তাদেরই মধ্যে দেখা গিয়েছিল, যারা তামাক খায় বা ধূমপান করে। যারা তামাক ব্যবহার করে না, তাদের মধ্যে সাদাছোপ দেখা যায়নি বললেই হয়।

দশবছর ধরে সমীক্ষায় দেখা যায়, দক্ষিণ-ভারতে ২'২ শতাংশ সাদাছোপ পরে ক্যানসারে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই তুলনায় উত্তরাঞ্চলে ০'৩ শতাংশ সাদাছোপ কয়েক বছর পর ক্যানসারে পরিণত হয়েছে।

যেহেতু এটা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তর ধরতে গেলে তাদেরই হয় যারা পানের সঙ্গে তামাক বা দোক্তা খায়, বা বিড়ি, সিগারেট খায় বা চুট্টা খায়—সেইহেতু এটা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত যে পরখ করে দেখা, ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তরের অবস্থায় তামাক ব্যবহার বন্ধ করে দিলে পরিণতি কী হয়।

ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তর যাদের ছিল, দেখা গেল, তারা যদি তামাক ব্যবহার বন্ধ করে অথবা একদম কমিয়ে দেয়, তাহলে ঐ স্তরটা কমে যায়। ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তরে অবস্থিতি সত্ত্বেও যারা তামাকের ব্যবহার বন্ধ করে না, তাদের সঙ্গে পরিসংখ্যানগতভাবে তুলনা করেই এ সিদ্ধান্তে আসা গেছে। অর্থাৎ শেষোক্ত লোকেদের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বাড়ে, পূর্বোক্ত লোকেদের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা কমে।

এই সমীক্ষা ক্যানসার নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করছে—যা মুখের ক্যানসার ছাড়া অন্য ক্যানসারের ব্যাপারেও প্রযোজ্য—মানুষের ব্যক্তিগত অভ্যাস কিছু বদলালে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে।

শঙ্করাচার্যের দেবীপূজা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমেরিকা স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ—'উদ্বোধন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক। বর্তমান নিবন্ধটি শঙ্করাচার্য লিখিত দেবী চতুঃষষ্ট্যুপচার স্তোত্রম্ অবলম্বনে রচিত।

আচার্য শঙ্কর দেবীপূজায় বসিয়াছেন। চৌষট্টি উপচারে দেবীর মানসপূজা করিবেন। মনে মনে পূজা করিলে অনেক সুবিধা। যে-কোন উপচার যে-কোনও স্থান হইতে যে-কোনও সময়ে নিমেষে সংগ্রহ করা যায়। ছুটাছুটি করিতে হয় না।

প্রথমে আবাহন। "মা ঝটিতি জাগৃহি জাগৃহি।" জগজ্জননি তাড়াতাড়ি জাগিয়া ওঠো, জাগিয়া ওঠো। প্রত্যূষে তোমার মঙ্গল-গীতি গাহিতেছি। চোখ মেলিয়া চাও। তুমি ঘুমাইয়া থাকিলে এই বিশ্ব-সংসারের সকল ক্রিয়া থামিয়া যাইবে। তুমি ব্রহ্মশক্তি মহামায়া। যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা তোমারই শক্তিতে। অতএব মা জাগো। কৃপা কটাক্ষ দ্বারা—"জগদিদং জগদম্ব সুখী কুরু"—এই জগৎকে সুখী কর।

মা, তোমার 'সমর্চনার' জন্য একটি মণিময় মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছি। উহার দশদিকে স্বর্ণ কুম্ভ স্থাপন করা হইয়াছে। আমার পূজা গ্রহণ করিবার জন্য মা তাড়াতাড়ি এস।

কনককলসশোভমানশীর্ষং
জলধরলম্বিতসমুল্লসৎপতাকম্।
ভগবতি তব সন্নিবাস হেতো-
র্মণিময়মন্দিরমেতদর্পয়ামি।

তোমার নিবাসের জন্য মেঘস্পর্শী স্বর্ণচূড়াযুক্ত পতাকাশোভিত মণিময় মন্দির মনে মনে রচনা করিলাম। জগজ্জননি, তোমার জন্য নবরত্ন শোভিত স্বর্ণময়ী একটি শিবিকা (পাল্কী) সংগ্রহ করিয়াছি। নরম গদী আছে, তাহাতে তুমি বসিবে। বেদিকায় একটি বিবিধ কুসুমাকীর্ণ রত্ন-সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। স্বর্ণনির্মিত পাদপীঠে পদযুগল রাখিয়া মা তুমি দশদিক আলো করিয়া ঐ সিংহাসনে উপবিষ্টা হও।

তাহার পর মণি ও মুক্তানির্মিত চারিটি স্বর্ণ-স্তম্ভযুক্ত একটি নূতন বিশাল চন্দ্রাতপ সমর্পণ।

অতঃপর পাদ্য-অর্ঘ্য এবং আচমনীয়। মা, তোমার পদ্মযুগলের ন্যায় কোমল পা দুটিতে দুর্বা ও অপরাজিতা এবং অন্য পুষ্পসহ এই পাদ্য নিবেদন করিলাম। গন্ধপুষ্প, যব, সর্ষপ, দুর্বা, তিল, কুশ, খই মিশ্রিত হেমপাত্রে নিহিত অর্ঘ্য দিতেছি। কৃপা করিয়া গ্রহণ কর। করকমলে জায়ফল, কঙ্কোল ও লবঙ্গের সুগন্ধযুক্ত অমৃত-শীতল এই জল গ্রহণ কর আচমনের জন্য।

এই যে সোনার বাটিটি—উহাতে মধুপর্ক আছে। রত্নখচিত ঢাকনি খুলিয়া ধরিতেছি। জননী উহা স্বীকার কর। তোমার স্নানের জন্য আর-একটি স্বর্ণপাত্রে নানা সুগন্ধিপুষ্প দ্বারা সুবাসিত চম্পকতৈল আছে। ভক্তিভাবে স্বর্ণচূর্ণ ও নাগকেশর মিশ্রিত বিলেপন এবং কস্তুরিকা মিশ্রিত স্নানজল কল্পনা করিলাম। তুমি যখন এই স্বচ্ছ নির্মল জলে স্নান করিতেছ তখন বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র পাঠ হইতেছে চিন্তা করিলাম। উদয়োন্মুখ সূর্যের ন্যায় মনোহর এই উত্তম দিব্যবস্ত্র এবং মুক্তাখচিত অতুলনীয় উত্তরীয় তোমাকে নিবেদন করিলাম।

ভগবতি, তোমার কেশপাশ অগুরুধূপে স্নিগ্ধ করিয়া অতি সমাদরে চিরুনী দ্বারা আঁচড়াইয়া দিতেছি—তাহার পর পদ্ম ও চম্পক-ফুলে সজ্জিত করিয়া স্বর্ণসূত্র দ্বারা বাঁধিয়া দিলাম। স্বর্ণশলাকা দ্বারা তোমার দুই চোখে 'সৌবীরাঞ্জন' (সুর্মা) বিন্যস্ত হইয়াছে। কী সুন্দর দেখাইতেছে মা, তাহা কি আর বলিব।

তাহার পর পূজক শঙ্করাচার্য মায়ের কটি বাঁধিবার জন্য কাঞ্চী (চন্দ্রহার), স্তনদ্বয়ের মধ্যে অনুপম মুক্তাহার, গলদেশে ২৭টি মুক্তানির্মিত হার, বাহুতে কেয়ুর, মণিবন্ধে রত্নবলয়, কর্ণ দুটিতে তাটঙ্কা নামে কর্ণভূষণ, মস্তকে চূড়ামণি বিন্যাস করিলেন। সবই মনে মনে—মানসপূজা। দেবীর নির্মল ললাটতলে কুঙ্কুম, কস্তূরী, কর্পূর ও অগুরু-দ্বারা তিলক রচনা করিলেন। দেহে অঙ্গরাগ, পাদদ্বয়ে চন্দন লেপন দ্বারা পূজা করিলেন। মা, তোমার সিঁথিতে সাদরে ন্যস্ত সিন্দূর আমার হৃদয়কমলে আনন্দ বিস্তার করিতেছে। ঐ সিন্দূরের সূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণকান্তি চিত্তের সকল অন্ধকার দূর করিয়া দেয়।

মন্দার, কুন্দ, করবী, লবঙ্গফুল, মালতী, বকুল, অশোক, কাঞ্চন, করবী, কেতকী, কর্ণিকার, অপরাজিতা—এই সব পুষ্প তোমার পূজার জন্য সংগ্রহ করিয়াছি। পারিজাত, মল্লিকা, চাঁপাফুল আরও নানাবর্ণের নানা আকৃতির পুষ্পসম্ভারও আনিয়াছি। জবা, পদ্ম তো আছেই।

এইবার ধূপ। লাক্ষারস সম্মিলিত, কর্পূরসহ 'শ্রীবাস' (ধুনা) মিশ্রিত, কর্পূরে সুগন্ধিত, গোঘৃত দ্বারা আলোড়িত, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি নানা উপকরণ দ্বারা ধূপ কল্পনা করিলাম। জননি, পরম স্নেহে উহা স্বীকার কর। ধূপের পর দীপ। রত্নালঙ্কিত সোনার পাত্রে গব্যঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাম্রবর্ণ তাহার শিখা অন্তরের ও বাহিরের সকল অন্ধকার দূর করিয়া দিতেছে। এইবার নৈবেদ্য। দধি, দুগ্ধ, পায়স মহাশাল্যান্ন পিঠ্য, অমৃতের চেয়েও রসযুক্ত, কতপ্রকারের তরকারী—আরও নানাবিধ খাদ্য মানসপূজক আচার্য দেবীর জন্য কল্পনা করিতেছেন। জম্বুফল, কদলী, নারিকেল, দাড়িম্ব, নারঙ্গ এবং ছোট-বড় আরও নানা ফল মনে মনে নিবেদন করিলেন। পানের জন্য সর্বোত্তম দুগ্ধ। মধু এবং অমৃততুল্য জল।

উষ্ণোদকৈঃ পাণিযুগং মুখঞ্চ
প্রক্ষাল্য মাতঃ কলধৌত পাত্রে।
কর্পূরমিশ্রেণ সকুঙ্কুমেন
হস্তৌ সমুদ্বর্তয় চন্দনেন ॥

—মা, স্বর্ণপাত্রে উষ্ণজল দ্বারা তোমার পাণিযুগল ও মুখ ধোও, পরে কুঙ্কুমযুক্ত চন্দন দিয়া হাত দুটি লিপ্ত কর।

অতঃপর পূজক জগন্মাতাকে মুখশুদ্ধি দিতেছেন—সুপারী, কর্পূর, লবঙ্গ, খদির এবং কঙ্কোলযুক্ত তাম্বুল। তাহার পর আরতি। বৃহৎ স্বর্ণপাত্রে বিশাল ডমরুসদৃশ গোধূম দীপ রাখিয়া প্রচুর ঘৃত দিয়া প্রজ্বালিত দীপ অতি বিনয়ের সহিত মায়ের মুখের সম্মুখে সাড়ে তিনবার দেখানো হইল—আর প্রার্থনা—"ভূয়াত্তে কৃপার্দ্রঃ কটাক্ষঃ"—তোমার কৃপাকটাক্ষ আমার উপর পতিত হোক্।

আরতি হইয়া গেলে জ্ঞান-ভক্তির মূর্তি শঙ্করাচার্য দেবীর মাথার উপরে পূর্ণচন্দ্রবিম্বসদৃশ প্রভাসম্পন্ন নানা রত্নশোভিত লোকত্রয়ের আহ্লাদজনক উজ্জ্বল মুক্তাজাল পরিবৃত বিশ্বকর্মা-নির্মিত ছত্র ধরিলেন।

তাহার পর চামর দ্বারা ব্যজন এবং পুনরায় সমস্ত শরীরে সহস্র প্রদীপ দ্বারা আরতি। আরতির পর নানা কলাকুশলবিৎ নটনটীর নৃত্য-গীত। অতঃপর দেবীর ভ্রমণের জন্য একটি দ্রুতগতিশীল অশ্বশোভিত মণিময়চক্রচতুষ্টয়যুক্ত স্বর্ণময়চন্দ্রাতপযুক্ত রথ পূজক কল্পনা করিলেন।

পরিখীকৃত সপ্ত সাগরং
বহুসম্পৎসহিতং ময়াম্ব তে বিপুলম্।
প্রবলং ধরণীতলাভিধং
দৃঢ়দুর্গং নিখিলং সমর্পয়ামি ॥

মা, ত্রিভুবনে যাহা কিছু আছে সবই তো তোমার। তোমাকে আমি কি দিতে পারি? সপ্তসাগর যাহার পরিখারূপে অবস্থিত, বিপুল পৃথিবীরূপ দৃঢ় দুর্গ তোমাকে সমর্পণ করিলাম।

গন্ধর্বকন্যাগণ গীতবাদ্য দ্বারা তোমার মহিমা কীর্তন করিতেছে। ব্রহ্মা তাঁহার চতুর্মুখে যাঁহার মহিমা কীর্তন করিতে পারেন না, তাঁহার পূজা কি আমাকর্তৃক সম্ভবপর?

হে জগজ্জননি, তুমি আমার হৃদয়কমলে সর্বদা বিরাজ কর।

সাহিত্যের আলোকে শ্রীচৈতন্য

শ্রীহর্ষ দত্ত

প্রতিভাবান সাংবাদিক ও সাহিত্যিক—'দেশ' সাপ্তাহিকের সঙ্গে যুক্ত।

॥ ১ ॥

আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে বাঙালীর প্রবহমান জীবনচর্যার ধারায় একটি মহাজীবন আবির্ভূত হয়েছিলেন, মাত্র সাতচল্লিশ বছরের জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে লোক-অলোকের ঊর্ধ্বে এক অনিঃশেষ জগৎ গড়ে তুলেছিলেন, তারপর প্রাকৃতিক নিয়মেই নশ্বর দেহ তিনি ত্যাগ করেছিলেন। কালের প্রেক্ষাপটে, অতীত ইতিহাসের স্মৃতিচারণে এইটুকুই হয়তো সংবাদ। কিন্তু এখানেই, এত সংক্ষেপিত রূপারোপেই এর শেষ নয়। সেই মহাজীবন—যাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য—বাঙালীর ধ্যানে-জীবনে-অনুধ্যানে যে-প্রভাব, যে-বাণী, যে-আলো রেখে গেছেন তা সূর্যের মতো চিরন্তন, চির-উজ্জ্বল, কালোত্তীর্ণ। আমাদের কালের এক বিনম্র বৈষ্ণবরস-সাধকের ভাষায় : 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয় বাঙ্গালায় এক মহত্তম আবির্ভাব, অবিস্মরণীয় প্রকাশ। পরাধীনতার নিগড়ে বন্দী বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে সে-এক অভিনব অভ্যুদয়। মুক্তির সে-কি অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ! আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের মিলন-উৎসবের সে-কি অপরূপ সমারোহ! গ্রামে গ্রামে আবির্ভূত হইল কবি, গায়ক, সজ্জন। বাঙ্গালী এক নূতন জাতিরূপে নবজন্ম লাভ করিল। এক মহামানবের চরণাঙ্কিত সরণি নব-নারীকে মানবতার পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিল। শশিকিরণোচ্ছল সমুদ্রের মতো শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের করুণাধন্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন নব-জাগরণের জোয়ারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।' (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : ভূমিকা—বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ গ)।

এই 'নবজাগরণের জোয়ারে' বাঙালীর জীবনে শুধু নয়, বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন ও অভিনবত্বের কালজয়ী ছোঁয়া লাগল। বাংলা-সাহিত্যের অঙ্গনে একটি নূতন সাহিত্য-বনস্পতির জন্ম হল। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'চৈতন্যজীবনী-সাহিত্য'। চৈতন্যদেবের জীবৎকাল থেকেই তাঁর জীবন ও বাণীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এই শাখাটি। আশ্চর্যের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষপাদে এসেও চৈতন্যদেবের জীবন ও বাণী অবলম্বনে 'চৈতন্যজীবনী-সাহিত্য' লেখা হচ্ছে। অর্থাৎ পাঁচশ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে। নিরবচ্ছিন্নভাবে। মধ্যযুগেই সংস্কৃত ও বাংলা মিলিয়ে রচিত হয়েছে বারোখানি গ্রন্থ। নাটক ও কাব্যাকারে লিখিত এই গ্রন্থগুলি হল : সংস্কৃতে—

(১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্ : মুরারি গুপ্ত
(২) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্ মহাকাব্যম্ : কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন
(৩) শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক : কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন
(৪) চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী : প্রেমদাস
(৫) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত : শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী
(৬) স্বরূপ দামোদরের কড়চা : স্বরূপ দামোদর

বাংলায়—

(১) শ্রীচৈতন্যভাগবত : বৃন্দাবন দাস
(২) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : কৃষ্ণদাস কবিরাজ
(৩) চৈতন্যমঙ্গল : লোচন দাস
(৪) চৈতন্যমঙ্গল : জয়ানন্দ

(৫) গৌরাঙ্গ বিজয় : চূড়ামণি দাস

(৬) গোবিন্দদাসের কড়চা : গোবিন্দ দাস

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও গণ্য-নগণ্য বহু কাব্যজীবনী এরপর লেখা হয়েছে। সেই সব অখ্যাত ভক্তকবি বা কবিযশঃপ্রার্থীদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমরা উনবিংশ শতকে দৃষ্টি দিয়েও পেয়ে যাই শ্রীচৈতন্যদেবের পূত-পুণ্যজীবনী অবলম্বনে রচিত সাহিত্য। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নবীনচন্দ্র সেনের 'অমৃতাভ'। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক 'চৈতন্য-লীলা', 'নিমাই সন্ন্যাস'। তারপর এই শতকের প্রারম্ভ থেকে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত', রাধাগোবিন্দ বসাকের 'মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ', স্বামী সারদেশানন্দের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব', প্রফুল্লকুমার সরকারের 'শ্রীগৌরাঙ্গ', গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ', সুধা সেনের 'মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ', সুখেন্দুশেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিত ও বাণী'। এছাড়াও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে অথবা হচ্ছে। স্থানাভাবে সেই গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করতে না পারলেও সেগুলির কথা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি। আমরা কয়েকটির মাত্র নামোল্লেখ করলাম।

যুগ যুগ ধরে রচিত, লিখিত, পঠিত চৈতন্যজীবনীগুলির আদিগন্ত প্রসারিত ব্যাপকতা একটি মহাগ্রন্থের নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। তা হল রামের জীবনচরিত—রামায়ণ। কোনও একটি গ্রন্থ নয়, সবকটি চৈতন্যজীবনী গ্রন্থকে এক সঙ্গে স্মরণ করে নাম দিতে পারি 'চৈতন্যায়ন'। প্রত্যেকটি গ্রন্থের অধিদেবতা যেখানে 'নন্দপুরচন্দ্র শচীনন্দন' এবং তাঁর বাণী, সেখানে এই অখণ্ড সম্মিলনের ধারণা নামকরণ খুব অন্যায় হবে না। অমূলক অকল্পনা বলেও মনে হবে না নিশ্চয়ই।

॥ ২ ॥

চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যগুলিতে শ্রীচৈতন্যকে কোন্ দৃষ্টিতে, কোন্ আলোকে দেখেছেন কবি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরের আগে প্রথমেই বলতে হবে—মধ্যযুগের কবি যে-দৃষ্টিতে ও ভাবে দেখেছেন আধুনিক জীবনীকার ঠিক সে-পথে নয়। মধ্যযুগের কবি যুগোচিত আবেগ ও সংস্কারে উদ্বেলিত হয়েছেন, আধুনিক লেখক জীবনী বর্ণনায় যুক্তি ও যুগের প্রেক্ষিকায় শ্রীচৈতন্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। কিন্তু, একথা ভুললে চলবে না, মধ্য ও আধুনিক—দু-যুগের স্রষ্টাই ভক্তিবিনম্র চিত্তে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে একটি প্রণাম নিবেদন করেছেন।

মধ্যযুগের কবি একদিকে শ্রীচৈতন্যকে 'স্বয়ং ভগবান', 'কৃষ্ণাবতার'রূপে অধ্যাত্মচেতনার তুরীয়লোকে উন্নীত করতে কিছু মাত্র দ্বিধা করেননি। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র একটি শ্লোকে 'তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য' বলে চৈতন্য ও কৃষ্ণকে অভিন্নরূপে দেখা হয়েছে। মরমী কবি শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম জানিয়েছেন : 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্' বলে। কবির এই প্রয়াস অবশ্যই সমকালীন যুগচেতনার প্রতিফলন। চৈতন্যজীবনী-কাব্যগুলিতে তৎকালীন সমাজের ধর্মকর্মের যে সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাতে একথা স্পষ্ট যে, বৈষ্ণবভক্তেরা সে-সময়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রার্থনা করেছিলেন। বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন যখন 'কৃষ্ণনামভক্তি শূন্য সকল সংসার', তখন অদ্বৈত প্রভুর আকুল প্রার্থনায় কৃষ্ণ কলিযুগে চৈতন্য নামে ও রূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন—'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য-অবতার।' অবশেষে 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র কবি শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখ দিয়েই বলিয়েছেন :

'তোর উচ্চ সংকীর্তনে নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইনু সর্বপরিবারে॥

সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব॥'

অন্যদিকে, সাহিত্যের আলোক চৈতন্যদেবের দৈবসিক্ত জীবনের ব্যাখ্যা, বর্ণনা ও প্রতিষ্ঠায় প্রতিফলিত হলেও, মধ্যযুগের মানব কবি মর্ত্যভূমির বাতায়ন থেকে চৈতন্যজীবনের মানুষী মহিমার রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মহাপ্রভুর বাল্য-কৈশোর ও যৌবনের যে-রূপটিকে কবি বহুবর্ণে এঁকেছেন, তা যেন আমাদের চেনা একজন গৌরকান্তি মানুষের জীবনচিত্র। যে-জীবন বাল্যের চাঞ্চল্য, কৈশোরের বৈচিত্র্য ও যৌবনের বাসন্তিক মাধুর্যে লীলায়িত।

চৈতন্যচরিতগুলিতে শচীনন্দনের নরলীলার বর্ণনা স্নিগ্ধ মধুর ও বাস্তব রসে সমৃদ্ধ। যেমন শিশুচৈতন্যের চিত্ররূপ:

'শচীর আঙিনা মাঝে ভুবন মোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি॥'

চৈতন্য এখানে অলৌকিক দেবশিশু নন, বাংলার লৌকিক চিরন্তন শিশুদের সঙ্গে অভিন্ন।

কিশোর গৌরাঙ্গের বিদ্যাদর্প, মুরারি গুপ্তের সঙ্গে পরিহাস ও ব্যঙ্গকৌতুক প্রভৃতি এ-বিষয়ে স্মরণীয়। পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণের পর দেশে ফিরে গৌরাঙ্গ পূর্ববঙ্গের কথার অনুকরণ করে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের পরিহাস করতেন। কবির ভাষায়:

'বঙ্গদেশী বাক্য অনুসরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥'

যৌবনের অগ্রদূত, নবীন অধ্যাপক গৌরাঙ্গ মর্ত্যমানুষেরই মতো রাগে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, গার্হস্থ্য ও দাম্পত্যজীবনে একনিষ্ঠ হয়েছেন। আবার সংসারত্যাগের পূর্বমুহূর্তে গৌরাঙ্গের দুহাত ধরে যখন শচীমাতা অশ্রুবেদনায় সিক্ত হয়ে মিনতি করেন: 'না যাইহ না যাইহ বাপ মায়েরে ছাড়িয়া'—তখন ভগবান চৈতন্যের চারিদিকে মানবজীবনের সুখ-দুঃখের পরিচিত জীবনরসই ঘনিয়ে আসে।

জীবনের শেষ কয়েক বছর অর্থাৎ অন্ত্যলীলা-পর্বে শ্রীচৈতন্য 'অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্যমহিমা' নিজে আস্বাদন করেছিলেন ও ভক্তগণকে তার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়েছিলেন। এই দিব্যোন্মাদ ভাবজীবনের যে-রসবর্ণনা চরিতকাব্যগুলির মধ্যে পাই, সেখানেও কৃষ্ণচৈতন্যের মানবীয় মহিমার স্পর্শ লেগেছে। কৃষ্ণৈকশরণ, কৃষ্ণপ্রাণ ও রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্য সমুদ্রের জলে যমুনা ভ্রমে ঝাঁপ দিয়েছিলেন একদিন। ভক্তরা তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করার পর তিনি চোখের জলে হৃদয়-প্রাণ ভিজিয়ে করুণকণ্ঠে বলছেন:

'স্বপ্ন দেখিলাম বৃন্দাবনে।
দেখি কৃষ্ণ রাস করে গোপীগণ সনে॥
জলক্রীড়া করি কৈল বন্য ভোজন।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মন॥'

—আমি সেই গোপীজীবন প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের জলকেলি দেখছিলাম, ওগো তোমরা আমার সেই সাধের স্বপ্ন কেন ভেঙে দিলে?

মধ্যযুগের কবি প্রথমে ভক্ত, তারপর কবি, না প্রথমে কবি তারপরে ভক্ত—একথার মীমাংসা অসম্ভব। শুধু বিতর্ক এড়িয়ে, বলা যায় সেই শ্রদ্ধান্বিত মানুষগুলির মধ্যে কবি ও ভক্তের এক অপূর্ব বিরল সমন্বয় ঘটেছিল। তাই ভক্তের জীবনদৃষ্টি নিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁরা 'দেবতা' করেছেন একদিকে, অন্যদিকে জীবনরসিক কবির দৃষ্টিতে মানুষ চৈতন্যের জীবনাচরণ নিরীক্ষণ করেছেন। দুদিক থেকেই তাঁরা সার্থক। চৈতন্যদেবকে পরিপূর্ণরূপে ভাবীকালের জন্য অশেষ-অনন্ত করে রেখে যাওয়ার জন্য আমরা

তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। মধ্যযুগের কবিদের আমরা প্রণাম জানাই।

আধুনিক চৈতন্যজীবনীকারও ভক্ত। কিন্তু আধুনিক জীবন-নির্ভর নির্মোহ এবং অনেকক্ষেত্রেই নৈর্ব্যক্তিক চেতনার আলোকে চৈতন্যের পুণ্যজীবনের চিত্রখানি এঁকেছেন। ভক্তপ্রবর প্রফুল্লকুমার সরকার তাঁর 'শ্রীগৌরাঙ্গ' গ্রন্থের ভূমিকায় তাই লিখেছেন: 'একদিকে কবি-ভক্তের নিরঙ্কুশ কল্পনা ও অতিপ্রাকৃত বর্ণনা, অন্যদিকে শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মার অবিশ্বাস, বিদ্রূপ ও উপেক্ষা—উভয়কেই পরিহার করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তির উপরে আমি শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ভক্ত, সাধক, গুরু, লোকশিক্ষক, ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ হিসাবেই তাঁহার জীবনকে আমি উপলব্ধি করিয়াছি। বলা বাহুল্য, ভক্তের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপরে আঘাত করিবার কোন ইচ্ছা আমার নাই, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন বিরোধও নাই।'

যুক্তির সঙ্গে নিষ্ঠা, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবতাকে মিলিয়ে নিয়ে আধুনিক লেখক চৈতন্যপূজার উপচার সাজিয়েছেন। আবার সেই শ্রদ্ধার্ঘ্যটির চারপাশে ধূপের সুগন্ধী ধোঁয়ার মতো আবর্তিত হচ্ছে অন্তরের ভক্তিনম্র আবেগ। একটি মহৎ জীবনের স্বরূপ-চিত্রণে এ-যুগের স্রষ্টার বিনীত চিত্ত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ' গ্রন্থের মুখবন্ধই তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ:

'সাধন ভজন নেই, শাস্ত্রজ্ঞান নেই, নেই বা ইষ্টনিষ্ঠা, তবু যে মহাপ্রভুর পুণ্যজীবনী লিখতে প্রবৃত্ত হলাম এ শুধু তাঁরই কৃপায়।… "এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল।" সুতরাং সেই করুণার ধারাস্নানেই আমার যাত্রা। রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ। "মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই-মাধাই। / পতিতপাবনগুণের সাক্ষী দুই ভাই॥" তবে আর ভয় কী, কুণ্ঠা কিসের!'

চৈতন্যজীবনচরিত থেকে আমরা সামগ্রিকভাবে চৈতন্যদেবকে কোন্‌রূপে, কোন্‌ভাবে পেলাম? এর মূল্যায়নে আমরা বলব: পরম সৌভাগ্যে আমরা পেলাম এক মহৎ জীবনকে, যিনি একাধারে মানুষ, একাধারে দেবতা। যিনি আপন জীবনের সাধনার মধ্যে দিয়ে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে প্রেমধর্মের নিগড়ে বেঁধেছিলেন, মানুষের অন্তরে সুপ্ত দেবতাকে জাগ্রত করেছিলেন, 'হরের্নামৈব কেবলম্'—এই ছোট্ট মন্ত্রটি দান করেছিলেন। আর পেলাম তাঁর জীবন ও সাধনা থেকে উৎসারিত এক বাণী—শত আঘাত পেলেও মানুষকে ভালবাসো। এই বাণী আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে প্রযোজ্য, সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, সমস্যা-দীর্ণ সমাজের একমাত্র অবলম্বন ও সান্ত্বনা। এই বাণী চিরদিনের। বলা বাহুল্য চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যগুলি বিগত কয়েকশ বছর ধরে নীরবে সেই বাণীর প্রচার করে চলেছে।

॥ ৩ ॥

জীবনের বাতায়ন থেকে একদল কবি যখন চৈতন্যদেবকে উপলব্ধি করছিলেন, ঠিক তখনই, সমসময়ে বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত আর-একদল কবি চৈতন্যদেবের জীবন ও বাণী নিয়ে রচনা করছিলেন যুগান্তকারী কিছু গান বা পদ। বৈষ্ণবপদাবলীর ধারায় যে-পদগুলি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকা অভিধায় খ্যাত। পর চৈতন্যযুগের পদাবলীতে এই দুই ধারার গীত এক অভূতপূর্ব অশ্রুতপূর্ব সংযোজন।

গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলির মধ্যে দিয়ে কবি বা পদকর্তা আলোকপাত করেছেন শ্রীচৈতন্যের মানবীয় জীবনলীলার অন্তস্তলে। নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গকে, গোরাচাঁদকে, নিমাইকে কবি

আপনরসের মাধুরী মিশিয়ে মূর্ত করে তুলেছেন। কবি পরমানন্দ বড় আনন্দে, বড় বিশ্বাসে অন্তরঙ্গ সুরে বলছেন :

'পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে
পরশ করিলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে
রতন হইল কত জনা ॥
শচীর নন্দন বনমালী।
এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই
গোরা মোর পরাণ-পুতলি ॥'

কিংবা পদকর্তা গোবিন্দ ঘোষ নবদ্বীপবাসীদের প্রাণপ্রিয় মানুষটি যখন সবকিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসের কঠিন পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন আকুল কণ্ঠে কেঁদে বলছেন :

'হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও ॥··
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥'

কবি জানেন, বিশ্বপথিক এই প্রেমের দেবতাটি ঘরে ফিরে আসবেন না, তবুও গৌরাঙ্গের মানসপ্রতিমা অঙ্কনে তিনি তৃপ্ত, অক্লান্ত।

গৌরচন্দ্রিকার পদগুলির বিষয়ও শ্রীগৌরাঙ্গ। কিন্তু গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের সঙ্গে তার সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক লীলাকীর্তনের প্রারম্ভে সেই 'পালার রসদ্যোতক যে গৌরপদ গীত হয়', সেই পদগুলিই গৌরচন্দ্রিকা। এই পদগুলির মূল অবলম্বন রাধাভাবে তদেকাত্ম কৃষ্ণ-স্বরূপ চৈতন্যের ভাবসাধনা। কবি মনীষী চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদে আছে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হয়ে :

'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায় ॥'

রাধাভাবিত শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেম সাধনায় ঠিক এই একই অবস্থার প্রতিরূপ দেখে ভক্ত কবি লিখলেন :

'আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপ-চন্দ।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব ॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুল বনে চলই একান্ত ॥'

এযুগের কবি লিখেছিলেন, 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরিল কায়া।' বস্তুতপক্ষে, গৌরাঙ্গবিষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকার পদগুলি পাঠ করলে মনে হয়, কবিপ্রাণ বাঙালীর অন্তরলোক থেকেই চৈতন্যের জন্ম। এই পদগুলি বৈষ্ণবপদাবলীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব বৈষ্ণবপদাবলীর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য এই পদগুলির মধ্যেও বিধৃত। সুধী সমালোচকের ভাষায়, 'ছন্দে তাহার জঙ্গমতা, সুরে তাহার যৌবনের আবেগ, ভাবে সঞ্জীবন প্রবাহ, ভাষায় বনকুসুমের কোমলতা, লালিত্য এবং সৌরভ। আর ব্যঞ্জনায় লোকালয়ে অলৌকিক লোকের দূরাগত প্রতিধ্বনি। মরজগতের সঙ্গে চিন্ময়ধাম গোলোকের সেতুবন্ধ "বৈষ্ণবপদাবলী"।' গৌরাঙ্গবিষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকার পদের সম্মিলনে আমরা অনায়াসে, কোন্ পুণ্যফলে পেয়ে যাই 'গীতময় বিগ্রহ' শ্রীচৈতন্যদেবকে। পদগুলির সমস্ত সার্থকতা এইখানেই।

॥ ৪ ॥

আমরা এতক্ষণ বলেছি, সাহিত্যের কোন্ আলোকে শ্রীচৈতন্যের মহাজীবন উদ্ভাসিত হয়েছে। সাহিত্যে এই বিশেষ অবতারণা ছাড়াও বাংলা-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় চৈতন্যপ্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। কবিতায়, উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে এবং সর্বোপরি ধর্মতত্ত্ব আলোচনায়। চৈতন্য-আবির্ভাব অথবা চৈতন্য-বাণী সম্পর্কে সাহিত্যস্রষ্টাগণ তাঁদের রচনায়

প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেছেন অকুণ্ঠভাবে, বর্ণনায় অথবা উপমায়, তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় অথবা রস প্রতিষ্ঠায় —যেখানেই প্রয়োজন হয়েছে—শ্রীচৈতন্যকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রত্যেকে স্মরণ করেছেন। সেই শত সহস্র উল্লেখের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। আমরা শুধু একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও এক শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার রচনা থেকে চৈতন্যপ্রসঙ্গ উদ্ধার করে সমাপ্তি অর্ঘ্য সাজাব।

সর্বযুগের বিচারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ শ্রীচৈতন্যপ্রসঙ্গ বিভিন্ন প্রসঙ্গে, বিভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এদের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটির চয়ন :

'ঠাকুর আজ [১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর] কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবেন।···

'ঠাকুর হাসিতেছেন। কেহ কেহ বলিলেন, বেশ্যারা অভিনয় করে। চৈতন্যদেব, নিতাই, এসব অভিনয় তারা করে।

'শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদিগকে)—আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখ্‌বো।

'তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলেই বা। শোলার আতা দেখ্‌লে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।···

'অভিনয় সমাপ্ত হইল। ঠাকুর গাড়ীতে উঠিতেছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখ্‌লেন? ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আসল নকল এক দেখলাম।"

'গাড়ী মহেন্দ্র মুখুয্যের কলে যাইতেছে। হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রেমভরে আপনা-আপনি বলিতেছেন,

"হা কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! জ্ঞান কৃষ্ণ! প্রাণ কৃষ্ণ! মন কৃষ্ণ! আত্মা কৃষ্ণ! দেহ কৃষ্ণ!" আবার বলিতেছেন, "প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন!"···

'মাষ্টার (স্বগতঃ)—ঠাকুর সকলের মঙ্গলের জন্য ভাবিতেছেন। চৈতন্যদেবের ন্যায় ইনিও কি ভক্তি শিখাইতে দেহধারণ করিয়াছেন?'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ)

'শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরের উপর ভালোবাসা এলে একটুতেই উদ্দীপন হয়। তখন একবার রাম নাম করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়।

'মেঘ দেখলে ময়ূরের উদ্দীপন হয়, আনন্দে পেখম ধরে নৃত্য করে। শ্রীমতীরও সেইরূপ হ'তো। মেঘ দেখলেই কৃষ্ণকে মনে পড়তো।

'চৈতন্যদেব মেড়গাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন, এ গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন,—কেননা হরিনাম কীর্ত্তনের সময় খোল বাজে।' (ঐ, ৩য় ভাগ)

'শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা তোমার এসব দেখে কি বোধ হয়?

'মণি—আমার বোধ হয়, তিনজনেই এক বস্তু! —যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি—এক ব্যক্তি!

'শ্রীরামকৃষ্ণ—এক এক! এক বই কি। তিনি (ঈশ্বর),—দেখ্‌ছনা,—যেন এর উপর এমন ক'রে রয়েছে!

'এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—যেন বল্‌ছেন, ঈশ্বর তারই শরীর ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হয়েই রয়েছেন।' (ঐ, ৩য় ভাগ)

'ঠাকুর গঙ্গার ধারের গোল বারান্দায় বসিয়াছেন। কাছে বিজয়, ভবনাথ, মাষ্টার, কেদার প্রভৃতি ভক্তগণ। ঠাকুর এক-একবার বলিতেছেন—"হা কৃষ্ণচৈতন্য!"···

'বিজয়—চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বল্লেন, "নিতাই, আমি যদি সংসার ত্যাগ না করি, তা

হলে লোকের ভালো হবে না। সকলেই আমার দেখাদেখি সংসার করতে চাইবে। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে হরিপাদপদ্মে সমস্ত মন দিতে কেহ চেষ্টা করবে না!"

'শ্রীরামকৃষ্ণ—চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন।

'সাধু-সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করবে। আবার নির্লিপ্ত হলেও, লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনীকাঞ্চন রাখবে না। ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগদ্গুরু! তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে!' (ঐ,/৪র্থ ভাগ)

কথামৃতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এবং কথামৃতকার শ্রীম-র ব্যাখ্যায় চৈতন্যপ্রসঙ্গ কোন্ ব্যঞ্জনায় উন্নীত হয়েছে—তার ব্যাখ্যা দেওয়া বাহুল্য মাত্র। ভক্তগণের হৃদয়ে চৈতন্যপ্রসঙ্গের শুভ্র স্নিগ্ধ আলোখানি অবলীলায় উদ্ভাসিত হবে।

এবার এক শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার রচনালোকে শ্রীচৈতন্য। তিনি রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট প্রমুখ দেবমানবের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে কয়েকটি রচনায় প্রণাম নিবেদন করেছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেই তুলনায় চৈতন্যদেব সম্পর্কে বিশেষভাবে তিনি কিছু লেখেননি। কিন্তু তাঁর বিপুল রচনা সম্ভারের ইতস্তত সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের উল্লেখ ও চৈতন্য-আবির্ভাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমরা পাই। ৪ জুলাই, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কাদম্বিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলছেন: 'এই বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে চৈতন্যের জীবনী আমি অনেক বয়স পর্যন্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছি।' অতএব রবীন্দ্র-সাহিত্যে চৈতন্যপ্রসঙ্গের অবতারণা স্বাভাবিকভাবেই স্থান করে নিয়েছে। আমরা এখানে দুটি মাত্র প্রসঙ্গের উল্লেখ করছি।

এক, 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবকে দেখেছেন বাংলাভাষার বাণীবিগ্রহরূপে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য একটি মহৎ ও বিশেষ কার্য সম্পাদন করেছিলেন। কবির ভাষায়: 'চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।'

দুই, মধুররসের কাব্যসৃষ্টির একমাত্র প্রেরণা ও উৎসরূপে শ্রীচৈতন্যকে গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'সাহিত্য' গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি লিখছেন: 'বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন এক-একটা সময় আসে, যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে-সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাড়াইয়াছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।'

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত 'বৈষ্ণব কবিতা'র কয়েকটি পঙ্‌ক্তি স্মরণ করি:

সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।···
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে!

কার নয়ন, কার মুখ, কার আঁখি?—কবির এই আন্তরিক অবাক-জিজ্ঞাসার উত্তরে একটি

মুখের কথাই আমাদের অন্তরে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। যিনি 'দেবতারে প্রিয়' করেছিলেন, 'প্রিয়েরে দেবতা'।

সাহিত্যের আলোকে শ্রীচৈতন্য-বিষয়ে আলোচনা আরও বিস্তারিত হতে পারে। আরও অনেক বিষয় নিয়ে শ্রদ্ধাবনত আলোচনা করা যেতে পারে পাতার পর পাতা। এই আলোচনার হয়তো শেষ টানা যাবে না কোথাও। অতলান্ত সাগরের মতোই এর গভীরতা ও বিস্তৃতি। অবিরত উর্মি-বিভঙ্গ। অপরিমেয় চৈতন্যসাহিত্য-রূপ জলকল্লোলের ধ্বনি অশেষ, অনন্ত। আমরা সেই বিপুল জলরাশি থেকে সামান্য একটু করপুটে তুলে নিয়ে অঞ্জলি নিবেদন করলাম। আলোচনার এই শেষপর্বে এসে মনে হচ্ছে আমাদের আলোচনার নাম হওয়া উচিত ছিল—চৈতন্যের আলোকে সাহিত্য। সাহিত্যের আলোকে চৈতন্য নয়। যিনি দোলপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে আবির্ভূত হয়ে জগৎ-সংসারকে আলোকিত করেছিলেন, সাহিত্যের সাধ্য কি যে, তাঁর উপরে আলোকসম্পাত করে! বরং তাঁর জীবন ও বাণীকে গ্রহণ করে বাঙালীর সাহিত্য স্বয়ং আলোকিত হয়েছে। স্বর্ণের উজ্জ্বলতা লাভ করেছে।

আমরা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাঁচশত বৎসর আবির্ভাবজয়ন্তীর শুভলগ্নে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও সহস্রপ্রণাম নিবেদন করি:

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঃ একদিনের কথা

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব্ কালচারের প্রকাশন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত।

'মুক্তিসঙ্ঘ'—পরবর্তী কালে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বাধিনায়ক ('সুপ্রীম কম্যান্ডার'), অবিভক্ত বাংলার বিপ্লবীদের 'বড়দা', প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের নাম বাংলার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। শোনা যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পথের দাবী'র সব্যসাচী চরিত্রের ধারণা ও কল্পনা হেমচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর আগে (৩১ অক্টোবর, ১৯৮০) তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। বাংলার অগ্নিযুগের ইতিহাসের এই অন্যতম নায়ক জীবিতকালেই কিংবদন্তীর পুরুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বাংলার বিপ্লব যুগের একটি অধ্যায়ে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের রীতিমত ত্রাসের কারণ। দেশের জন্য বহুবার কারাবাস, বহু নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তিনি। সেই দেশপ্রেমিক আত্মনিবেদিত মানুষটিকে দেখবার, তাঁর সঙ্গে কথা বলবার প্রথম সুযোগ আমার হয়েছিল ১৯৭৮-এর ২৬ মার্চ। প্রথম সাক্ষাতের পর আরও চারদিন আমাদের দেখা হয়েছিল। শেষ সাক্ষাৎ করেছিলাম ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮। রোমাঞ্চকর আমার সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী। স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন বই থেকে তাঁর সম্বন্ধে আগেই অনেক কথা জানতাম। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "স্বামী বিবেকানন্দ: পেট্রিয়ট্-প্রফেট" এবং ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের

"ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব" গ্রন্থ এবং অন্যান্য নানা সূত্রে জেনেছিলাম যে, হেমচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহকর্মী স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের ব্রতে প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁকে দেখার আগ্রহ বহুদিন ধরেই মনে ছিল। আর সেই আগ্রহের প্রধান কারণ হল : (১) স্বামীজীকে দেখেছেন, তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন এমন একজন মানুষকে দেখব যিনি নাকি স্বামীজীরই বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর মুখে স্বামীজী সম্পর্কে স্মৃতিচারণ শুনব এবং (২) ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণে তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে একজন প্রবীণতম এবং শীর্ষস্থানীয় মুক্তিসংগ্রামী হিসেবে তাঁর এবং সাধারণভাবে মুক্তিসংগ্রামীদের কি ধারণা তা জানব।

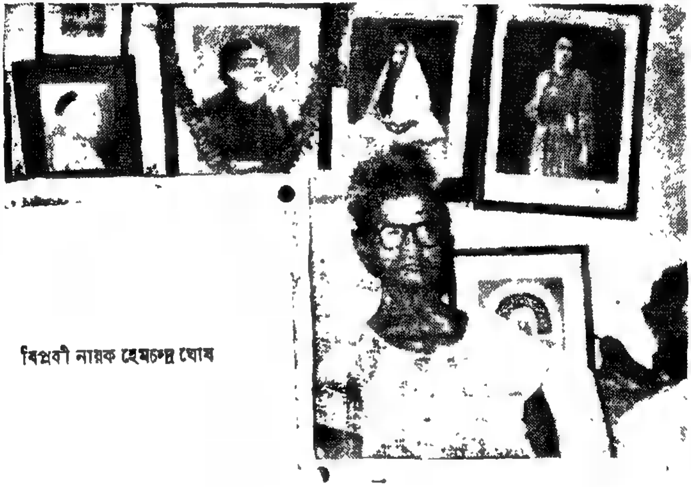

বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ

প্রথম সাক্ষাতের দিনেই তাঁর কাছে আমার আমার উদ্দেশ্যটি জানালাম। আলোচনার বিষয় স্বামীজী হওয়াতে তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে আমার প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। সেই অনুসারে আমি সবসুদ্ধ পাঁচদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিভিন্ন দিনে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তার একটি সুদীর্ঘ লিখিত প্রতিবেদন তাঁর অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম ২ মে, ১৯৭৮। ঐ ব্যাপারে তাঁকে প্রয়োজনীয় অনুরোধ জানিয়ে এসেছিলাম আমাদের শেষ সাক্ষাতের দিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮। সুখের বিষয়, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের সেই সুদীর্ঘ প্রতিবেদনটি তিনি অনুমোদন করেছিলেন, যা এখন আমি উপস্থাপিত করতে যাচ্ছি। প্রতিবেদনে তাঁর অনুমতিসূচক স্বাক্ষরের তারিখ ৬ মে, ১৯৭৮। আমার আর-একটি অনুরোধের ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের শেষদিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল পেয়েছিলাম তাঁর স্বাক্ষরিত (তারিখ ২৩ এপ্রিল, ১৯৭৮) "স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" শিরোনামে তাঁর একটি পৃথক প্রবন্ধ।

প্রথম দিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম : স্বামীজীকে যখন আপনি দেখেন তখন আপনার বয়স কত ছিল ? উত্তরে হেমচন্দ্র বললেন : "আঠারো-উনিশ বছর। আমার জন্ম ১৮৮২ কিংবা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। ঠিক কোন খ্রীষ্টাব্দটা সে নিয়ে একটা

সন্দেহ আছে। তবে এ-দুটিরই কোন একটা হবে। অর্থাৎ আমি এখন ৯৫।৯৬ বছরের বৃদ্ধ।"

সুতরাং আমি যখন তাঁকে দেখলাম তখন তিনি শত বৎসরের প্রান্ত-সীমায় উপনীত—তাঁর নিজের কথায় "৯৫।৯৬ বছরের বৃদ্ধ"। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, প্রায় একটা গোটা শতাব্দীর পুরানো দেহটা বয়সের ধর্মে কিছুটা জীর্ণ এবং অপটু হলেও তাঁর মন তখনও যুবকের মতো সতেজ, স্মৃতিশক্তি তখনও অদ্ভুত প্রখর এবং কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা এবং তেজস্বিতায় তিনি তখনও একটি ঋজু এবং শক্তিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাছে বসে সেটি অনুভব না করে পারছিলাম না। জাতীয় জাগরণে স্বামীজীর ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ২৬ এপ্রিল প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভারতীয় রাজনীতির এক বিখ্যাত জাতীয় নেতার ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মতের সমর্থনে হেমচন্দ্র এক বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিকের লেখা একটি বই থেকে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করেন এবং তাঁর নিজের সংগ্রহ থেকে বইটি আমাকে তৎক্ষণাৎ দিয়ে এবং পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ করে তা মিলিয়ে নিতে বলেন। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিলাম, তাঁর স্মৃতি অসাধারণভাবে নিখুঁত। হেমচন্দ্র তারপর বললেন: "ইংরেজ রাজশক্তি ভারতবাসীকে নৈতিক, মানসিক, বৌদ্ধিক সকল দিক দিয়ে চিরকালের জন্যে পরাধীন করে রাখার যে সুদূরপ্রসারী গভীর ষড়যন্ত্র করেছিল তা স্বামীজীই সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন এবং জাতিকে সেই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছিলেন।" লক্ষ্য করেছিলাম, এই বয়সেও হেমচন্দ্র দেশের সাম্প্রতিক ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন। শুনলাম যে, এখনও রোজ পড়াশুনা করেন। ওঁর পাশেই দেখলাম বই-এর স্তূপ। হালকা স্বাদের বই একটাও নজরে পড়ল না। অন্যান্য অনেক বই-এর মধ্যে আমার চোখে পড়ল এরকম কয়েকখানা বই-এর নাম উল্লেখ করছি: ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের "হিস্ট্রী অব্ দি ফ্রীডম মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া", মাইকেল এডওয়ার্ডস্-এর "দি লাস্ট ইয়ারস অব্ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া", নিবেদিতার "দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম", ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের "ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব", ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "স্বামী বিবেকানন্দ: পেট্রিয়ট-প্রফেট", আর. জি. প্রধানের "ইণ্ডিয়াস স্ট্রাগল ফর স্বরাজ", মোহিতলাল মজুমদারের "বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ" ও "জয়তু নেতাজী", রোমাঁ রোলাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীদ্বয় এবং স্বামী গম্ভীরানন্দের "শ্রীমা সারদা দেবী"।

যে-ক'দিন হেমচন্দ্রের কাছে গিয়েছি প্রত্যেকদিনই দেখেছি স্বামীজীর কথা বলতে গেলেই বারবার তাঁর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাঁর বার্ধক্যজীর্ণ দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ একটা বলিষ্ঠ পৌরুষের আভায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তখন ভাবছিলাম, কী বিরাট শক্তিধর তাহলে ছিলেন সেই পুরুষকেশরী যাঁর শুধুমাত্র নামের উচ্চারণে, প্রায় আশী বছর আগে অল্প কয়েকদিনের জন্যে যাঁর সান্নিধ্যে আসার, কথা শোনার স্মৃতি রোমন্থনে এই পঞ্চনবতিপর বৃদ্ধ বিপ্লবী নায়ক এখনও প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। যেন অন্য এক মানুষ হয়ে যান।

॥ ১ ॥

প্রথম যেদিন গেলাম সেদিন (২৬ মার্চ, ১৯৭৮) হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: স্বামীজীকে আপনি কবে দেখেছিলেন?

হেমচন্দ্র বলেছিলেন: "১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ১৯ তারিখ। স্বামীজী সেদিন প্রথম

ঢাকায় পদার্পণ করেন। সেদিনই তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বস্তুতঃ স্বামীজী যে মুহূর্তে ঢাকা রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফরমে নামলেন তখনই আমি তাঁকে দেখেছি। স্বামীজীকে দর্শন করার জন্যে সেদিন স্টেশনে অসংখ্য মানুষের ভিড় হয়েছিল। যে-কয়জন ভাগ্যবান স্বেচ্ছাসেবক স্বামীজী এবং তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সেই বিরাট উৎসাহী জনতার মধ্যে দিয়ে অতি কষ্টে ‘কর্ডন’ করে ঘিরে স্টেশনের বাইরে তাঁদের জন্যে অপেক্ষারত দুটি সুদৃশ্য সাজানো ঘোড়ার গাড়ির কাছে নিয়ে গিয়েছিল, আমি ছিলাম তাদেরই অন্যতম। স্বামীজীর ট্রেন স্টেশনে পৌঁছানোর অনেক আগে থেকেই স্টেশনে এত ভিড় হয়েছিল যে, সকলের দম আটকে যাবার যোগাড় হয়েছিল। আর তাঁকে নিয়ে ট্রেন যখন স্টেশনে এসে পৌঁছাল তখন স্টেশন ছাপিয়ে গেল মানুষের ভিড়। স্বামীজীকে স্বাগত-অভ্যর্থনা জানাতে সেদিন ঢাকার সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সম্মানে এক বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন হয়েছিল। অত প্রকাণ্ড এবং অত স্বতঃস্ফূর্ত শোভাযাত্রা ঢাকার মানুষ তার আগে কখনও দেখেছিল বলে মনে হয় না। সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত—সকলেই সেই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল। তবে সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল যুবকদের, বিশেষ করে ছাত্রদের উৎসাহ-উদ্দীপনা। দলে দলে অসংখ্য ছাত্র ঐ শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিল। সে-দৃশ্য আমার চোখের সামনে আজও যেন ভাসছে। বাস্তবিক, সেটি ছিল একটি অপূর্ব দৃশ্য। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট কিন্তু একটি অসাধারণ ঘটনার কথা মনে পড়ছে। শোভাযাত্রায় যে-সব ছাত্ররা যোগ দিয়েছিল তারা এবং অন্যান্যরা বারবার পরমহংসদেবের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। কিন্তু একবার ছাত্ররা স্বামীজীর নামে জয়ধ্বনি দেয়। মাত্র একবারই। কিন্তু যেই মাত্র শোভাযাত্রা থেকে সমস্বরে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দেওয়া হল তৎক্ষণাৎ স্বামীজী তার প্রতিবাদ করলেন এবং তার পুনরাবৃত্তি করতে নিষেধ করলেন। গভীর আবেগের সঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন : ‘আমি পরমহংসদেবের দাসানুদাস। জয়ধ্বনি যদি আপনারা দিতে চান শুধু তাঁর নামেই জয়ধ্বনি দিন।’ বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের গুরুভক্তি এবং বিনয়ের দৃষ্টান্তে সবাই তখন একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।[১]

“অন্যান্য অসংখ্য যুবক ও বয়স্ক দর্শনার্থীর মতো আমি এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা রোজই স্বামীজীকে দর্শন ও প্রণাম করতে ঢাকায় স্বামীজীর বাসস্থান ফরাশগঞ্জে মোহিনীবাবুর (মোহিনীমোহন দাসের) বাড়িতে যেতাম। পরম আগ্রহে তাঁর কথা শুনতাম। এইভাবে আমি এবং আমার বন্ধুরা স্বামীজীর শিষ্যদের, বিশেষ করে গুপ্ত মহারাজের (স্বামী সদানন্দের) নজরে পড়ি এবং তাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় আসতে সমর্থ হই। স্বামীজী এবং তাঁর শিষ্যরা ঢাকা এবং ঢাকার কাছাকাছি যে সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থান দেখতে গিয়েছেন আমি সর্বত্রই তাঁদের সঙ্গে গিয়েছি। ঠাকুরের ভক্ত নাগমশায়ের জন্মস্থান দেওভোগেও আমি স্বামীজীর সঙ্গে গিয়েছি। বলা বাহুল্য, ঢাকার জগন্নাথ কলেজ এবং পগোজ স্কুলপ্রাঙ্গণে স্বামীজী ইংরেজীতে যে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন—তাও আমি শুনেছি। সুতরাং অসংখ্য মানুষের সঙ্গে স্বামীজীর অপূর্ব বাগ্মিতা এবং তাঁর সেই

---

[১] স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য থেকে এসে কলকাতায় পদার্পণ করেন, তখন শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তাঁকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা স্বামীজীর নামে জয়ধ্বনি দেন। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, একান্তই যদি জয়ধ্বনি দিতে হয়, তবে তা দিন শ্রীরামকৃষ্ণের নামে। অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শোভাযাত্রীদের অন্যতম। তিনিই এই কথা স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীকে জানিয়েছিলেন।

আশ্চর্য কণ্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্য আমাদেরও হয়েছিল—যার দ্বারা পাশ্চাত্যের মানুষকে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন—জয় করেছিলেন। অবশ্য তখন স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা পুরোপুরি বোঝা আমাদের মতো অল্পবয়সী ছেলেদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসেনি আমাদের। কারণ আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, তাঁর বক্তৃতার আগুন এবং বিচ্ছুরিত শক্তিতরঙ্গ আমাদের সম্পূর্ণভাবে অভিভূত করে দিয়েছিল। পরবর্তী জীবনে আমি ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মীনেতার বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে বাগ্মী হিসেবে তাঁদের কারুরই তুলনা হয় না। স্বামীজীর কি বীর্যময় দৃপ্ত ভঙ্গী, কি তাঁর রাজোচিত অপূর্ব পৌরুষময় চেহারা! বক্তৃতার সময় শ্রোতাদের মনগুলোকে যেন তিনি তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতেন। শ্রোতারা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনত। আর ইংরেজী ভাষার উপর কি তাঁর অসাধারণ দক্ষতা! কি অনবদ্য সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দভাবে তিনি অনর্গল বলতে পারতেন ইংরেজী! আর যখন বলতেন তখন কত শক্তিময় হয়ে উঠত সেই ভাষা! আর সবার উপরে ছিল তাঁর সেই অপূর্ব মাধুর্যময় কণ্ঠস্বর এবং তাঁর বিরাট উজ্জ্বল দুটি চোখ। মানুষের তো দূরের কথা, দেবতারও দুর্লভ বোধ হয় ঐরকম অপূর্ব চোখ। আজ থেকে প্রায় আশী বছর আগে আমি স্বামীজীকে দেখেছি, তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু আজও সেই অপূর্ব চোখ দুটিকে আমি ভুলতে পারিনি। আর তাঁর সেই স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর যেন আজও আমার কানে বাজছে। জীবনে বহু বড় বড় মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছি। তাঁদের মধ্যে দু-চারজনই মাত্র আমার মনে স্থায়ী কোন দাগ রেখেছেন। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখছি যে, একমাত্র স্বামীজীই আমার মনে যে-দাগ রেখেছিলেন তাই আমার সত্তার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে।"

আমি : আচ্ছা, যে-সব বিখ্যাত ভারতীয় বাগ্মীনেতার বক্তৃতা আপনি শুনেছেন তাঁদের সঙ্গে বাগ্মী হিসেবে স্বামীজীর বিশিষ্টতা কোন্ হিসেবে, আপনার মনে হয়?

হেমচন্দ্র ঘোষ : "দেখুন, স্বামীজীর বক্তৃতা যখন আমি শুনেছি তখন আমার অল্প বয়স। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ঐভাবে বিচার করার শক্তি তখন আমার কম ছিল। আর অন্যান্যদের বক্তৃতা যখন শুনেছি তখন আমার বয়স বেশি। সুতরাং মূল্যায়নের ক্ষমতাও বেশি। তবে যতদূর আমার মনে হয়, আকর্ষণীয় চেহারা এবং অপূর্ব কণ্ঠস্বর ছাড়াও স্বামীজীর মধ্যে এমন একটা অতিরিক্ত কিছু শক্তি ছিল যা অন্যান্যদের মধ্যে ছিল না। আর সেই শক্তিটি হল, আমার বিবেচনায়, স্বামীজীর 'ইনার ফোরস্' অথবা যাকে বলা যায়, 'দি ফোরস্ অব্ হিজ্ ডিভাইন্ ইনস্পিরেশন্'—যেটাই কিনা শব্দের আকারে প্রচণ্ড স্রোতের মতো তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসত এবং শ্রোতাদের মনের উপর প্রবল গতিতে এসে আছ্ড়ে পড়ত আর তাদের একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে পৌঁছে দিত চেতনার এক গভীরতম স্তরে। তাই স্বামীজী যখন বক্তৃতা করতেন শ্রোতাদের কাছে, ভাষা তখন কোনরকম বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। তাঁর কথার আবেদন ছিল এত অনিবার্য এবং এত অব্যর্থ। একথা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। স্বামীজী যখন বক্তৃতা করতেন তখন তা ছিল তাঁর অন্তরের অনুভূত আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ। যে-ভাবনাকে, যে-চিন্তাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন, তা-ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কণ্ঠ দিয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে উৎসারিত হত। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এরকমটি ছিল না।

"যাই হোক, আমি আগেই বলেছি যে, স্বামীজী ঢাকায় থাকা কালে তাঁকে প্রত্যেকদিনই আমি দর্শন করেছি এবং নানাভাবে সে সুযোগ আমার হয়েছিল। কিন্তু যদিও স্বামীজীকে তাঁর

ঢাকায় আসার প্রথম দিনেই আমি দর্শন করেছিলাম তবু আমি মনে করি, তাঁকে সত্যিকারের 'প্রথম' এবং 'প্রকৃত' দর্শন আমি করেছিলাম স্বামীজীর ঢাকা থেকে চলে যাবার দু-একদিন আগে।[২] যে-কারণে ঐ দিনটিকে আমার স্বামীজীকে 'প্রথম' এবং 'প্রকৃত' দর্শনের দিন বলছি তা হল এই : ঐ দিনই স্বামীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এবং একান্তে দেখা করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ঐ দিন এবং তার পরের দিন স্বামীজীর সঙ্গে আমার ঐ সাক্ষাতের ফলে আমি জীবনে এক নতুন আলোকের সন্ধান পেয়েছিলাম, যা আমার জীবনের গতিপথকে নির্ধারিত করে দিয়েছিল। অবশ্য ঐ দুর্লভ দর্শনের এবং তাঁর আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা লাভের সৌভাগ্য শুধু আমার একারই হয়নি। আমার সঙ্গে ঐ দুদিনই ছিল আমার 'বাছাইকরা' কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যেমন শ্রীশচন্দ্র পাল, আলিমুদ্দিন আমেদ প্রভৃতি। সবসুদ্ধ আমরা ছিলাম দশ-বারোজন। তাদের মধ্যে একমাত্র আমি ছাড়া আর সকলেই আজ পরলোকের বাসিন্দা। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, আমাদের ঐ দলের প্রত্যেকেই পরবর্তী কালে হয়েছিল এক-একজন দুর্ধর্ষ মুক্তি-সংগ্রামী। যুগনায়কের সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকার তাই শুধু আমারই জীবনের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথকে উন্মুক্ত করে দেয়নি, আমাদের সেই বন্ধুগোষ্ঠীর সকলেরই করেছিল। আমাদের সকলের কাছেই সেই সাক্ষাৎকার যেন একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে আমি এবং আমার বন্ধুরা সবাই দেশের মুক্তির জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলাম। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আমরা কয়েকজন ঢাকায় 'মুক্তি-সঙ্ঘ' গঠন করেছিলাম যা পরে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এ রূপান্তরিত হয় আরও বৃহৎ আকারে ব্যাপক কর্মসূচী ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে। সুতরাং 'মুক্তিসঙ্ঘ' অথবা পরবর্তী কালের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর প্রকৃত অর্থে জন্মলাভ হয়েছিল তখনই যখন স্বামীজীর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য আমরা পেয়েছিলাম। স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের ঐ সাক্ষাতের আগে আমরা ছিলাম বন্ধু—'ফ্রেণ্ডস্'। আর তার পর থেকে আমরা হলাম একই আদর্শে বিশ্বাসী ও একই উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত মরমীসুহৃদ্—'কম্‌রেড্‌স ইন্-ফেইথ্'। স্বামীজীর প্রেরণা আমাদের প্রত্যেককে একটি অখণ্ড এবং অচ্ছেদ্য বন্ধনসূত্রে চিরকালের জন্যে বেঁধে দিয়েছিল।

"এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই আমার মনে আসছে স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহারাজের কথা। গুপ্ত মহারাজ আমাদের বলতেন যে, তিনি হলেন 'স্বামীজীর বান্দা'। গুপ্ত মহারাজই আমাদের স্বামীজীর সঙ্গে ঐভাবে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি তাঁর জন্যেই ঘটা সম্ভব হয়েছিল। সেই মহাপ্রাণ, সদানন্দময় এবং বীর্যবান তেজস্বী সন্ন্যাসীর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। চরিত্র এবং প্রকৃতিতে গুরুর দেওয়া 'সদানন্দ' নামটি তাঁর ক্ষেত্রে হয়েছিল সম্পূর্ণ সার্থক। সিস্টার নিবেদিতা যেমন ছিলেন আত্মনিবেদনের জীবন্ত প্রতিমা, স্বামী সদানন্দও তেমনি ছিলেন তাঁর নামের জীবন্তবিগ্রহ। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সিস্টার নিবেদিতাকেও দেখা এবং তাঁর প্রচুর স্নেহ-ভালবাসা লাভ করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। আমার মনে হয়, স্বামীজী ভারতের কল্যাণের জন্য যেমন প্রাণ চাইতেন, সিস্টার নিবেদিতা এবং গুপ্ত মহারাজ ছিলেন তারই জ্বলন্ত আদর্শ। যাই হোক, আমি

---

[২] ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ৫ এপ্রিল স্বামীজী চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনে যান। সেখান থেকে গৌহাটি হয়ে যান কামাখ্যা। "স্বামীজীর ঢাকা থেকে চলে যাবার দু-একদিন আগে" হলে তারিখটি হওয়া উচিত সম্ভবতঃ ৩ এপ্রিল।

বলছিলাম, স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের সেই বিশেষ সাক্ষাতের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে গুপ্ত মহারাজের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার কথা। আর স্বামীজীর করুণার কথা কি বলব! তাঁর শরীরের অবস্থা তখন বিশেষ ভাল ছিল না এবং সারাদিন সব সময় তাঁর কাছে অসংখ্য দর্শন-প্রার্থীর ভিড় লেগেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পর পর দুদিন আলাদাভাবে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সঙ্গে পরম স্নেহে কথা বলেছেন। আমরা শুনেছিলাম যে, ভারতবর্ষের কত রাজা-মহারাজা, আমেরিকা-ইংলণ্ডের কত গণ্যমান্য, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি স্বামীজীকে দর্শনের জন্য লালায়িত হয়ে থাকেন এবং তাঁর দর্শন পেলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। ঢাকাতেও আমরা নিজের চোখেই দেখেছিলাম শহরের উকিল, কলেজের অধ্যাপক, বহু সম্ভ্রান্ত মানুষ, স্থানীয় কংগ্রেসের নেতা এবং কলেজের ছাত্ররা কিভাবে রোজ দলে দলে স্বামীজীকে দর্শন করার জন্যে, তাঁর কথা শোনার জন্যে মোহিনী-বাবুর বাড়িতে আসতো। এ-সব জেনে এবং দেখেও আমরা তাঁর সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করার আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম। আর আশ্চর্য, তিনিও কয়েকটা অর্বাচীন বালখিল্যের আবদার অনুমোদন করলেন! শুধু অনুমোদন করলেন তাই নয়, তিনি এমন অন্তরঙ্গভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন, এমন আগ্রহের সঙ্গে বললেন যে, আমাদের তখন মনে হয়েছিল যেন আমরা তাঁর বাণীকে রূপদান করতে পারব, তাঁর আশা পূর্ণ করতে পারব! স্বামীজীর কথার বিশেষত্বই হল এই যে, একজন যত নগণ্য এবং তুচ্ছ হোক না কেন স্বামীজীর কথা তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও প্রেরণা সঞ্চারিত করে দেয়। সুতরাং স্বামীজীর নিজের মুখ থেকে যখন আমরা তাঁর কথা সাক্ষাৎভাবে শুনেছিলাম তখন আমাদের মধ্যে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। যাই হোক, এটা এখনও আমার কাছে মাঝে মাঝে একটা রহস্য বলে মনে হয় যে, কেন, কি জন্যে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ আমাদের জন্যে এতখানি করলেন? কারণ, আমি তো জানি, স্বামীজীর সেই দুর্লভ অনুগ্রহ পাওয়ার কোন যোগ্যতাই আমাদের ছিল না। তবে এ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে যা পড়েছি বা জেনেছি তাতে আমার মনে হয় যে, ভারতের জন্যে তাঁর অপরিসীম উদ্বেগ এবং দেশের তরুণ ও যুবকদের উপর তাঁর বিরাট আশা—যাদের তিনি উত্থিত ও জাগ্রত দেখতে চেয়েছিলেন—এর একমাত্র ব্যাখ্যা। আর আমরা যতই অযোগ্য হই না কেন এটা তো ঘটনা যে বিবেকানন্দ নামক সেই বিরাট আগুনের কয়েকটি ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে আমাদের সত্তায় প্রবেশ করেছিল। এবং সেই মহা-আগুনের অনুমাত্রও যদি কারোর মধ্যে কোনভাবে একবার প্রবেশ করে তাহলে তা কখনই নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারবে না। সে ব্যক্তি সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হোন বা না হোন, একদিন না একদিন দেখা যাবেই যে, সেই ক্ষুদ্রতম অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি ক্রমশ বিস্তৃত হতে হতে তার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। আর ঠিক তাই হয়েছে আমাদের ক্ষেত্রে। ভারতের স্বাধীনতা যারা ছিনিয়ে নিয়েছিল ‘মুক্তিসঙ্ঘ’ অথবা ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ যদি ভারত থেকে তাদের দূর করে দেওয়ার ব্যাপারে সামান্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, তবে তার মূলে ছিল সেই বিরাট আগুন থেকে ছিটকে আসা কয়েকটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেগুলি একদিন গুটিকয় কিশোর এবং তরুণের বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং যেগুলিই নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালে তাদের অকুতোভয়ে মুক্তির

দুঃসাহসিক অভিযানে ব্রতী করেছিল। বিপ্লবপথের সেই অভিযাত্রীদের ভবিষ্যৎ স্বামীজী নিশ্চয় তখনই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শুধু প্রত্যক্ষই করেননি; তারা যখন তাঁর পদপ্রান্তে বসেছিল সেই ক্ষণগুলিতে তিনি যেন নিজের হাতে তাদের ললাট-লিপি লিখে তাদের ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করেছিলেন। বাস্তবিক সেই মুহূর্তগুলি ছিল আমাদের কাছে 'মোমেণ্টস অব্ ইপিফ্যানি'—আমাদের জীবনে এক পরম আবির্ভাবের মুহূর্ত।

"স্বামীজীর মাকেও আমরা দেখেছি। তিনিও ঢাকাতে এসেছিলেন স্বামীজীর ঢাকাতে আসার ক'দিন বাদে। তিনি অবশ্য ঢাকাতে ছিলেন না। ছিলেন নারায়ণগঞ্জে—ঢাকা থেকে মাইল আষ্টেক দূরে। একালের শঙ্করাচার্যকে যিনি ভারতবর্ষকে উপহার দিয়েছিলেন সেই মহীয়সী নারীর চরণ স্পর্শ করে আমরা কৃতার্থ হয়েছিলাম। সেদিন ছিল আমাদের জীবনের আর একটি স্মরণীয় দিন যেদিন স্বামীজী ও তাঁর মাকে আমরা নারায়ণগঞ্জে একত্র দেখেছিলাম। তাঁকে দেখে আমাদের মনে হয়েছিল যে, তিনি ছাড়া আর কেউ-ই স্বামীজীর মা হতে পারতেন না।

"প্রায় দীর্ঘ আশী বছর আগে স্বামীজীকে আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু তাঁর স্মৃতি আজও আমার মনে অম্লান হয়ে রয়েছে। তা আমার কাছে গতকালের ঘটনার মতো স্পষ্ট। মাঝে মাঝে সে-সব কথা আমার স্মৃতিতে ঝলসে ওঠে। এই স্মৃতিই আমার জীবনের শেষ দিনগুলির শক্তি [illegible] তৃপ্তির উৎস। পিছনে ফেলে আসা আমার দীর্ঘ জীবনের দিকে চেয়ে দেখি। ছোট-বড় নানা ঘটনা স্মৃতিতে এসে প্রায়ই ভিড় করে; কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের সেই সাক্ষাতের মুহূর্তগুলিই রোমন্থন করে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই আমি। কি এক পুরুষসিংহ যে ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন ভারতবাসী কি এখনও তা বুঝেছে?"

হেমচন্দ্র তাঁর স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেছেন: "বীর সন্ন্যাসীর কাছে আমরা গিয়েছিলাম আমাদের পথনির্দেশ চাইতে। সারা ভারতবর্ষে তিনিই তখন সবচেয়ে আলোড়নকারী ব্যক্তিত্ব। পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার মন্ত্রগুরু, মুক্তির চৈতন্যদাতা। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সেই দিনটি আমাদের জীবনের একটি মাহেন্দ্রক্ষণ। সেদিন স্বামীজী পরম স্নেহে কাছে বসিয়ে আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন। ক্ষাত্রতেজের জ্বলন্ত মূর্তি, বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে, তাঁর মুখ থেকে সরাসরি অগ্নিবাণী শুনছি—একথা স্মরণ করলে এখনও সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেদিন সেই পুরুষসিংহের মুখ থেকে নির্গত বীরবাণী আমাদের দেহ-মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সে তো শুধু বাণী নয়—মন্ত্র, যা অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করে।...স্বামীজীর মধ্যে আমরা দেখেছিলাম প্রচণ্ড দেশপ্রেমের প্রকাশ। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, আমার দেশপ্রেমের প্রকৃত শিক্ষা তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত হয়ে বুঝেছিলাম দেশের প্রতি ভালবাসা কাকে বলে। ভারতবর্ষের প্রকৃত জাগরণ এনেছিলেন তিনিই।"

হেমচন্দ্রের কাছ থেকে সেদিন যখন বিদায় নিলাম তখন তিনি বললেন: "আবার আসবেন। আপনাদের সঙ্গে কথা বললে আনন্দ পাই। আপনারা স্বামীজীকে ভালবেসে ঘর ছেড়েছেন, আমরাও তাঁর ভালবাসার টানেই ঘর ছেড়েছিলাম একদিন। সংসার, স্বজন, ভবিষ্যৎ সব ভাবনা তখন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। শুধু এক ভাবনা ছিল আমাদের কি করে দেশকে স্বাধীন করব। সে ভাবনার বীজ, সে স্বপ্নের নেশা স্বামীজীই আমাদের চেতনায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।" হেমচন্দ্রকে কথা দিয়েছিলাম আবার আসব। শুনে তাঁর চোখ দুটো মনে হল চিক চিক করে উঠল খুশিতে। আবার স্বামীজীর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন বলেই কি? ঠিক তাই। নিজেই তার উত্তর দিলেন: "আবার স্বামীজীর কথা হবে—যা আমার আত্মার আনন্দ।"

বিবেকানন্দের ইসলাম-ভাবনা

অধ্যাপক আবুল হাসনাত

বহরমপুর কলেজে ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক।

ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যের মহান ব্যাখ্যাতা স্বামী বিবেকানন্দ ইসলাম-সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পোষণ করতেন এবং ইসলাম-ধর্ম ও তার আদর্শের প্রতি তাঁর কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, দ্বিধা-দীর্ণ বর্তমানের নিকট এটি একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। বিবেকানন্দ স্বদেশে ও বিদেশে নিরলসভাবে বেদান্ত তথা সনাতন ভারতের ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, ভাষা ইত্যাদির উন্নত মহিমার কথা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তিনি হিন্দুধর্মকে বিশাল পক্ষ দান করেছিলেন, যাতে সে আকাশে পুনরায় উড্ডীন হতে পারে এবং তার জাড্য মোচন করে তার বিশ্ববিজয় সম্পন্ন করতে পারে। আর ঠিক এই কারণেই তাঁকে ইসলাম-সম্পর্কে একান্তই উদাসীন বলে মনে করা কারও কারও পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছিল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁর ইসলাম-ভাবনা সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ-সম্পর্কে দীর্ঘতর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত করার যথেষ্ট উপাদান বিদ্যমান।

রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের পরিবারের মতো নরেন্দ্রনাথের পরিবারেও একটা ইসলামী পরিমণ্ডল ছিল। মোঘল ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে আরবী-ফারসী (বিশেষ করে ফারসী) ভাষা-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ভারতের অভিজাত হিন্দু-পরিবারে খুব স্বাভাবিক-ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত বিখ্যাত অ্যাটর্নি ছিলেন। আইন-ব্যবসায় উপলক্ষে উত্তর ভারতের নানাস্থানে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি অঞ্চলে কর্ম উপলক্ষে থাকাকালে তিনি মুসলমানী আদব-কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আরবী-ফারসী-উর্দুতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।[1] তিনি বাইবেল ও শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে কোরানও বিশেষভাবে পাঠ করেছিলেন। পারিবারিক এই পটভূমিতেই নরেন্দ্রনাথের—ভাবী বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

এই পরিবেশগত উদারতার প্রভাব নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। বাল্যকালে পিতার মুসলমান মক্কেলের নিকট সন্দেশ খাওয়া বা মুসলমান মক্কেলের জন্য নির্দিষ্ট হুঁকায় টান দেওয়ার ঘটনা অনেকের নিকট পরিচিত। এই বৈপ্লবিক প্রয়াস দ্বারা তিনি হিন্দু-সমাজের দীর্ঘদিন পোষিত কঠিন জাতিত্বের ধারণাকে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন। বিডন স্ট্রীটে পীরুর রেস্টুরেন্টে মাংস আহার করার ঘটনার কথা জেনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, “বেশ করেছিস, ভালো হল, তোদের সব কুসংস্কার দুর হয়ে গেল।”[2]

পরবর্তী কালেও এই বিষয়ে বিবেকানন্দের উদারতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বর্ণনা করেছেন, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আবু পাহাড়ের এক গুহায় তপস্যাকালে স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের আতিথ্য গ্রহণ করেন। মুন্সী জগমোহন লাল বিস্মিত হয়ে বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করেন, “আপনি তো হিন্দু-সাধু, আপনি মুসলমান বাড়িতে আছেন কি করে? আপনার খাদ্য হয়ত কখনো-সখনো ছুঁয়েই

---

[1] স্বামী বিবেকানন্দ—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৩, পৃঃ ১০০

[2] বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩

ফেলল?" বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "আপনি বলছেন কি? আমি তো সন্ন্যাসী, আপনাদের সমস্ত বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে। আমি ভাঙ্গীর (মেথরের) সঙ্গে পর্যন্ত খেতে পারি।…আমি দেখি, বিশ্ব-প্রপঞ্চের সর্বত্র ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন। আমার দৃষ্টিতে উচ্চ-নীচ নেই।"[৩]

বিবেকানন্দের এই মানসিক উদারতাই তাঁকে ফারসী সুফী কবিদের উদার মানবতার দিকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দ বাল্যকালে জৌনপুরে থাকাকালে মুসলমান-বন্ধুদের কাছে সুফীদের রচনা ও সাধনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হন এবং সুফী মতে প্রভাবিত হন। বিবেকানন্দ সদানন্দের নিকট সুফী কবিতার রস আস্বাদন করেছিলেন। পারস্যের মহাকবি হাফেজের বিখ্যাত গজল—যার প্রথম লাইন "আগার আঁ তুর্কে শিরাজী বা-দাস্ত্ আবাদ দেলে মা-রা" (কাজী নজরুল ইসলাম এর অনুবাদ করেছিলেন এইভাবে—"যদিই কান্তা শিরাজসজনী ফেরৎ দেয় মোর চোরাই দিল্‌ফের" ইত্যাদি)—এর দ্বিতীয় লাইনের অর্থ হল এইরকম—"(সেই প্রিয়তমার) গালের কালো তিলের বিনিময়ে আমি সমরখন্দ ও বোখারাও বিলিয়ে দিতে পারি।" এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে গিয়ে বিবেকানন্দ আনন্দে বলে উঠতেন, "দ্যাখো, যে-মানুষ প্রেমসঙ্গীতের সমাদর করতে প্রস্তুত নয়, তার মূল্য আমার কাছে কানাকড়িও নয়।"[৪] বিবেকানন্দ বিখ্যাত ফারসী-কবি রুমীর সুফী-ভাবনার দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রেমের উপলব্ধি ও অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ একাকার হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে রুমীর নিম্নলিখিত কবিতাটি বিবেকানন্দের খুব প্রিয় ছিল:

"প্রিয়তমের কাছে গিয়ে দেখলাম—রুদ্ধ দ্বার। করাঘাত করলাম দ্বারে। ভিতর থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর: কে তুমি?

আমি বললাম—আমি, আমি।

রুদ্ধ দ্বার।

আমি ফিরে এলাম—আবার গেলাম—দ্বারে করলাম আঘাত। প্রশ্ন ভেসে এল পূর্ববৎ—কে তুমি?

আমি—আমি—এই যে—এই গো—

রুদ্ধ দ্বার।

তৃতীয়বার যখন আঘাত করলাম, তখনো একই প্রশ্ন।

এবার বললাম—আমি তুমিই, হে প্রিয়!

খুলে গেল দ্বার।"[৫]

কিন্তু এসব ছাড়াও বিবেকানন্দ ইসলাম ও হজরত মহম্মদ (শান্তি) সম্পর্কে যে-সব অসাধারণ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন সেগুলি মুসলমানকে বিশেষভাবে খুশি করে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার বাসনা থেকে উদ্ভূত হয়নি। তিনি বিশ্ব-ইতিহাসপটে ইসলামের রোমান্টিক আবির্ভাব ও তার বিস্ময়কর অগ্রগতির পশ্চাতে যে জ্ঞানের, প্রেমের ও সাম্যের শক্তি, তার বিজয়-অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছিল, সে-বিষয়ে তিনি অনেক মুসলমানের চেয়েও বেশি জানতেন। তাঁর সময় এ-দেশে কার্লাইলের "হিরো এণ্ড হিরো ওয়ারশীপ" বহুল-পঠিত গ্রন্থ ছিল। বিবেকানন্দ সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থের অন্তর্গত "হিরো অ্যাজ প্রফেট" এবং "হিরো অ্যাজ পোয়েট" প্রবন্ধদুটিতে হজরত

---

[৩] ঐ, পৃঃ ৩৮৪

[৪] ঐ, পৃঃ ১৫৪

[৫] ঐ, পৃঃ ১৫৬। দ্রষ্টব্য: The Dabistan or School of Manners, translated by David Shea and Antony Troyer, Vol. III, p. 292

মহম্মদের অপেক্ষাকৃত (স্যার উইলিয়াম ম্যুর প্রমুখদের রচনার তুলনায়) নিরপেক্ষ পরিচয় লাভ করে থাকবেন। তিনি গিবনের "ডিক্লাইন এণ্ড ফল অফ রোমান এম্পায়ার" গ্রন্থ ছাত্রাবস্থায়ই পাঠ করেছিলেন। সেখানে বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের আবির্ভাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন।[৬] পরবর্তী কালে এ-বিষয়ে তিনি আরও গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। তিনি "পরিব্রাজক" গ্রন্থে[৭] এ-বিষয়ে জ্ঞান-আহরণের বিড়ম্বনার একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। প্রাচীন প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি ফরাসী গ্রন্থের (ম্যাসপেরো-কৃত "ইস্তোয়ার আঁসিএন ওরিআন্তাল"—এনসেণ্ট ওরিয়েণ্টাল হিসট্রি) ইংরেজী অনুবাদ সম্পর্কে যখন তাঁকে বলা হল, এই অনুবাদে খ্রীষ্টান-ধর্ম-বিরোধী অংশগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে, তিনি মূল ফরাসী গ্রন্থ পাঠ করে এর সত্যতা উপলব্ধি করলেন। এ-গ্রন্থেও তিনি ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য লাভ করেন।

তাঁর এই-সব গ্রন্থ পাঠ এবং নিজস্ব মুক্ত উদার চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় বিদেশে হজরত মহম্মদ ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করার সময়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুআরি মাসে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্যাসাডোনা শেক্‌সপীয়ার ক্লাবে বিবেকানন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "তারপর আমাদের দৃষ্টি সেই মহাপুরুষ মহম্মদের দিকে নিপতিত হয়, যিনি জগতে সাম্যবাদের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন।…মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্য…।"[৮] ঐ বৎসরই মার্চ মাসে সানফ্রানসিসকোতে তিনি হজরত মহম্মদ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "…জাতি বর্ণ বা অন্য কিছুর প্রশ্ন নাই। সেই সাম্যভাবে যোগ দাও।"[৯] বিবেকানন্দ ইসলাম-ধর্মের সরলতার যথার্থ চিত্র ঐ বক্তৃতায় তুলে ধরেন। ইসলাম যে-আনুষ্ঠানিকতাকে বর্জন করেছে এ-বিষয়ে বিবেকানন্দ অন্য প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, "পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া, সেটা একমাত্র মুসলমান-ধর্মই করিয়াছে। …প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম এই ভাবটিই আনিতে চেষ্টা করিয়াছে।"[১০]

জ্ঞান-বিজ্ঞান সংস্কৃতির প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী এবং সে-ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রগতির প্রতি বিবেকানন্দ ছিলেন একান্তই শ্রদ্ধাশীল। তিনি আধুনিক ইউরোপের নবজাগরণের পশ্চাতে ইসলামীয় সংস্কৃতির উদার জ্ঞানচর্চার অবদানের কথা বহুস্থানে আলোচনা করেছেন। মধ্যযুগের ধর্মান্ধ খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়ের বিজ্ঞান-বিরোধিতার সঙ্গে ইসলামের মুক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার তুলনা করে দেখিয়েছেন, ইসলামে বিজ্ঞান-অনুরাগ কত প্রবল ছিল। তিনি এমন কথাও বলেছেন, "নিউ টেস্টামেণ্টে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নেই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরান বা হাদিসের বহু বাক্যের দ্বারা অনুমোদিত বা উৎসাহিত নয়।"[১১] এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ এতদূর পড়াশুনা করেছিলেন যে,

---

[৬] Gibbon : The Decline and Fall of Roman Empire, Vol. V. Ch.—50

[৭] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১১০

[৮] ঐ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭

[৯] ঐ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯—৪০

[১০] ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৭

[১১] বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৯২

মুসলিমগণ কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী পোড়ানো যে একেবারে ভ্রান্ত এবং ক্রীশ্চানরাই যে এই কাজ করেছিলেন তাও তিনি অবহিত ছিলেন। "পরিব্রাজক" গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, "সে আলেকজেন্দ্রিয়া মূর্খ, গোঁড়া, ইতর ক্রিশ্চানদের হাতে প'ড়ে ধ্বংস হয়ে গেল… ।"[১২] বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ৬ষ্ঠ খণ্ডে সম্পাদক মহাশয় এই ঘটনার একটি ইতিহাস-ভিত্তিক বিবরণ দিয়েছেন।[১৩] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় (১৯৬৯ সংস্করণ, পৃঃ ১০৩২) আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী-প্রসঙ্গে আসল ঘটনা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে ইসলাম—এই প্রসঙ্গেও বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। লুণ্ঠনকারী মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি ছিলেন কঠোর। কিন্তু এ-দেশীয় মুসলিম সম্রাটদের মহত্ত্ব স্বীকার করতে বিবেকানন্দ কুণ্ঠিত হননি কোনদিন। বিশেষ করে আকবর প্রসঙ্গে তো তিনি প্রশংসায় মুখর। এ-বিষয়ে তিনি একটি সুন্দর কথা বলেছেন। "আল্লোপনিষদ্" গ্রন্থে "আল্লা" এবং "মহম্মদ" শব্দ অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে ভেবে অনেকে মনে করেন যে, এই উপনিষদে মুসলিমদের আল্লাহ্ সম্বন্ধে এবং হজরত মহম্মদের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বিবেকানন্দ বলছেন, এই উপনিষদ্ প্রক্ষিপ্ত। আকবরের সময় যে বিচিত্র ভাববিনিময় ক্রিয়াশীল ছিল, এই উপনিষদ্ সম্ভবতঃ সেই সময়ই "রচিত" হয়েছিল।[১৪] এবং আমাদের মনে হয় বিবেকানন্দ ঠিকই বলেছেন।

বিবেকানন্দের ইসলাম ও মুসলমান প্রীতি লক্ষ্য করে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সম্পর্কে বলেন, "ইসলামের নাম উচ্চারণমাত্রে আচার্যদেবের মনে যে-চিত্রের উদয় হইত, তাহা উক্ত ধর্মাবলম্বীদের সাগ্রহ ভ্রাতৃত্ববোধের চিত্র—যাহা সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা দান করিয়াছে এবং উচ্চ অবস্থার মানুষদের মনে গণতান্ত্রিক চেতনা আনিয়া দিয়াছে। …মুসলমানেরা যে কেবল নিম্নবংশে-জাত মানুষের সামাজিক অধিকার উন্নীত করিয়াছিল, তাহাই নয়, তাহারা এই অতি শান্তস্বভাব জাতির মধ্যে সংগঠিত সংগ্রাম ও প্রতিরোধের আদর্শকে সংরক্ষিত ও বর্ধিত করিয়াছিল।"[১৫]

সকল ধর্ম সম্পর্কে এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী বিবেকানন্দ কিভাবে লাভ করলেন? তাঁর নিজস্ব চিন্তা-চেতনার গভীরতা নিশ্চয়ই তাঁকে সাহায্য করেছে। ভারতীয় বেদান্তের সুউচ্চ মহিমাও ক্রিয়াশীল ছিল। ইসলামের উদার সাম্যভাব কম দায়ী ছিল না। তাঁর পূর্বাশ্রমের উদার পারিবারিক পরিবেশ তাঁর মনে গভীর ছাপ রেখেছিল। এই সর্বব্যাপী সাম্য ও সুফীভাব দ্বারা ভারতের বহু মনীষীই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে এ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামীভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কিছুদিন ইসলাম-সাধনাও করেছিলেন। এবং ঐকালে মসজিদেও গিয়েছেন।[১৬] ইসলাম-ধর্ম ও সুফীভাব সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিতির বিষয়ে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থে অনেক তথ্য আছে।[১৭] এ-বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার অপেক্ষা রয়েছে।

---

[১২] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯৭

[১৩] ঐ, পৃঃ ৪৯৯

[১৪] ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫

[১৫] বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯—৪০০

[১৬] শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ইসলাম—স্বামী প্রভানন্দ

[১৭] স্বামী বিবেকানন্দ—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১৮২—৮৩

বিবেকানন্দ তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগের মধ্যেও তাঁর ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ দিয়েছেন। বিবেকানন্দের বাংলা ভাষা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, বেগবান এবং মাটির কাছাকাছি। বাংলা ভাষায় —বিশেষ করে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথ্য ভাষাতে যে-সব আরবী-ফারসী-শব্দের ব্যবহার রয়েছে সেগুলি এ-ভাষাকে জীবনমুখী করে রাখতে অনেকটা সাহায্য করেছে। বিবেকানন্দ তাঁর রচনায় বহু আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন : বাকী, হুঁশিয়ার, জবাব, রোজ, জমি, খুব, খবর, হুকুম, মুশকিল, দখল, আসবাব, ঈশা (বহুস্থানেই যীশুখ্রীষ্ট না বলে ঈশা বলেছেন; "ইমিটেশন অফ ক্রায়েস্ট" গ্রন্থের নামকরণ করেছেন—"ঈশানুসরণ"), বাদশাহ, পয়গম্বর, সুফী এবং আরও অসংখ্য আরবী-ফারসী শব্দ। আজ যখন আমরা জোর করে "আবহাওয়া"কে বদলে "জলহাওয়া" করছি, তখন বিবেকানন্দের শব্দভাণ্ডারের দিকে একটু লক্ষ্য রাখলে ভাল হয় না কি? বিবেকানন্দের এই শব্দ-প্রয়োগ যে সংস্কৃতি-সমন্বয়ে সাহায্য করেছে এ-কথা অস্বীকার করা যায় না।

বিবেকানন্দের এই সমন্বয়-ভাবনার পরম পরিচয় বিধৃত রয়েছে মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে লিখিত তাঁর অতি বিখ্যাত পত্রে (১০ জুন, ১৮৯৮)। এই পত্রে সমন্বয়ধর্মী বিভিন্ন কথার মধ্যে তিনি বলেছেন, "এইজন্য আমার দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত (আদর্শযুক্ত) ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।…

"আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে—হিন্দু ও ইসলাম-ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।"[১৮] বিবেকানন্দ এইরূপ একটি মহান ভারতের চিত্র মনে মনে কল্পনা করেছিলেন। এই কথার দ্বারা বিবেকানন্দ মস্তিষ্ক ও দেহের মতো বেদান্ত ও ইসলামের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক এবং একের অন্যের উপর নির্ভরশীলতার ইঙ্গিত করেছিলেন বলে মনে হয়। আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত এই উক্তির মধ্যে নিহিত থাকতে পারে। "বৈদান্তিক মস্তিষ্ক" বলতে ভারতীয় মনীষার "**transcendent**" রূপ এবং "ইসলামীয় দেহ" বলতে ইসলামের প্রধানতঃ **immanent** রূপ-এর কথাও তিনি বলে থাকতে পারেন। ইসলামের গণতন্ত্র, সাম্য, মানবপ্রেম সবই এই ভাবনার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে ঈশ্বরচিন্তা এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে **immanent** ভাবনা অনেকাংশে প্রবল ছিল বলে মানুষের প্রতি ইসলামে বার বার দৃষ্টি ফেরানো হয়েছে।

যাই হোক। ইসলামের মূল স্পিরিট তিনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং মহান ভারত গড়বার স্বপ্নে তিনি ইসলামকে যথাযোগ্য মর্যাদার ভূমিকাই দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বের মানবপ্রেমী ধর্মগুরু অনেকের অপেক্ষা অধিকতরভাবে ইসলামের মনীষাতে ও মানব-প্রেমের গহনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। এ-বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন। বর্তমানের বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত সংস্কৃতি-চেতনার মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দের ইসলাম-চিন্তার বিশ্লেষণ একটি নতুন আলোক প্রদর্শন করবে, সন্দেহ নেই।

---

[১৮] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯

ভক্তি—রামকৃষ্ণের বাণী এবং জীবনীতে

শ্রীচিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

আনন্দবাজার সংস্থায় যুক্ত বিশিষ্ট লেখক।

ধর্ম তথা দর্শন কোনটাতেই আমার অধিকার নেই। আর 'বেদান্ত' শুরুতেই অধিকারীর যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তাতে মাদৃশাঃ ক্ষুদ্র-জন্তবঃ ধারে কাছেই ঘেঁষতে পারে না। তবে কিনা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি, 'কোন গুণ নাই মোর কপালে আগুন' এবং দার্শনিক বন্ধুরা বলেন ব্রহ্ম 'নির্গুণ' এবং 'তত্ত্বমসি'। অতএব আমিই যখন 'সেই' তখন মোরে আজ থামায় কে রে! অধিকারী অনধিকারীর ভেদাভেদ করুক যারা জ্ঞানবিচারী। আমি তো মুক্ত পাগল। ঘাটাঘাটের বাছাবাছি নেই। জল পেলেই হল। পান করে তৃষ্ণা মেটাই। যা মনে আসে বলি। পাঠক-পাঠিকাদের ক্ষমাশীলতার অন্ত নেই। তাঁরা আমাকে ক্ষমা করেই আসছেন। মাঝে মধ্যে ফোঁস করেন বটে। তবে ছোবল মারেন না। আর যাঁকে নিয়ে আজ সোচ্চার চিন্তা করব তিনি তো মূর্তিমান অভয়—ক্ষমার অবতার। তাঁকে আমার ভয় নেই।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে এবং বাণীতে যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে তাঁকে অদ্বৈতবাদী বলে ধারণা করতে কোন অসুবিধা হয় না। ব্রহ্মের সঙ্গে ব্যক্তির অভেদত্বই তাঁর মূল কথন। সকল ধর্মেরই মূল লক্ষ্য ব্রহ্মোপলব্ধি। তিনি নিজে সকল ধর্মাচরণ করে একই লক্ষ্যে পৌঁছেছেন বারবার। তবে সর্বসাধারণের জন্য ঠাকুরের উপদেশ ছিল ভক্তিমার্গ। জ্ঞানমার্গ নয়। তাঁর (ঈশ্বরের) শরণ যে নেয় বিবেক-বৈরাগ্য এবং জ্ঞান তার কাছে আশীর্বাদের মাধ্যমে স্বাভাবিক-ভাবেই নেমে আসে। প্রেমের আকুতি থাকলে আপনি প্রভু দেবেন ধরা।

ধর্ম সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন, 'যত মত তত পথ', অর্থাৎ এক-একটি ধর্ম এক-একটি পথ মাত্র। পথের মূল উদ্দেশ্য বাড়ি পৌঁছনো, বাড়ি বলতে ব্রহ্ম। সব কিছুরই শেষ কথা। পথ বাড়ি নয়, পথে কেউ থাকে না, অতএব ধর্মও শেষ আশ্রয় হতে পারে না। কিন্তু বাড়ি পৌঁছুতে গেলে যেমন পথের প্রয়োজন হবেই, ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকেও তেমনি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অর্থাৎ যদিও কেবল ব্রহ্মই সত্য তবুও তাঁর কাছে পৌঁছতে হলে জাগতিক ব্যক্তির কাছে ধর্মও সত্য। এই তত্ত্বটি কিন্তু রামানুজের মতের সঙ্গে মিলে যায়। ঠাকুরের মতে কালী, কৃষ্ণ, শিব, আল্লা, গড সবই একেরই নানান নাম। আমরা আমাদের সুবিধের জন্য সেই ব্রহ্মকে নানান নামে ডাকি। রামানুজও বলেছিলেন ব্রহ্ম সত্য। কিন্তু সেই পরমব্রহ্মে মিলনের আগে যে ধাপগুলি আছে পার্থিব লোকের কাছে তার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। তাই ঈশ্বর জাগতিক লোকের জন্য অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানলাভ না হওয়া পর্যন্ত সত্য বৈকি। যিনি এই জাগতিকতার ওপরে উঠতে পারেন তাঁর কাছে তখন শুধু ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব আছে। বাকী সব মিথ্যা—ব্রহ্মেই প্রতিভাসিত। দুটি পর্বে দুরকম সত্য বলেই তাঁর অদ্বৈতে কিছু বিশেষ আছে—তিনি তাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। আর শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত আর সব মিছে। মায়ার খেলায় আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম। যখন মায়ার আবরণ ঘুচে যাবে তখন সত্য উন্মোচিত হবে। সর্প হবে অদৃশ্য। সূর্য যখন ঢাকা থাকে মেঘে, তখন দেখি না তাকে। কিন্তু মেঘ কেটে গেলেই তাঁর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। মায়ার

বাঁধন টুটলেই শুধু ব্রহ্মের দর্শন মেলে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সবিকল্প সমাধিতেও তাঁর শুদ্ধাভক্তিরঞ্জিত দ্বৈত সম্পূর্ণ বিলীন নয়। এই ভাবমুখ সমাধিতে তিনি ঈশ্বরের বিভিন্নরূপ প্রত্যক্ষ করতেন। একই সোনা বিভিন্নরূপে বিভিন্ন নাম পায়। ঈশ্বরও তেমনি নানারূপে নানান নামে বিরাজমান। সাধনার এই স্তর তিনি কাটিয়ে দ্বৈতকে নিঃশেষে বিলয় করে দেন তোতাপুরীর সান্নিধ্যে আসার পর। অদ্বৈতবাদী সাধু তোতাপুরী চল্লিশ বছরের সাধনায় যে নির্বিকল্প সমাধিতে পৌঁছুতে পেরেছিলেন ঠাকুর তিনদিনেই সেখানে পৌঁছে গেলেন। সমাজ-সংসার মিছে সব। মিছে জীবনের কলরব। তাঁর সঙ্গে মিলন হল দ্বৈতহীন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার। শুধু সচ্চিদানন্দে ডুবে যাওয়া। কিন্তু এ পর্যায়ে পৌঁছুবার জন্য সবিকল্প সমাধির সিঁড়িটিকেও তো অস্বীকার করা যায়নি। তাই ঠাকুরের মধ্যে দুটি সত্যই কি দেদীপ্যমান হয়নি?

তাছাড়া অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। অথচ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য—নির্বিকল্প সমাধিলাভের পরেও তিনি পার্থিব ব্যাপারে অত্যন্ত বিচক্ষণের মতো পরামর্শ দিতেন তাঁর চারপাশের লোকজনদের। আধুনিক ব্রাহ্মধর্মের ভক্তিরসের নদীতে ডুব দিয়ে, সচ্চিদানন্দ-সাগরে পৌঁছনোর ধারণাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। ডুব দিলে 'চিকের আড়ালে' যাবা আছে, অর্থাৎ বাড়ির বৌ কাচ্চাবাচ্চার কী হবে? সংসারী লোক যাঁরা তাঁরা চটকরে সচ্চিদানন্দ-সাগরে পৌঁছুবে কি করে? ডুবতে হবে আবার ভেসেও উঠতে হবে মাঝে মাঝে। কেশবচন্দ্রকে ঠাকুর বলেছিলেন এই কথা। অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জগৎ দুইই সত্য। জ্ঞানীর পক্ষে জগৎ মিথ্যা, কিন্তু জগৎকে ভুলে থাকা মিথ্যে ভাবা সংসারী লোকের সাজে না।

নব্য ব্রাহ্মধর্মকে ব্রহ্মরূপ সানাই-এর পোঁ ধরা এবং হিন্দুধর্মকে বহুদেবদেবীরূপ রাগরাগিণীর সঙ্গে তুলনা করে তিনি ভক্তিবাদের স্বীকৃতিই দিয়েছেন। তাই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁকে মনে হয়েছে অদ্বৈতবাদী হয়েও তিনি দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈতকেও উড়িয়ে দেননি—বরং সাধারণের জন্য অধিকারী ভেদে সরলভক্তির পথই নির্দেশ করেছেন। কথামৃতে বারবার পড়েছি, ঠাকুর বলছেন—কলিতে নারদীয় ভক্তি।

দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে-সমন্বয় রহিয়াছে, তাহা জগতের কাছে স্পষ্টরূপে দেখাইতে হইবে। শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহাই দেখাইতে হইবে।...বৈদান্তিক সম্প্রদায়গুলি যে পরস্পর-বিরোধী নহে, পরস্পর সাপেক্ষ, একটি যেন অন্যটির পরিণতি-স্বরূপ, একটি যেন অন্যটির সোপান স্বরূপ...।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ইসলামের অন-ইসলামি সম্পদ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

'আনন্দ' পুরস্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক—লোকসংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে সুপণ্ডিত—জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

॥ ১ ॥

খ্রীষ্টীয় নবম শতকে আব্বাসীয় খলিফাদের আমলেই ইসলামী ঐশীতত্ত্ব তথা সৃষ্টিতত্ত্বকে একটা মজবুত ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা চোখে পড়ে। তৎকালীন পণ্ডিত জনেরা ইসলামকে অনেকখানি নমনীয় করে তোলেন এবং গ্রীক, সিরীয়, ভারতীয় (সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি) ও পহ্লভি ঐতিহ্য থেকে ইসলামকে নতুন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেন। ওইসব ভাষার গ্রন্থাদি আরবিতে অনুবাদ হতে থাকে। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে প্রধানত বিজ্ঞান ও দর্শনসংক্রান্ত উৎসের দিকেই।

কোন চিন্তাই স্বয়ম্ভু বা সমাজবিচ্ছিন্ন আকাশকুসুম যেমন নয়, তেমনি অঋণীও নয়। এখনও পণ্ডিতদের মধ্যে বিবাদ আছে: হোমার মোজেসের কাছে, না মোজেস হোমারের কাছে ঋণী? এতে কৌতুকের ব্যাপার থাকলেও সত্য আছে। মানুষের সব চিন্তাই পরস্পর-সম্পর্কিত উৎস থেকে জাত। প্রত্যেক ধর্মেই একদল পণ্ডিত দেখা যাবে, যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধর্ম বা আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা **Sui generis**—স্বয়ম্ভু। যুক্তি, সাধারণ জ্ঞান এবং ঐতিহাসিক অন্বেষণ এর বিভ্রান্তি দূর করতে পারে।

অবশ্য ইসলাম নিজেই বলেছে, সে কোন নতুন ধর্ম নয়। প্রথম মানুষ আদমই প্রথম মুসলমান এবং ইসলামই পৃথিবীতে ঈশ্বর-নির্ধারিত ধর্ম, যুগে-যুগে পয়গম্বররা যা শোধন করে আসছেন। আপাতদৃষ্টে এই তত্ত্বের মধ্যে গোঁড়ামি লক্ষ্য করা গেলেও তার প্রতিপাদ্যের অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গীটি উদার। কারণ প্রফেটরা পৃথিবীর সর্বত্র আবির্ভূত হন এবং ধর্ম শোধন করেন—এই স্বীকৃতিটিও ওই তত্ত্বে থেকে গেছে। তাছাড়া 'মুসলমান' শব্দটির অর্থই হল আত্মসমর্পণকারী, যে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এদিক থেকে বিচার করলে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণকারী মাত্রেই 'মুসলমান'। একজন ধার্মিক হিন্দুকেও আরবি ভাষায় 'মুসলমান' বলা যাবে। যে-কোন ধর্মকেই বলা যাবে 'ইসলাম', কারণ সব ধর্মই আত্মসমর্পণ। কিন্তু সংস্কারের ভবীকে ভোলানো কঠিন। মুসলমান এবং হিন্দু দুপক্ষই চটে যাবেন। কাজেই মুসলমান মুসলমানই থাকুন এবং হিন্দু হিন্দুই থাকুন, যদিও আরবে গেলে দেখা যাবে ভারতীয় মুসলমানকেও হিন্দু বলা হচ্ছে। (একবার এক হিন্দু ফিল্মস্টারের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে কৌতুকচ্ছলে 'তালাক' শব্দ ব্যবহার করে তিরস্কৃত হয়েছিলাম। কারণ তালাক শুধু মুসলমানের বেলায় নাকি প্রযোজ্য! ভদ্রলোককে বোঝাতে পারিনি আরবি ভাষায় বিবাহ-বিচ্ছেদকেই 'তালাক' বলে। ভাষার ব্যাপারেও মানুষের সংস্কার কী দুর্মর!)

কোন ধর্মই **Sui generis** নয়। ধ্যানযোগে ঐশী-উপলব্ধি হয়তো সম্ভব। কিন্তু ধর্ম জিনিসটা বেজায় জাগতিকও বটে। সে-কারণে ধর্মের সঙ্গে সমাজবিধান, নীতিশাস্ত্র, দর্শন এইসব ব্যাপার অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। অতীতে বিজ্ঞানও ধর্মচিন্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দর্শন ও বিজ্ঞান ছিল ধর্মের গণ্ডিতে দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাতে হাত রেখে। গ্রীস, আরব, ভারত, চীন সর্বত্র। আর

এই সব জাগতিক বিষয় ধর্মের সংশ্লিষ্ট ছিল বলেই এক ধর্মের জ্ঞানী অন্য ধর্মের জ্ঞানীর কাছে হাত পাততে দ্বিধা করতেন না। তাছাড়া মানুষের নিজের যেমন গতিশীলতা আছে, তেমনি তার চিন্তা ও অভিজ্ঞতাও সচল। আবার জ্ঞানীরা নিজেরাই বিশ্বপরিক্রমা করে বেড়াতেন। সংগ্রহ করতেন অন্য জাতি অন্য দেশ ভিন্ন ধর্ম ভিন্নতর সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি। এভাবেই চিরদিন প্রত্যেকটি ধর্ম ও দর্শন নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রত্যেকটি সভ্যতা অপরাপর সভ্যতাকে আত্মসাৎ করেছে। আর মানুষের এই স্বভাবটাকে জানতে হলে খুঁটিয়ে ইতিহাস পড়ার দরকার আছে। আমরা অনেকেই ইতিহাসবিমুখ।

ইহুদি, খ্রীষ্টান, এমন কী হিন্দু ও বৌদ্ধ তত্ত্ব থেকেও ইসলাম সম্পদ সংগ্রহ করেছিল শুনলে কেউ কেউ বিস্ময়ে মূর্ছিত হতেও পারেন। কিন্তু কথাটা ঐতিহাসিক সত্য। আসলে, গোড়াতেই যা বলেছি, ইসলামকে যথাযথভাবে দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল সেই সময় থেকে, যখন ইসলাম আরবদেশের সীমানা ডিঙিয়ে অন্য দেশ ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন চিন্তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল তাদের সঙ্গে। বোঝাপড়ার দরকার যেমন ছিল, তেমনি ইসলামের তত্ত্বকে যাচাই করতেও হচ্ছিল অপর তত্ত্বের নিরিখে।

শুরুতেই বলেছি, ইসলামকে তাই নমনীয় করা হয়েছিল। অর্থাৎ ইসলাম নিজেকে প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অপরাপর তত্ত্বসমূহকে গ্রহণে দ্বিধা করেনি। নিজেকে আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করার স্বার্থেও ইসলাম এই নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছিল। তার ফলে দেখা গেল পরবর্তী আর দুটি শতকের মধ্যেই আরবের মরুভূমির সরল চিন্তাধারা ডালপালা মেলে দিয়ে বিশাল ও জটিল এক বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় নবম শতকে আব্বাসীয় খলিফাদের আমলেই ইসলামের চিন্তাধারায় গভীর এই রূপান্তরের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

॥ ২ ॥

বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে আরবদের নিজস্ব একটি বিস্মিত ভাবনা বরাবরই ছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'the philosophy of Nature' এবং cosmology বা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আরব-ভাবনাটি ছিল অন্যান্য আদিম ট্রাইবদের মতোই স্থূল এবং সরল। আরবি 'ৎব্'-ধাতুনিষ্পন্ন তাবিয়াহ্ শব্দটিতে প্রকৃতি বোঝাত। কিন্তু পরবর্তিকালে আরব পণ্ডিতরা লাতিন natura এবং গ্রীক physis-এর অর্থে তাবিয়াহ্-কে সম্প্রসারিত করেন। একই কথাটিকে আরবি অনুবাদকরা তাবিয়াহ্ কথাটির অর্থেই সিরীয় শব্দ 'Kjono' থেকে বদলে 'কিয়ান' করে নিয়েছিলেন। তাবিয়াহ্ কোরানে পাওয়া যায় না। কিন্তু তব্ বা ৎব্ পাওয়া যায়। সুন্নি এবং শিয়া উভয় সম্প্রদায়ের তফ্সিরকার বা টীকাকার পণ্ডিতরা শব্দটির অর্থ করেছেন পর্দা বা ওড়না, যা মানুষকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে প্রকৃতি নামক জিনিসটি একটি বিলম্বিত ধূসর পর্দার মতো দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতির পর্দা উন্মোচিত হলেই ঈশ্বরদর্শন ঘটবে বা মানুষ ঈশ্বরের সন্নিধানে পৌঁছুতে পারবে।

খুব তাৎপর্যপূর্ণ এই বক্তব্য, কারণ এখান থেকেই যুক্তিবাদী দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম পদক্ষেপ। প্রকৃতি-অধ্যয়নের (Study of Nature) প্রতি মনোযোগিতার উৎসও এখানে।

একথা সত্য, ইসলামের প্রথম যুগেই অর্থাৎ পয়গম্বরের মৃত্যুর পর ইসলামি চিন্তাধারা যথার্থ

দর্শনের রূপ নিতে শুরু করে। তাঁর জামাতা হজরত আলির সমকালে হাসান বসরি এর প্রথম রূপকার। কিন্তু তাঁকে ‘মুতাজিলা’ বা সম্প্রদায়-ত্যাগী বলে কোণঠাসা করা হয়। হাসান বসরিই প্রথম মুতাজিলা দার্শনিক। কিন্তু মুতাজিলা দর্শনে যুক্তিবাদের চেয়েও আবেগেরই ছিল প্রাধান্য এবং বহু পরে সুফিদর্শনে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও মুতাজিলা-আবেগ মিলেমিশে গিয়েছিল। তাহলেও philosophy অর্থে আমরা যাকে দর্শন বলে জানি, গ্রীকচিন্তায় যার উন্মেষ ঘটেছিল এবং মিশর, ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার অনুসরণ ইসলামে দেখা যায় আব্বাসীয় খলিফাদের যুগেই।

॥ ৩ ॥

বহু ইসলামি পণ্ডিত স্রষ্টা ও সৃষ্ট বিশ্ব বোঝাতে ‘হক্’ এবং ‘খাল্‌ক্’ ব্যবহার করেছেন। সুন্নি দার্শনিকদের মধ্যে ‘আশারীয়’ গোষ্ঠীর ধর্মতত্ত্বে স্রষ্টা ঈশ্বর দেশকালাতীত সত্তা এবং বিশ্ব বা ‘তনজিহ্’ হল দেশকালাধীন। হক্ এবং খাল্‌কের মধ্যে ব্যবধান তাঁদের মতে অসীম। খাল্‌কের অন্তর্ভুক্ত জিনিস হল প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হল প্রত্যক্ষ বাস্তবতাসমূহের সমষ্টি। ‘স্রষ্টার পরমা শক্তিতে প্রকৃতি নিরন্তর দ্রবীভূত হয়ে চলেছে।’ আরিস্তোত্‌ল্-বর্ণিত সৃষ্টি-তালিকার দশটি শ্রেণীর মধ্যে শুধু সারপদার্থ, স্থান এবং গুণ বিষয়গত বাস্তবতা (objective realities)। সময়, দেশ (space) এবং ‘বস্তু’ (matter) পরমাণুতে বিভক্ত। এই হল আশর্ গোষ্ঠীর প্রতিপাদ্য। তাঁদের মতে, সব আংশিক এবং তাৎক্ষণিক ‘কারণ’কে ‘পরম কারণ’ গ্রাস করে ফেলেছে। ঈশ্বরই সেই পরম কারণের মূলাধার। যা আপাতদৃষ্টে প্রকৃতির নিয়ম বলে মনে হচ্ছে, তা প্রকৃতিরই স্বভাব। আগুনের স্বভাব যেমন পোড়ানো।

সদা ভ্রাম্যমাণ ইশরাকি সাধু এবং সুফিরা আবার ভারতীয় হিন্দু বেদান্ত ও বৌদ্ধ মায়াবাদী দর্শনচিন্তার পাশাপাশি অবস্থান করছেন। তাঁরা ঈশ্বরের দেশকালাতীত সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু প্রতীকী (তস্‌বিহ্) ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ব-বর্ণিত মধ্যবর্তী পর্দা উন্মোচন সম্ভব বলে মনে করলেও প্রকৃতিজগতকে একটি ভাবজগতের ছায়া বলে বিশ্বাস করতেন। এক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কথাও মনে পড়ে যায়। যা ছায়া, তা মায়া মাত্র। প্রকৃত সত্তার নিছক প্রতীক। বস্তুর প্রতীক বস্তু নয়। হিন্দু বেদান্ত-ভাবনা নবম শতকেই অনুবাদের মাধ্যমে আরবে পৌঁছেছিল। তাই ‘আনাল্ হক্’ বা ‘সোঽহম্’ তত্ত্বকে সুফি-চিন্তায় দেখা যায়। আবার ইশরাকি সাধু বিসায়াহ্ তো বলতেন, ‘এর পর শূন্যতা।’ বৌদ্ধ নাগার্জুনের শূন্যতাবাদের ছাপও খুঁজলে না মেলে এমন নয়, যেখানে ঐশ্বরিক সত্তাও নামহীন শূন্যতায় দ্রবীভূত।

ইসলামি দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রধান ঘাঁটিগুলি ছিল আলেকজান্দ্রিয়া, অ্যান্টিওখ, এদেসা, নিসিবিস, হারান এবং জানদিসাপুরে। এইসব ঘাঁটিতে নতুন ‘স্কুলের’ অভ্যুদয় ঘটে এবং এগুলি সবই অন-ইসলামি উৎস থেকে সংগৃহীত জ্ঞান-সম্পদে সমৃদ্ধ হতে থাকে। মুতাজিলাদের ঐতিহ্য থেকে কট্টর যুক্তিবাদী এবং নৈয়ায়িকরা যা আত্মসাৎ করেছিলেন, তার সঙ্গে আহরিত বিজ্ঞান সম্পদ যুক্ত হয়। অভ্যুদয় ঘটে জ্যোতির্বিদ্ এবং গণিতবিদ্‌দেরও। হারানে বাস করতেন সেবিয়ান সম্প্রদায়। তাঁদের সংগ্রহে ছিল চালদিয়ান এবং গ্রীক বিজ্ঞানের বহু সম্পদ। ইসলামি পণ্ডিতরা তাঁদের কাছেও হাত বাড়িয়েছিলেন। নবম শতক নাগাদ ইসলামের শক্তি স্থিতু হতে পেরেছিল। এভাবে অন-ইসলামি সূত্রে সংগৃহীত জ্ঞানই ইসলামকে একটা স্থায়ী

এবং শক্তিশালী আকৃতি দিতে পারল। পণ্ডিতরা দেখিয়ে দিয়েছেন, এমন কী ইসলামি সমাজ-বিধান, যাকে শরিয়া বা শরিয়ৎ বলা হয়, তাও রোমান আইনের কাছে ঋণী।

হিজরি চতুর্থ শতক (খ্রীষ্টীয় দশম শতক) নাগাদ এইসব পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটে ইসলামি জগতে। আবু নাসের আল-সারাবি, আবুল হাসান আল-মাসুদি, ইয়াহিয়া ইবনে-আদি, ইব্রাহিম ইবনে-সিনান, আবুল ফরজ আল-ইস্পাহানি, আবুল হাসান আল-আম্মিরি প্রমুখ।

তারপরই আবির্ভাব ঘটে তিন বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতের। তাঁরা হলেন: ইখ্ওয়ান আল-সাকা, আলবিরুনি এবং ইব্নে সিনা—যিনি Avicena নামে ইউরোপীয় বিশ্বে সুপরিচিত। আল-বিরুনির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল গভীর। তিনিই পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র ইসলামি জগতে নিয়ে যান। দেখা যায়, নবম শতক থেকেই সংস্কৃত গ্রন্থাদি আরবিতে অনুবাদ শুরু হয়েছিল এবং পরবর্তী শতক পর্যন্ত এই অনুবাদ চলেছিল। ইখ্ওয়ান আল-সাকার গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, তিনি নয়া-পিথাগোরীয় এবং হার্মেটীয় প্রতীক ব্যবহার করছেন। গ্রীক পিথাগোরাসের ঐতিহ্য থেকেই নয়া-পিথাগোরীয় চিন্তার অভ্যুদয় ঘটেছিল। হার্মেটীয় (Hermetic) চিন্তাধারা তৎকালীন ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলিম সাধুদের মধ্যে তো ছিলই। সদা ভ্রাম্যমাণ আরিস্তোতলীয় (Peripatetic) গোষ্ঠীর সাধুদের মধ্যেও অনেকে মুসলিম ছিলেন। বিশেষ করে প্রখ্যাত পণ্ডিত ইবনে সিনা বা আবু সিনাকেও মুসলিম Peripatetic বলা হয়েছে আরবি গ্রন্থাদিতে। ইসলামে আরিস্তোতলীয় প্রকৃতি-দর্শনের উন্মেষ ঘটে তাঁরই মাধ্যমে। (দ্রষ্টব্য: সৈয়দ হোসেন নাসেরের An introduction to Islamic Cosmological Doctrines, U. S. A. ১৯৭৮ সংস্করণ।)

সামগ্রিকভাবে ইসলামকে আমরা তিনটি ভাগে সুস্পষ্টভাবে বিভাজিত করতে পারি। পবিত্র বিধান (শরিয়াহ্/শরিয়ত), পন্থা (তরিকাহ্) এবং সত্য (হকিকাহ্)। প্রথমটি হল বাস্তব জীবনসংক্রান্ত বিধান—যার ব্যাখ্যা নিয়ে সুন্নি ও শিয়ার মধ্যে বিভেদ রয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি সুফিবাদের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। পন্থা এবং সত্য-সংক্রান্ত চিন্তাধারা একান্তভাবে মরমী চিন্তাধারা (esoteric)।

ইসলামে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত চিন্তাধারাকেও মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। তা হল: নক্লি এবং আক্লি। প্রথমটিতে বোঝায়, যা কিছু সঞ্চারিত করা যায় বা পাত্রান্তরে, স্থানান্তরে পাঠানো যায়। দ্বিতীয়টিতে বোঝায়, বোধি বা প্রজ্ঞা। ইব্নে খালেদুন 'মোকাদ্দিমা' গ্রন্থে এর বর্ণনা করেছেন (অনুবাদ: F. Rosenthal, নিউইয়র্ক, ১৯৫৮) বিস্তারিতভাবে। বিজ্ঞান-সংক্রান্ত ইসলামি ভাবনা বিজ্ঞানের তিনটি শাখা কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল: জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতবিজ্ঞান এবং রসায়নবিজ্ঞান। কিন্তু গ্রীকদের বেলাতেও যেমনটি ঘটেছিল, ইসলামি পণ্ডিতদের বেলাতেও তাই, আবার হিন্দুদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং তা হল: আক্লি বা বোধি দিয়ে প্রকৃতি-বিশ্লেষণ। এঁরা সবাই একালের বিজ্ঞানীর মতো শুধু গণিত ও প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় নয়, Vision-এর মাধ্যমেও প্রকৃতি তথা বস্তু ও রূপের বিশ্লেষণ করতেন। নক্লি-প্রক্রিয়া ছিল স্থূলভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতি ও তার স্বরূপ জানতে তাঁরা নির্ভর করতেন Vision-এর ওপরও—যা বোধিসঞ্জাত।…

শিল্পী অসিতকুমার হালদার

সৌজন্যে ঃ অতসী বড়ুয়া।

শিল্পী অসিতকুমার হালদার

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা

প্রখ্যাত প্রবীণ শিল্পী—রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যধন্য—
অবনীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত।

পূজার ছুটির শেষে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হয়েছিলাম ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। আশ্রম বিদ্যালয়ের শ্রেণীবদ্ধ শালগাছের পূর্বপ্রান্তে বীথিকাগৃহে ও দেহলী বাড়ির সংলগ্ন পশ্চিম দিকের নতুন বাড়িতে তখন শিশুবিভাগের ছাত্রগণ বাস করত। বীথিকাগৃহের গৃহাধ্যক্ষ তখন ছিলেন অধ্যাপক কালীমোহন ঘোষ। নতুন বাড়ির গৃহাধ্যক্ষ ছিলেন বিদ্যালয়ের ড্রইং শিক্ষক সন্তোষকুমার মিত্র। বয়সে ছোট ছিলাম বলে আমি বীথিকাগৃহে বাস করতাম। উড়িষ্যার একটি ত্রিভঙ্গমূর্তি অবলম্বনে আঁকা রেখাচিত্র একবার প্রবাসী পত্রিকায় ছাপানো হয়। সেই রেখাচিত্রটিকে দেখে আমি নকল করেছিলাম। কালীমোহন বাবু আমার নকল করা রেখাচিত্রটি দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং চিত্রটিসহ আমাকে সন্তোষ মিত্রের নিকটে পাঠিয়ে দেন। তিনিও চিত্রটি দেখে প্রশংসা করেন এবং আমাকে শিল্পী অসিতকুমার হালদারের নিকটে নিয়ে যান। অসিতবাবু তখন নতুন বাড়ির একটি গৃহে বাস করছিলেন। গৃহটি ছিল দেহলী বাড়ির সংলগ্ন পশ্চিম দিকে। সন্তোষ মিত্রের কাছ হতে আমার আঁকা রেখাচিত্রটি নিয়ে আমাকে বললেন "তুমি তো আঁকতে জান দেখছি" এই বলে তাঁর পাশের একটি কাঠের ডেস্কের ধারে বসিয়ে দিলেন। একটি সাদা ড্রইং কাগজ ও পেন্সিল দিলেন এবং রামায়ণ বইটি খুলে শিল্পী নন্দলালের আঁকা অহল্যা উদ্ধারের ছবি থেকে রামচন্দ্রের ছবিটি নকল করতে বললেন। আমার জীবনে সেই প্রথম দেখা অসিতকুমার হালদারের সঙ্গে। পরবর্তী জীবনে ছয় দশকের কিছু ঊর্ধ্ব কাল ধরে তাঁকে নানাভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। চিত্রবিদ্যায় শিক্ষক রূপে, শিল্প ও সাহিত্য আলোচনায়, রবীন্দ্রসংগীত গাইবার কালে সঙ্গীরূপে, শীতের দিনে গাছের ছায়ায় বসে শিল্প সাহিত্য আলোচনার আড্ডার মধুর স্মৃতি জড়ানো দিনগুলির কথা ভাবলে এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে বড় আনন্দ বোধ করি।

অসিতকুমারের পিতা সুকুমার হালদার ইংরেজ রাজত্বকালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে চাকরি করতেন। শিল্পীর মাতা সুপ্রভাদেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় কন্যা শরৎকুমারীর কন্যা ছিলেন। অসিতকুমার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্কুলের পড়া সমাপ্ত করে কলকাতা সরকারি চারুকলা বিদ্যালয়ে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের নিকটে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার অভিপ্রায়ে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভর্তি হয়েছিলেন। সহপাঠীদের মধ্যে নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ভেঙ্কটপ্পা ইত্যাদিরা ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে হিরণ্ময় রায়চৌধুরী ও অসিতকুমার, লিওনার্ড জেনিংসের নিকট ভাস্কর্যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। চিত্র অঙ্কনের বিষয় নির্বাচনে শিল্পীরা প্রথম দিকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন ভারতীয় দেবদেবীর আখ্যান, রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী, মহাকাব্য, ভারতীয় ইতিহাসের ঘটনা ইত্যাদি থেকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন হতে মুক্তিলাভের প্রেরণা ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধারের সহায়তা করেছে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্র শিল্পিগোষ্ঠী ভারতীয় চারুকলাকে

পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন।

কলকাতায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটির দ্বিতীয় বর্ষের চিত্র প্রদর্শনীতে অসিতকুমারের অঙ্কিত বিরহিণী যক্ষপত্নী, যশোদা, শ্রীকৃষ্ণ, সীতা, নৃত্যরতা অপ্সরা, হংস-দময়ন্তী চিত্রগুলি ছিল। নবীন শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রগুলিকে প্রবাসী পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ছাপিয়ে পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জনসাধারণের মনে শিল্পবোধকে জাগ্রত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

লণ্ডন হতে ১৯০৯-তে লেডি হেরিংহ্যাম ও মিস লুক ডরোথি আর্চার অজন্তা গুহার দেওয়াল-চিত্র নকল করবার জন্য এদেশে এসেছিলেন। হ্যাভেল, ভগিনী নিবেদিতা ও অবনীন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রথমবার নন্দলাল, অসিতকুমার এবং ১৯১০-এ দ্বিতীয়বার অসিতকুমার, ভেঙ্কটপ্পা ও সমরেন্দ্র গুপ্তকে লেডি হেরিংহামের সহযোগিরূপে অজন্তায় পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে অজন্তা-প্রভাবযুক্ত কতগুলি পৌরাণিক বিষয় নিয়ে অসিতকুমার কয়েকটি চিত্র এঁকেছিলেন। তার মধ্যে সীতা, শিব-পার্বতী, গুহক ও রামচন্দ্র, মাতা যশোদা ইত্যাদি চিত্রগুলি প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা সরকারি চারুকলা বিদ্যালয় ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে এসে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে নিয়ে চিত্রবিদ্যা শিক্ষাদানের চেষ্টা তিনি করেছিলেন।

১৯০৯-তে অবনীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিখ্যাত শিল্প সমালোচক এ. কে. কুমারস্বামীর সঙ্গে এবং ১৯১২-তে রাঁচীর নিজ বাড়িতে বিখ্যাত জাপানি শিক্ষাবিদ্ ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয় হয়। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা আহূত হয়ে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যোগীমারা প্রাচীন গুহাচিত্রের নকল করেছিলেন। ১৯১৫-র ২৩ মার্চ লর্ড কারমাইকেল ও তাঁর পত্নী শান্তিনিকেতনে আগমন করেছিলেন। অসিতকুমার তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র মণি গুপ্ত, ডি.এল.রায়, শরদিন্দু, ধীরেন দেববর্মাকে নিয়ে আম্রকুঞ্জের আমগাছগুলির গোড়ায় পদ্মের পাপড়ির আকারে মাটি কেটে তার মধ্যে লাল কাঁকর ভরাট করে নকশা করিয়েছিলেন। সেই সময়ে কারমাইকেল-বেদিটি অসিতকুমারের নকশায় তৈরি করা হয়। কলকাতা সরকারি চারুকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পার্সী ব্রাউন অসিতকুমারকে ভাইস প্রিন্‌সিপ্যালপদে নিয়োগ করেছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাগগুহা পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন।

অসিতকুমার ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন দেহলী বাড়ির সংলগ্ন গৃহে বাস ও কাজ করছিলেন তখন পিয়ার্সন সাহেবও নিকটেই অন্য একটি গৃহে বাস করতেন। অসিতবাবু ও পিয়ার্সন সাহেবের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। পিয়ার্সনের পরিচিতা একজন মার্কিন মহিলা মিসেস ট্রাসী শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কবিতা অবলম্বনে অসিতকুমার একটি চিত্র এঁকেছিলেন। শিল্পিবন্ধুর এই চিত্রটি পিয়ার্সন মিসেস ট্রাসীকে দেখালে তিনি চিত্রটির উচ্চ প্রশংসা করে পাঁচশত টাকা মূল্য দিয়ে চিত্রটি ক্রয় করেন। সেই সময়ে ভারতীয় যে-কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা ছবি একশত বা দেড়শত টাকার মধ্যে বিক্রি হত। অসিতকুমারের ছবি পাঁচশত টাকায় বিক্রি হওয়াতে শিল্পিমহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনে বরাবর একসঙ্গে তাঁকে বাস করতে না দেখলেও মাঝে মাঝে প্রায়ই এখানে এসে বিভিন্ন গৃহে বাস করতে দেখেছি। শান্তিনিকেতনে বড় ফটকের থেকে চীনাভবনের মাঝামাঝি রাস্তার উত্তরদিকে খড়ের ছাউনি

দেওয়া একটা পাকা দেয়ালসহ বাড়ি ছিল। এই বাড়িতেও তাঁকে একবার বাস করতে দেখেছি। তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের "তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে" গানটি অবলম্বনে একটি ছবি এঁকেছিলেন। ছবিটি কলাভবনের সংগ্রহে রাখা আছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলাভবনের অধ্যক্ষ পদে অসিতকুমার যখন শান্তিনিকেতনে সপরিবারে বাস করতে এলেন তখন তিনি এই গৃহেই ছিলেন। পরবর্তিকালে আগুন লেগে বাড়িটি নষ্ট হয়ে যায়।

১৯১৫-র ৭ই পৌষ উৎসবের সময়ে শান্তিনিকেতনে ফাল্গুনী নাটক অভিনয় হয়, রবীন্দ্রনাথ অন্ধবাউল সেজেছিলেন। কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই অভিনয় হয় ১৯১৭-র জানুআরি মাসে। অসিতকুমার ও পিয়ার্সন সাহেব এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ডাকঘর নাটকেও অসিতকুমার দইওয়ালা সেজেছিলেন। রবীন্দ্র-নাটকে যাঁরা ভাল অভিনয় করতেন বলে সুখ্যাতি ছিল অসিতকুমার তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে অসিতকুমারের শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক আগমন ১৯১৯-এ একথা পূর্বে বলেছি। তার পূর্বে কলকাতা সরকারি চারুকলা বিদ্যালয়ে তখন চাকরি করতেন। তাঁর নিকটে যে-সব ছাত্র ছবি আঁকায় শিক্ষা লাভ করতেন তাঁদের মধ্যে হীরাচাঁদ দুগার, অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ ছিলেন। অসিতকুমারের সঙ্গে তাঁরাও শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা ও উক্ত তিনজন শিল্পিছাত্রদের নিয়ে কলাভবনের প্রথম গোড়াপত্তন হয়। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত কলাভবনের প্রথম অধ্যক্ষের পদে অসিতকুমার ছিলেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সপ্তাহে দুদিন করে শান্তিনিকেতনে আসা যাওয়া করলেও পাকাপাকিভাবে কলাভবনের কাজে যোগদান করেন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। কলাভবনের কাজে যোগদান করে শান্তিনিকেতনে শিল্পী অসিতকুমারের অবস্থান তাঁর জীবনের নূতন অধ্যায় সূচনায় সুযোগ এনে দিয়েছিল। নূতন নূতন ছবি আঁকার কাজ ভিন্নও রবীন্দ্রসংগীত যা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় তা গাইবার সুযোগ পেলেন। দ্বারিক নামক গৃহের দোতলায় ছিল কলাভবন আর নিচের তলায় ছিল সংগীতভবন। সংগীতভবনের মাঝের হলঘরটিতে ডোয়ার্কিন কোম্পানির তৈরি ভাল একটি অর্গান রাখা ছিল। প্রতি সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত নূতন গান শেখাতেন। পরদিন সকালে ছবি আঁকার ফাঁকে সংগীতভবনে এসে অসিতদা, অর্ধেন্দু ও আমি শেখানো গানগুলি গাইতাম, অর্গানটি আমি বাজাতাম। অসিতদার যেমনি সুন্দর চেহারা, অন্তরটিও ছিল তেমনি সুন্দর ও স্পষ্টবাদী। তিনি আমাদের শিক্ষক হলেও অন্তরের দিক দিয়ে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। প্রথমদিকে কলাভবনের শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা সচ্ছল ছিল না, প্রতিমাসে মাইনে অল্পই পেতেন অন্যসব সরকারি আর্ট স্কুলের শিক্ষকদের তুলনায়। তা হলেও মনে আনন্দের কোন অভাব ছিল না। একবার বসন্তকালে হোলি উৎসবের সকালের দিকে শালবীথিকার রাস্তার উপরে সতরঞ্চি পেতে দীনেন্দ্রনাথ গানের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গুরুদেবের বসন্তের গান গেয়ে আসর জমিয়েছেন। সংগীতভবনের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীও গানের দলে আছেন। অধ্যাপক জগদানন্দবাবু বেহালা ও আমি এস্রাজ নিয়ে গানের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। গানের আসরে আশ্রমের অনেকে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অসিতদা, নন্দলালবাবু, তেজেশবাবু, গৌরদা, তপনদা ইত্যাদি আরও অনেকে আছেন। তখনকার দিনে হোলির

সময়ে শান্তিনিকেতনে রঙ বা আবির খেলার প্রচলন হয়নি। বেলা এগারটা পর্যন্ত গান চলেছিল। সন্ধ্যার দিকে দ্বারিকের দোতলায় কলাভবনে দীনুবাবুর উপস্থিতিতে তাঁর চা-চক্রের গোষ্ঠীদের নিয়ে বিশেষ গানের আসর বসে। ভীমরাও শাস্ত্রী হিন্দি হোলির গান গাইবেন। এই গানের আসরে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন তপন চট্টোপাধ্যায়, অসিতদা, সরোজদা, তেজেশবাবু, গৌরদা ইত্যাদি। গান যখন খুব জমে উঠেছে তখন হঠাৎ অসিতদা তাঁর লম্বা লম্বা হাত, পা নিয়ে সরোজদার সঙ্গে ধরাধরি করে উঠে আসরের মাঝখানে অপূর্ব ভঙ্গিতে এধার-ওধার চলে নৃত্য করতে শুরু করলেন। সেই নৃত্যের ভঙ্গি এই বৃদ্ধ বয়সেও চোখের উপর ভেসে ওঠে। নন্দলালবাবু, সুরেনবাবু ও আমরা কয়েকজন কলাভবনের ছাত্ররাও ঐ সন্ধ্যার গানের আসরে যোগদান করেছিলাম।

খুব সম্ভব ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে একদিন সকালে কলাভবনে বসে ছবি আঁকছি এমন সময় অসিতদা এসে বললেন, 'চল, পিয়ার্সনের ওখানে যাই, তাঁকে নিয়ে বর্ধমান রেল স্টেশনে গিয়ে রবিদাদা মশায়কে রিসিভ করব। তিনি বিদেশ ভ্রমণের পরে বোম্বে-কলকাতাগামী রেলগাড়িতে আজ সকালের দিকে বর্ধমান রেল স্টেশনে এসে পৌছবেন।' উত্তরায়ণ অঞ্চলে কোনার্ক নামক বাড়িটিতে তখন পিয়ার্সন বাস করছিলেন। অসিতদার সঙ্গে কোনার্ক-বাড়িটিতে এসে দেখি পিয়ার্সন সাহেব একটি চিঠি টাইপ করছিলেন। আমাদের দেখেই বললেন, 'তোমরা একটু বস, আমি চিঠিটির টাইপ শেষ করি।' এই বলে সামনের টেবিলে একটি প্লেটে করে কতগুলি সন্দেশ খেতে দিলেন। নিজে তিনি ভীম নাগের সন্দেশ খেতে খুব ভালবাসতেন। কলকাতায় গেলেই কিছু সন্দেশ সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। আমাদের সন্দেশ খাওয়া হয়ে গেলে দেখি পিয়ার্সন সাহেব ইতিমধ্যে জামা-কাপড় পরে প্রস্তুত। তিনজনে বোলপুর রেল স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলাম। বর্ধমান রেল স্টেশনে পৌছে ওভারব্রিজ দিয়ে যখন পার হচ্ছিলাম তখন লক্ষ্য করলাম বোম্বে-কলকাতাগামী ট্রেনটি ভিন্ন প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি করে ছুটে গিয়ে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আমরা তিনজনে মিলে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কোথাও তাঁকে দেখতে পেলাম না, একটু অবাক হলাম সবাই। এমন সময় দেখা গেল রেলগাড়ির শেষপ্রান্তের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে আসছেন। আমরা তাড়াতাড়ি করে তাঁর নিকটে গেলাম এবং পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বলে উঠলেন, 'ভৃত্য নীলমণিকে বোম্বে পাঠানো হয়েছে আমাকে দেখাশুনো করে নিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু আমাকেই সমস্ত পথটায় নীলমণির খোঁজখবর করতে হয়েছে। বর্ধমানে গাড়ি বদল করতে হবে এ-বিষয়ে তার কোন খেয়াল নেই, দিব্বি ঘুমাচ্ছিল, বলে এলাম জিনিসপত্তর নিয়ে নামবার জন্য।' প্রথম শ্রেণীর যে কামরায় তিনি বসেছিলেন সেখান থেকে তাঁর জিনিসপত্তর তাড়াতাড়ি করে নামিয়ে আনলাম। পরবর্তী বোলপুরগামী রেলগাড়ি ধরে আমরা সকলে বর্ধমান রেল স্টেশন ত্যাগ করেছিলাম।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। তখন সিংহল থেকে এলেন সদ্ধর্ম বাগীশ শ্রীযুক্ত ধর্মধর রাজগুরু মহাস্থবির। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি সাহিত্য, বৌদ্ধ দর্শন, মনোবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকজন সিংহলী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। পুরাতন লাইব্রেরির সংলগ্ন পশ্চিমদিকের একটি

গৃহে তাঁরা সকলে বাস করতেন। গৃহটির নাম ছিল গুরুগৃহ। অসিতদার আঁকা তাঁর শ্রেষ্ঠ ও বড় আকারের কোনাল চিত্রটি যখন আঁকছিলেন তখন উক্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের স্টাডি করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটির চিত্র-প্রদর্শনীর থেকে কলকাতার চিত্রদরদী প্রফুল্লনাথ ঠাকুর কোনাল চিত্রটি ক্রয় করেন। প্রফুল্লনাথ ঠাকুর অসিতদার অনেক ভাল ভাল চিত্র পূর্বেই ক্রয় করেছিলেন।

গোয়ালিয়র মহারাজার আমন্ত্রণে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর ও অসিতকুমার হালদার গোয়ালিয়রে বাগগুহার প্রাচীরচিত্র নকল করতে গিয়েছিলেন। ১৯২৩-এ তাঁর বন্ধু উইলি পিয়ার্সনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। সেই যাত্রায় সেখানে ছয় মাস থাকার কালে ফ্রান্স ও ইতালি দেশ পরিদর্শন করেন। দেশে ফিরে এসে জানতে পারেন কলাভবনের সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিন্ন হয়েছে। পরিবার নিয়ে এ অবস্থায় খুব অসুবিধায় পড়লেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সুপারিশে জয়পুর রাজকীয় কলানিকেতনে অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। পরের বছরে ১৯২৫-এ তিনি লখনউ সরকারি চারুকারু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এইখানে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের সুযোগ পেয়ে শিল্পীর প্রতিভা নানাদিকে বিকাশ লাভ করেছিল। সরকারি চারুকারু বিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দ্বারা তিনি এর প্রভূত উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। এ-বিষয়ে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তথ্যাদিপূর্ণ একটি প্রশংসামুখর সুন্দর প্রবন্ধ প্রবাসী পত্রিকায় তখন ছাপা হয়।

কয়েকটি সম্মান লাভও তিনি করেছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাতের রয়েল সোসাইটি অব্ আর্টের ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৯-এ ভারতীয় ললিতকলা আকাদেমীর সদস্য হন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লখনউ সরকারি চারুকারু বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে বাকি জীবন তিনি লখনউ শহরেই অবস্থান করেন। লখনউ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষপদের শেষের দিকে তাঁর নূতন উদ্ভাবনা "লেকটিক্" চিত্র নামে থি প্লাই কাঠের স্বাভাবিক দাগগুলির সাহায্যে চিত্র এঁকে তার উপরে গালার পাতলা প্রলেপ দেওয়া হত। এই সব চিত্রে অভিনবত্ব থাকলেও তাঁর প্রথম যুগের চিত্রের সেই ভাব-গভীরতার, আবেগের অভাব দেখা যায়। "লেকটিক্" চিত্রগুলি মডার্ন আর্টধর্মী বলা চলে।

সাহিত্যিক অসিতকুমারের দক্ষতা প্রকাশ পায় তাঁর প্রবন্ধে,কবিতায়, গল্পে, নাটকে ও স্মৃতিকথায়। তাঁর লিখিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় আঠারখানি হবে, তার মধ্যে অজন্তা (১৩২০ বঙ্গাব্দ), বাগগুহা ও রামগড় (১৩২৮ বঙ্গাব্দ), য়ুরোপের শিল্পকথা (১৩৪১ বঙ্গাব্দ), ভারতের শিল্পকথা (১৩৪৬ বঙ্গাব্দ), রবিতীর্থে (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), ঋতুসংহার, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, খেয়ালিয়া, মেঘদূত এগুলি তাঁর উৎকৃষ্ট লেখা।

অসিতকুমারের রেখাচিত্রগুলি ও রঙিন চিত্রগুলি প্রধানত লিরিক্যাল বা গীতধর্মী; রসে, ছন্দে অপূর্ব। তিনি নিজেও ছিলেন হাসিতে, কথায়, গানে, আনন্দে সর্বদা উচ্ছল ও প্রাণচঞ্চল। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত লখনউ সরকারি চারুকারু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে যখন তিনি কর্মরত ছিলেন তখন আমি অনেকবার লখনউতে বেড়াতে গেছি। আমার এক আত্মীয়া লখনউতে থাকতেন, তাঁর ওখানে গিয়ে উঠতাম, আবার অনেক সময়ে অসিতদার বাড়িতেও গিয়ে উঠেছি। আমাকে পেলে তিনি খুব আনন্দিত হতেন। গল্পে, গানে, তাঁর লিখিত কবিতা পাঠে দিনগুলি মুখরিত হয়ে উঠত। বাড়িতে একটা অর্গান বাজনা ছিল, সেটা

বাজিয়ে আমার কাছ থেকে যতটা সম্ভব তাঁর অজানা রবীন্দ্রসংগীতগুলি শিখে নেবার চেষ্টা করতেন। লক্ষ্য করতাম রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি কি গভীর আকর্ষণ ও ভালবাসা। অসিতদা বেশ ভালই গান করতে পারতেন। পুরাতন টেনিস খেলার জাল কেটে তিনটি হেমক বা ঝুলন্ত দোলনার মতো তৈরি করে কয়েকটি বড় বড় গাছের ডালে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। হেমকের মধ্যে কম্বল ও বালিশ থাকত। শীতকাল, অসিতদা বিদ্যালয়ের ছুটি উপভোগ করছিলেন। সকাল নয় ঘটিকার মধ্যে অসিতদা, তাঁর এক পিসতুতো ভাই যোধাদা ও আমি হেমকে গিয়ে আরাম করে বসতাম এবং নানা গল্প, সাহিত্য, শিল্প বিষয়ে আলোচনা হত। মাঝে মাঝে নিকটেই বাড়ির থেকে মুখরোচক খাদ্য ও চা পরিবেশিত হত। শীতের ঠাণ্ডার মধ্যে মধ্যাহ্নের রোদ বড় মিষ্টি বোধ হত। আর-একবার লখনউতে গেছি। তখন তিনি সরকারি চারুকারু বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে সেখানেই গোমতী নদীর ধারে সিভিল লাইনের একটি বাড়িতে বাস করছিলেন। গ্রীষ্মকাল শুরু হয় হয়। অপরাহ্ণ বেলা চার ঘটিকার কাছাকাছি সময়ে আমাকে নিয়ে নিকটেই ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর বাড়িতে গেলেন। ঘরের দরজা বন্ধ দেখে হীরুদা, হীরুদা বলে ডাকলেন। দরজা খুলতেই দেখি ঘর অন্ধকার,—বুঝা গেল, হীরুদা দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। অসিতদার সঙ্গে আমাকে দেখেই সাদরে ডেকে নিয়ে বসালেন। হীরুদা ছিলেন গল্পের রাজা, নানারকম গল্প বলতে পারতেন। সেদিনের গল্পের প্রসঙ্গে বলেছিলেন—জয়পুর মহারাজার ভাণ্ডারে প্রচুর হীরা, জহরত ছিল। সেগুলির আসল, নকল যাচাই ও মূল্য ঠিক করার জন্য একজন বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ জহুরীকে আনা হয়েছিল। জহুরী এমনি ওস্তাদ ছিল যে, হীরা, চুনি পাথরটি হাতের মুঠির মধ্যে ধরেই পাথরের উত্তাপ অনুভব করে কোন্‌টি আসল ও কোন্‌টি নকল পাথর বলে দিতে পারত। এমনি সূক্ষ্ম উত্তাপ বোধ ছিল লোকটির। কলকাতার এক দোকান থেকে আমি একটি আংটি খরিদ করে আঙুলে পরেছিলাম। অসিতদা আংটিটি দেখে ভাল লাগায় আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর আঙুলে পরা আংটিটি হীরুদাকে দেখিয়ে বললেন, "তুমি তো সেই পাকা জহুরীর দেশে কিছু কালের জন্য ছিলে, তোমারও নিশ্চয়ই পাথর চেনবার বিদ্যে কিছুটা জানা থাকবে, বল তো এই আংটির পাথরের মূল্য কত হতে পারে?" এই বলে নিজের আঙুল থেকে আংটিটি খুলে হীরুদার হাতে দিলেন। তিনি ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আংটিটি দেখে গম্ভীরভাবে বললেন, তিনশত টাকা তো হবেই। এই কথা শুনে অসিতদা বললেন, এত বেশি হবে না। তার পরে দুইশত টাকা হয়ে যখন দেড়শত টাকায় নামল তখন হীরুদা বললেন, এর চাইতে আর কিছুতেই কম হতে পারে না। অসিতদা হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ধীরেন, ঠিক কত মূল্য ফাঁস করে দাও।" চৌরঙ্গীর এক দোকান থেকে পনের টাকায় কিনবার কথা বলতে হীরুদা একটু থ হয়ে গেলেন এবং নিজের জহুরী বিদ্যার দৌড় কত দূর বুঝতে পেরে আর গম্ভীর থাকতে পারলেন না, একটু হেসে ফেললেন। হীরুদাকে সেদিন খুব ঠকানো গেছিল।

অসিতদার কাছ থেকে যেমন আন্তরিক স্নেহ সর্বদা পেয়েছি, তেমনি তাঁর উদার হস্ত সর্বদা প্রসারিত ছিল যে-কোন প্রকার সাহায্য করবার জন্য। মন তাঁর এত উদার ছিল যে, অতীতের তিক্ততা সহজে ভুলে গিয়ে সকলকেই সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসতেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে অমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে রবীন্দ্রনাথ

লখনউতে এসেছিলেন। এলাহাবাদ ও কানপুরেও সে-যাত্রায় একই কারণে গিয়েছিলেন। তখন লখনউর বিশিষ্ট বাঙালী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বন্ধুদের সহায়তায় বেশ কিছু টাকা বিশ্বভারতীর জন্য অসিতদা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন অসিতদার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। অসিতদাকে দেখে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, "অসিত, তোমাকে দেখতে এখন বেশ খোলতাই হয়েছে।" উত্তরে অসিতদা নাকি বলেছিলেন, "রবি দাদামশাই, এখন যে আমি সিলভারটনিক খাই।" এ-কথাটা পরে অসিতদা হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিলেন।

তাঁর নিজের সংগ্রহ করা চিত্র এবং নিজের আঁকা অনেক চিত্র এলাহাবাদ সরকারি সংগ্রহশালায় প্রদান করেন। অন্যত্র কতকগুলি মিউজিয়ামেও তিনি নিজের আঁকা চিত্র প্রদান করেন। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগে বাংলায় অসিতকুমার শিল্পী হিসাবে যতটা পরিচিত ছিলেন, পরবর্তিকালে সেটা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়,—তার প্রধান কারণ জীবনের শেষের দিকে তিনি উত্তর ভারতেই বরাবরের জন্য বসবাস করেছিলেন বলে। উত্তর ভারতে তিনি বিশিষ্ট শিল্পিরূপে সর্বজন পরিচিত ছিলেন। ভারতীয় শিল্পজগতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিবেকানন্দগতপ্রাণ শরচ্চন্দ্র

শ্রীমতী ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায়

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী'র বিদুষী দৌহিত্রী।

'আজ আপনাকে আর এড়িয়ে যেতে দেব না; বলুন—আপনি আমাকে দীক্ষাদানে ধন্য করবেন?'

ব্যাকুল শরচ্চন্দ্রকে নাগমশায় সস্নেহে ধুলো থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'আমি সামান্য লোক, আমি এসবের কি জানি। স্বয়ং শঙ্কর আপনার গুরু হবেন।'[১] ব্যথিত শরচ্চন্দ্র নাগমশায়ের আশ্বাস বাক্যে পুলকিত হলেও শান্ত হলেন না। এ কেবল স্তোক-বাক্য, নিজে এড়িয়ে যাবার জন্য। জ্ঞানিভক্ত শরচ্চন্দ্রের হৃদয় কিন্তু অচিরেই শান্ত হয়ে আসে—মন বলে উঠল: নাগমশায়ের মতো সিদ্ধপুরুষের মুখের বাক্য কখনও নিষ্ফল হবে না। সুতরাং অপেক্ষা করা যাক।

বৃহৎ কোন সম্ভাবনার আগে পরম করুণাময় ঈশ্বর সবার অলক্ষ্যে প্রাথমিক পর্ব নীরবে সমাধা করে রাখেন। পূর্ববাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) ফরিদপুরের মাদারীপুর মহকুমার অখ্যাত পল্লী কোটাপাড়ার এক শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ইতিপূর্বেই উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে উপযুক্ত চাকরি অন্বেষণে কলিকাতায় বসবাস করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম বিশিষ্ট গৃহিসন্তান নাগমশায় পূর্বপরিচিত সুহৃদ; পিতৃস্থানীয়, পরম আত্মীয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই প্রথম শরচ্চন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে ও আলমবাজার মঠে নিয়ে যান। তাঁরই আগ্রহে শরচ্চন্দ্র পরিচিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ও যোগীন মহারাজের (স্বামী যোগানন্দ) সঙ্গে। বরাহনগরের পরে আলমবাজারের সেই পুরানো

---

[১] "নাগমহাশয়"—বিনোদিনী মিত্র।

বাড়িতে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থানান্তরিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের কঠোর তপস্যা এবং ভগবদ্‌ব্যাকুলতায় শরচ্চন্দ্র এক চুম্বকের মতো আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। কর্ম থেকে অবসর পেলেই তিনি সেখানে গিয়ে জমায়েত হতেন। স্বামীজীর শিষ্য কানাই মহারাজের (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) সঙ্গে হাটবাজার করা, সাধুদের উচ্ছিষ্ট বাসন মাজা এবং শশী মহারাজের আদেশে স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ রান্না ইত্যাদি কর্মে শরচ্চন্দ্র নিজেকে পরম ধন্য মনে করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভ কিন্তু তখনও পর্যন্ত শরচ্চন্দ্রের জীবনে ঘটে ওঠেনি। স্বামীজী ঐ সময়ে পরিব্রাজকরূপে, ভারতবর্ষ পর্যটন করছিলেন এবং তার কিছুদিন পর আমেরিকা যাত্রা করেন। শরচ্চন্দ্র বিমুগ্ধচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের কাছ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনতেন।

সম্ভাবনাময় এক বনস্পতির প্রকাশ-উপযোগী নানাবিধ প্রস্তুতিপর্ব চলেছে তখন। উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র ক্রমশঃ অধ্যাত্মজীবনের প্রাথমিক শিক্ষা এইসব বালসন্ন্যাসীদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে লাগলেন। বেদান্তানুরাগী শরচ্চন্দ্র ক্রমেই তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য উতলা হতে থাকেন। ‘শিবমহিম্নঃ’ স্তব পাঠ করার জন্য সংস্কৃত জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তের একাগ্রহৃদয়ই অধিক কাম্য ; শশী মহারাজের কাছ থেকে এই কথা শুনে শরচ্চন্দ্র ধারণা করতে পারলেন যে, উপলব্ধির রাজ্যে শুষ্ক জ্ঞান নয়,—ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানের সাধনই সমধিক প্রয়োজন। ভক্ত ও ভগবানের হৃদয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা না থাকায়—এক ছিলিম তামাক সেজে, ভোগের পর শ্রীরামকৃষ্ণের পটের সামনে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত ধরে শশী মহারাজের দাঁড়িয়ে থাকা দেখে তাঁর মনে হত, নিশ্চয়ই এঁর মাথায় ছিট আছে। ভাবাবেশে নাগমশায়ের এখানে ওখানে পড়ে যাওয়া এবং দুই গুরুভাই—নাগমশায় ও শশী মহারাজ মুখোমুখি বসে “জয়গুরু” “জয়গুরু” বলতে বলতে সাশ্রুনয়নে ও রুদ্ধকণ্ঠে অবস্থান—সবই তাঁর কাছে নিছক পাগলামি মনে হত। কিন্তু বিধাতার অলক্ষ্য নির্দেশে বিচারপ্রবণ শরচ্চন্দ্রের হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির রস জারিত হতে থাকে। ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের বাস। নিজেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে প্রিয়তম ইষ্টের সঙ্গে যে একাত্মতাবোধ—জীবনের সকল সাধনা—সকল বিচার—সকল ভক্তির সেটা তো শেষ কথা। রসময়ী ধরিত্রীর ঋতুতে ঋতুতে রূপ পরিবর্তনের মতো শরচ্চন্দ্রের আন্তর-প্রকৃতিতেও অপূর্ব বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটতে থাকল—হৃদয়ানুভূতির এক-একটি দ্বার উত্তরোত্তর উন্মোচিত হতে লাগল। বেদান্ত-বিচারের প্রখর নিদাঘ-শেষে ভক্তির রসধারা এল জীবনে। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সার্থক মিলন ঘটল। নবজীবনের আবির্ভাবের শঙ্খ বেজে উঠল।

স্বামীজী দেশে ফিরে এলেন,—সারা বিশ্বে আত্মার বিজয় ঘোষণা করে, তুমুল আলোড়ন তুলে। শরচ্চন্দ্র চললেন তাঁকে দর্শন ও অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসের শেষভাগে এক মধ্যাহ্নে, অন্তর-দেবতার অমোঘ বিধানে, শ্রীগুরুর সঙ্গে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর চাক্ষুষ মিলন ঘটল। স্বামি-শিষ্যের প্রথম মিলন-স্থান বাগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। স্বামীজীর চরণ-সমীপে তাঁকে সেদিন নিয়ে গিয়েছিলেন—স্বামী তুরীয়ানন্দজী। তেজোদৃপ্ত যুবকের প্রাথমিক পরিচিতিতেই বিবেকানন্দ হলেন চমৎকৃত, আকৃষ্ট, —শরচ্চন্দ্র হলেন মুগ্ধ,—সম্মোহিত। এরপর চলল দেয়া-নেয়ার পালা। একজন শুধু বিতরণে উন্মুখ,—অন্যজনে প্রাণভরে কুড়িয়ে নিতে।

ক্রমশঃ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে, দীক্ষালাভের

বিশেষ দিনটি এগিয়ে আসতে লাগল। শরচ্চন্দ্র অবশ্য ইতিমধ্যে মনে-প্রাণে স্বামীজীকেই গুরুপদে গ্রহণ করেছেন। কয়েকদিন আগে এক প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে তিনি আলমবাজার মঠে গিয়ে উপস্থিত। স্বামীজী তখন খালি গায়ে—মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে বিশ্রাম করছেন। নীরবে শরচ্চন্দ্র গিয়ে কাছে বসলেন। হঠাৎ তিনি দেখেন, সাক্ষাৎ 'শঙ্কর' সম্মুখে শয়ান রয়েছেন। শরচ্চন্দ্র বিদ্বান, তার উপর বিচারশীল। কোন দৃশ্যকে বা ঘটনাকে বিনা যুক্তিতে মেনে নেবার পাত্র নন। নিজের চোখকে মার্জন করে ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখেন,—হ্যাঁ সত্যই—জ্যোতির্ময় শায়িত শঙ্কর। ভয় সঙ্কোচ কাটিয়ে আরও নিকটবর্তী হয়ে সুস্পষ্টই দেখেন—যোগমগ্ন অপরূপ শিব-মূর্তি, মানব শরীর নয় কিংবা দৃষ্টির ভ্রমও নয়। বিস্ময়ের আর কূল-কিনারা পান না; এমন সময়, —অন্ধকার রাত্রিতে সহসা বিদ্যুতালোকে আলোকিত পথের দিশার মতো, কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রুত সাধু নাগমশায়ের সেই ভবিষ্যদ্-বাণীর কথা মনে পড়ে যায়। শরচ্চন্দ্র নিঃসংশয় ও নিশ্চিন্ত হলেন। অপেক্ষা করে রইলেন, কবে স্বামীজী তাঁকে শিষ্য বলে সস্নেহে গ্রহণ করবেন। শিবাবতার স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে গ্রহণ করলেন আপন সন্তানরূপে,—আনুষ্ঠানিক অর্থেই তাঁকে দীক্ষা প্রদান করলেন। স্বামীজীর বিশিষ্ট সন্ন্যাসিশিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দের দীক্ষাও ঐদিনেই হয়েছিল।

স্বামীজী বারবারই শিষ্যকে যাচাই করে দেখেন, তরুণ শিষ্যের মনের দৃঢ়তা ও হৃদয়ের গভীরতা কতখানি। বুঝতে চাইলেন,—গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে অথবা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তার কল্যাণ হবে বিবেচনা করে ঐরূপ আদেশ করলে শিষ্য তা পালন করবে কিনা। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় গঙ্গায় নৌকোযাত্রায় গুরুভাইরা সবাই আপত্তি জানালে, স্বামীজী শিষ্যকে বললেন—"চল্ বাঙাল, আমার সঙ্গে"—এও শিষ্যের পক্ষে আর-এক পরীক্ষা! মাঝ-গঙ্গায় হাওয়ার গতি তীব্র হওয়ায় নৌকো খুব জোরে দুলতে লাগল। বাঙালের গুরুভক্তি ততক্ষণে টলোমলো—বুক ভয়ে টিপ্‌টিপ্ করছে। কিন্তু, যেই গুরুর দিকে চোখ পড়ল—দেখে, গুরু নির্বিকার—পরম প্রশান্তি তাঁর চোখে-মুখে,—আনন্দ ভরপুর হৃদয়ে গুণগুণ করে গান গাইছেন। ব্যস্, হৃদয় হতে সব সংশয়, ভয় মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। এই যে সমর্পণ—এ অতি বিরল। এই বিশ্বাসও অতি দুর্লভ! শরচ্চন্দ্রের জীবনে সমর্পণ ও বিশ্বাস শেষ দিনটি পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বরং বলা চলে, উত্তরোত্তর দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। নিবেদিতার হাতে ছোঁয়া মিষ্টি এবং জল খাইয়ে আচারনিষ্ঠ শিষ্যের গোঁড়ামির আর-এক পরীক্ষা নিলেন গুরু। রহস্য করে সবাইকে শুনিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন—'আজ এই ভট্‌চায্-বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে!' দুষ্টুমিভরা হাসি নিয়ে শরচ্চন্দ্রের দিকে ফিরে বললেন—'তার ছোঁয়া মিষ্টি না হয় খেলি, তাতে অত আসে যায় না। কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি করে খেলি?' তৈরি উত্তর—'গুরুর প্রসাদরূপ অমৃত গ্রহণ করেছি। এবং আপনার আদেশে চণ্ডালের ভাতও খেতে পারি।' পরীক্ষার শেষ নেই! আরও একবারের মতো গুরুভক্তির পরীক্ষা হয়েছিল। সর্বগ্রাসী সূর্যগ্রহণের পুণ্যক্ষণে নৈষ্ঠিক গোঁড়া ব্রাহ্মণ যে গঙ্গাস্নান ও জপধ্যানে ডুবে যাবে বলাই বাহুল্য। ছলনা করলেন ব্রহ্মবিদ্ গুরু। স্বামীজী সেদিন কলকাতায় বলরাম-ভবনে। শিষ্যের সেদিন সুযোগ হয়েছিল শ্রীগুরুর জন্য নিজ হাতে রান্না করার। স্বামীজী তাঁর আদরের 'বাঙাল' সন্তানের হাতে পূর্ববঙ্গীয় রন্ধনরীতিতে প্রস্তুত আহার্য

খুব তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী সেদিন খুশি হয়ে বলেছিলেন—'এমন কখনও খাইনি।' কিছুক্ষণের মধ্যেই চারিদিকে শাঁক-ঘণ্টা বেজে উঠলে এবং মেয়েদের উলুধ্বনিতে মুখরিত হলে স্বামীজী শিষ্যকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—'ওরে গেরন লেগেছে—আমি ঘুমোই, তুই আমার পা টিপে দে।' শিষ্যও পরমানন্দে শ্রীগুরুর পদসেবায় রত হয়ে ভাবতে থাকেন—'এই পুণ্যক্ষণে গুরুপদ সেবাই আমার গঙ্গাস্নান ও জপ।' সূর্যগ্রহণের মতো বিশেষ কালে বা পুণ্যক্ষণে গুরুপদ সেবাই যে গঙ্গাস্নান ও জপ-ধ্যানেরও অধিক পুণ্য বহন করে, এই দুর্লভ শিক্ষালাভের এমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগও বা কয়জনের জীবনে ঘটে!

এরপর চলল শরচ্চন্দ্রকে নিজের যোগ্য শিষ্য করে গড়ে তোলার পালা। স্বামীজী স্বয়ং তাঁকে শাস্ত্রপাঠ করাতে লাগলেন। ঋগ্‌বেদের কঠিন ভাবার্থ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জলের মতো সহজ করে দিলেন। শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের অংশ বিশেষের প্রতি কটাক্ষ করে একদিন খোঁচা দিলেন স্বামীজী। শঙ্করাচার্যের প্রতি গভীর অনুরাগবশতঃ শরচ্চন্দ্র কিন্তু ঐ খোঁচাকে নীরবে সহ্য করতে না পেরে,—তেজোদৃপ্ত স্বরে শ্রীগুরুর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন। যেমন অগ্নি তাঁর তেমনই শিখা। পশুরাজ সিংহ যেন বারবারই লেজে কামড় দিয়ে শাবকের অন্তর্নিহিত শক্তির পরীক্ষা নিচ্ছে। যুগাচার্য স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্যকে প্রকৃত অর্থেই বেদান্তজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন এবং উত্তরজীবনে তাঁর সেই গুরুদত্ত আত্মবিস্তার শক্তি সমধিক পরিস্ফুরিত হয়েছিল। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরে বৈদান্তিক শরচ্চন্দ্র তাঁর ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ আচার্যের ভাবানুগ 'বিবেকভাষ্য'—এই শিরোনামে একখানি ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রণয়নায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অসমাপ্ত সেই বেদান্তভাষ্যের ভূমিকাংশটি মাত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৩৬৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

বেদান্তজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী শিষ্যকে গড়ে তুলেছিলেন আদর্শ ভক্তরূপে। শিখিয়েছিলেন ভক্তিরাজ্যের শ্রেষ্ঠ সাধন আত্মনিবেদন—সমর্পণ। তাই তো দেখা যায় যখন সমর্পণ,—শরচ্চন্দ্র সেখানে অনুনয় বিনয় করে গুরুকৃপা ভিক্ষা করছেন,—'বলুন, এ জীবনেই ঈশ্বরলাভ হবে কিনা,—আপনি বলে দিলেই হবে।'

৭৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত, শরচ্চন্দ্রের সমগ্র জীবনে এই জ্ঞান ও ভক্তির আশ্চর্য সমন্বয়ই মূলমন্ত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্রহ্মবিজ্ঞানের সঙ্গে গুরুভক্তির অত্যাশ্চর্য সমীকরণই তাঁর সাংসারিক জীবনের সমস্যাবহুল দিনেও তাঁকে কখন অবসন্ন হতে দেয়নি। শ্রীগুরুর স্থূল অন্তর্ধানের পরে সম্পূর্ণ বিবশ শরচ্চন্দ্রকে উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে আবার সামলে নিতে কিঞ্চিৎ সময় নিয়েছে ঠিকই—কিন্তু সেই বিহ্বলতাও ভগবদ্‌বিরহেরই নামান্তর। 'স্বামীজীর প্রতি', 'পূর্বস্মৃতি' প্রভৃতি রচনায় প্রকাশিত তাঁর হৃদয়ের সেই বিরহ-বিধুর-ভাব বড়ই করুণ! হৃদয়ব্যথা, জলভরা মেঘের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ এখানে ওখানে চাপ বেঁধে রয়েছে—কবিতার ছত্রে ছত্রে; বড় নিবিড়, মর্মবেদনা মাখা! কথার ছলে, আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে শ্রীগুরুপ্রদত্ত মূল্যবান উপদেশগুলিই তাঁর ব্যক্ত হয়েছে জীবনের অন্তিম দিনেও।

সে ১৯১১/১২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। শরচ্চন্দ্র তখন ফরিদপুরের কুরাশি গ্রামের কোটাপাড়ায় বাস করছেন। সম্ভবতঃ মেদিনীপুর থেকে বরিশালে বদলীর প্রাক্‌কালে। গুরুর অদর্শন-জনিত ব্যথা ততদিনে পরিণতরূপ নিয়েছে। প্রথমা কন্যা সন্তান—সাড়ে তিন বৎসর বয়সে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। প্রাণের আশা

আর নেই। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা শরচ্চন্দ্রের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর কথা শোনার জন্য এসেছেন। শরচ্চন্দ্র শ্রীগুরুর আলোচনায় তন্ময় হয়ে তখন অন্য জগতে বিচরণ করছেন। এমন সময়ে অন্দর মহলে কান্নার রোল উঠল। পরিচারিকা এসে খবর দিল—'দাদাঠাকুর, দিদিমণি যে চলে গেলেন, একবার এসে দেখে যাবেন না?' শরচ্চন্দ্র নীরবে উঠে ঘরের জানলাগুলি বন্ধ করে দিলেন—পাছে ভিতর-বাড়ির কান্নার শব্দ এসে প্রসঙ্গের বিঘ্ন করে। বললেন—'শরীর আসবে আবার যাবে, কিন্তু আজকের মতো দুর্লভ দিন আর জীবনে আসবে না। এঁরা শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজীর কথা শোনবার জন্য এসেছেন, কাঁদবার দিন অনেক আসবে কিন্তু স্বামীজীর কথা শোনবার লোক জীবনে সব সময়ে পাওয়া যাবে না। স্বামীজীর কত দয়া! এই দারুণ শোকের ক্ষণটিতে ঠিক নিজের জন পাঠিয়ে দিয়েছেন!!'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গৃহিশিষ্য শ্রীবাসের জীবনে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে পদার্পণ করেছেন, খোল-করতাল যোগে কীর্তন চলেছে। পীড়িত পুত্রকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে তখন যমে-মানুষে সংগ্রাম চলছে। শেষ পর্যন্ত শ্রীবাসের পুত্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল: পুত্রহারা জননীর হাহাকারে—বাড়ির ভিতরে সমুপস্থিত সকলে ক্রন্দনে ভেঙে পড়লেন। ক্রন্দনের রোল পাছে বহির্বাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তনে বাধা সৃষ্টি করে, তাই শ্রীবাস স্বয়ং বাড়ির ভিতরে ছুটে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকেন—

'পরম গভীর ভক্ত মহা তত্ত্বজ্ঞানী।
স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি ॥
"তোমরা ত সব জান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর ক্রন্দন সভে চিত্তে দেহ ক্ষমা" ॥'
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শুধু তাই নয়, স্বয়ং চৈতন্যদেব যখন জানতে চান, বাড়িতে কোন দুঃখজনক কিছু ঘটেছে কিনা—জ্ঞানিভক্ত শ্রীবাস করজোড়ে উত্তর দিয়েছিলেন—'...প্রভু মোর কোন দুঃখ।/যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ ॥'

শরচ্চন্দ্র সরকারি কর্ম উপলক্ষে অবিভক্ত সেই বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় থেকেছেন। ইংরেজ আমলের পোস্টাল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট পদ ভারতীয়দের পক্ষে বেশ উচ্চ সম্মানার্হ ছিল। শরচ্চন্দ্রের ঐ কর্মজীবনও কিন্তু শ্রীগুরু এবং তদীয় ভাবধারা থেকে কোন ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি। যেখানেই অবস্থান করতেন, সেখানেই তাঁকে ঘিরে একটি ভক্ত-পরিমণ্ডল গড়ে উঠত—যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ, মা এবং স্বামীজীর ভাবে নিজ নিজ জীবন গঠনের সুযোগ পেতেন অনায়াসে—স্বামীজীর একজন প্রিয় শিষ্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তাঁদের আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের পরম সহায়ক হত! এখানে উল্লেখ্য শরচ্চন্দ্রের অক্ষয়কীর্তি 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থের (দুই খণ্ডে) প্রণয়ন,—এই কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যেই সাধিত হয়েছে। এই 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে শুধু নয়, ভারতীয় ধর্মসাহিত্যের ইতিহাসে এক অসাধারণ অবদান-স্বরূপ।

অদ্যাবধি সহস্র সহস্র আদর্শবাদী তরুণ-তরুণী মাত্র এই গ্রন্থ-মাধ্যমেই বিবেকানন্দ-তড়িৎ-স্পৃষ্ট হয়েছেন—অনাগতকালে এই গ্রন্থ আরও কত প্রাণকে স্পর্শ করবে তা কে জানে! উল্লেখ বাহুল্য, গ্রন্থোক্ত 'শিষ্য'-ই হচ্ছেন লেখক শরচ্চন্দ্র স্বয়ং। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় শরচ্চন্দ্রের রচনাবলীর সংখ্যা বিপুল—কেবল প্রবন্ধ নয়, কবিতা এবং গানও রচনা করেছেন। সংস্কৃত স্তবস্তুতির সংখ্যাও সামান্য নয়। বর্তমান প্রবন্ধে সে-সবের বিশদ উল্লেখ ও আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু কোনদিন তাঁর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হলে, রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দ-সাহিত্যানুরাগীদের পক্ষে তা হবে পরমপ্রাপ্তি। উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'সাধু নাগমহাশয়' গ্রন্থের প্রণেতাও শরচ্চন্দ্র। অধুনা দুষ্প্রাপ্য শঙ্করাচার্য-প্রণীত 'বিবেকচূড়ামণিঃ' প্রকরণগ্রন্থের বঙ্গানুবাদও বৈদান্তিক শরচ্চন্দ্রের জ্ঞাননিষ্ঠার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। শরচ্চন্দ্র সুগায়কও ছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে গান শোনাবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর কয়েকবার হয়েছে। মা তাঁর সন্তানের কণ্ঠে গান শুনে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করতেন, বলতেন—'আহা! কি ভাব! কি গান!' বেলুড়মঠেও শরচ্চন্দ্র স্বরচিত গান গাইতে গাইতে বিভোর হয়ে যেতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পরে যখন তিনি দুহাত তুলে নেচে নেচে নিজ-রচিত গান গাইতেন—তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ এবং গিরিশচন্দ্র প্রমুখ ঠাকুরের লীলাসঙ্গীরাও এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতেন।

শরচ্চন্দ্র যখন বর্ধমানে কর্মরত, সেইকালে শ্রীশ্রীমা শরচ্চন্দ্রের বাসভবনে একবার দু-তিনদিন বাস করে তাঁর সেবা গ্রহণ করেছিলেন।[১]

শরচ্চন্দ্র ছিলেন একনিষ্ঠ গুরুভক্ত। প্রসঙ্গতঃ একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, যাতে তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাববাহী রূপটি যেমন সুপরিস্ফুট, ঠিক তেমনই তাঁর অনন্য গুরুভক্তিরও একখানি উজ্জ্বল আলেখ্য ব্যক্ত। সম্ভবতঃ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ। শরচ্চন্দ্র তখন মেদিনীপুরে ডাকবিভাগের প্রধান কর্মকর্তা—পোস্টাল সুপারিন্টেনডেন্ট। যথারীতি সেখানেও তাঁকে ঘিরে একটি ভক্তগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল—যাঁরা নিয়মিত পাঠপ্রসঙ্গ-চর্চাদি করতেন তাঁর সঙ্গে। শহরে নাড়াজোল-জমিদারের কাছারি বাড়িতে অনুষ্ঠিত একদিনের ঐরূপ আলোচনাচক্রে জনকয়েক উদ্ধত নাস্তিক যুবক স্বামীজী সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে,—উদ্দেশ্য শরচ্চন্দ্রকেই একটু বিব্রত করা। শরচ্চন্দ্র যুবকদের মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে যুক্তিসহ অনেক কথা বলেন—কিন্তু কার্যতঃ সবই নিষ্ফল হয়। অধিক রাত্রে অনুষ্ঠান শেষে শরচ্চন্দ্র সেখানে জল পর্যন্ত গ্রহণ না করে, গৃহে ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ান। এত রাত্রে ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত ফিরে গেলে গৃহস্বামীর অকল্যাণ হবে, এই আশঙ্কায় প্রবীণ ভদ্রলোকরা, বিশেষ করে জমিদার-পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা শরচ্চন্দ্রের কাছে কাতরে মিনতি জানাতে থাকেন, অন্ততঃ সামান্য কিছুও যাতে গ্রহণ করেন। শরচ্চন্দ্র দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছিলেন—যেখানে গুরুনিন্দা হয়, সে-স্থান অপবিত্র। উপযুক্ত প্রতিকারে অক্ষম হলে, তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করাই শাস্ত্রের উপদেশ। অতএব, তাঁর পক্ষে ঐ অনুরোধ রক্ষা আদৌ সম্ভবপর নয়। কিন্তু নাড়াজোল জমিদার-পরিবারের বয়োবৃদ্ধরা তাঁর দৃঢ় পণ শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন—যে-কোন মূল্যেই এই অশুভ ঘটনার প্রতিবিধান করতে তাঁরাও কৃতসঙ্কল্প হলেন। শরচ্চন্দ্র তখন শর্ত দিলেন, যদি এই গৃহে,—যেখানে স্বামীজীর নিন্দা হয়েছে, সেখানেই ঠাকুর-স্বামীজীকে প্রতিষ্ঠা করে তিনি পূজা করতে পারেন, তাহলেই এর প্রতিবিধান সম্ভবপর। স্বামীজীর নিন্দা যে-স্থলে হয়েছে, সে-স্থলকে আগে পবিত্রীকৃত না করলে, সেখানে ঠাকুর-স্বামীজীর আসন বসানো যাবে না। আর এই পবিত্রীকরণ সম্ভব হবে, যদি ঐ গৃহকে চিরতরে উৎসর্গ করা হয় শ্রীরামকৃষ্ণেরই উদ্দেশে। কার্যতঃ তাই হয়েছিল। গৃহস্বামী ঐ কাছারি বাড়িটিকে বেলুড়মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে বিধিমত অর্পণ করে দিতে সম্মত হলেন ঐ রাত্রিতেই। অতঃপর শরচ্চন্দ্র

---

[১] ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী', পৃষ্ঠা ২৩৩

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

সৌজন্যে ঃ ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেখানে ঠাকুরকে ও স্বামীজীকে স্বহস্তে বসিয়ে পূজা করেন এবং প্রসাদগ্রহণ করেন। মেদিনীপুরের বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রতিষ্ঠা এই ভাবেই হয়েছিল—যদিও পুরাতন সেই গৃহটি আজ সেখানে অদৃশ্য।

স্বামীজীর স্থূল দেহ অপ্রকট হবার পরে শিষ্য শরচ্চন্দ্র আরও চল্লিশ বৎসর ধরাধামে ছিলেন। জীবনের শেষ ছয় মাস তিনি কোটাপাড়া গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করেন। স্বামীজী আদর করে 'বাঙাল' বলে তাঁকে ডাকতেন—গুরুদত্ত সেই স্নেহ-অভিধাকে তিনি সগৌরবে সর্বত্র খ্যাপন করেছেন—জীবন-নাট্যের শেষাঙ্কেও তাই বুঝি পুব-বাংলার শান্তিময় ক্রোড়েই আবার ফিরে চলে গিয়েছিলেন। স্বামীজী তাঁর এই জ্ঞানী কিন্তু গৃহিসন্তানটিকে স্নেহভরে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন 'বাঙাল, সংসারে পাঁকাল মাছের মতো থাকবি।' শিবাবতার শ্রীগুরুর অমোঘ আশীর্বাদ শিষ্যের জীবনে কতখানি ফুটে উঠেছিল, সে-পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর নিজের আত্মকথনে। উত্তরজীবনে তিনি 'আমার কথা'-তে লিখেছেন :

'শ্রীশ্রীস্বামিপাদ সমস্ত দেবদেবী-মূর্তি অতিক্রম করিয়া কেন আমার সমগ্র হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন। কেন তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ বোধ হয়…তাহা আমিও বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যতই দিনের পর দিন যাইতেছে, ততোই বুঝিতে পারিতেছি, তিনি ভিন্ন আমার আর ইষ্ট নাই। তিনি ভিন্ন আমার সুখ নাই, শান্তি নাই ও আশ্রয় নাই।…তাঁহার স্মরণ মনন ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় তপস্যা নাই। তিনি আমায় যে এরূপ পাগল করিয়া যাইবেন, অগ্রে তাহা বুঝিতে পারি নাই। …আমার জ্ঞান, ধ্যান, জপ, তপস্যা সেই স্বামিপাদে পর্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি আমিত্বহারা হইতেছি।… অনন্ত নীল গগন, যেখানে সৃষ্টি বিসৃষ্টির কল্পনা স্থান পায় না, সেখানেও তাঁহাকে কোটীসূর্য-উদ্ভাসিত চিদ্‌ঘন মূর্তিতে ভাসমান দর্শন করিয়াছি। …শঙ্কর, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রাম, কালী, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি যখনি যাঁহার ধ্যান করি, দেখিতে পাই, আমার সেই প্রাণারাম, স্বামিপাদ সেই সেই মূর্তিতে বিরাজিত। সে রূপচ্ছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্‌ভাসিত হইয়া যায়। কল্পনার সহায়তায় সূর্যলোক, চন্দ্রলোক যথায় যাই, সেখানেই সেই দিব্যমূর্তি বিরাজিত দেখিতে পাই। ইহা ত্রিশপথান্বিত সত্য।' (উদ্বোধন, নবম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৩১৪)

উল্লিখিত আত্মচরিতাংশ—শরচ্চন্দ্রের আত্মারই উজ্জ্বল আলেখ্য। স্বামীজীই তাঁর আত্মা—গুরু ইষ্ট প্রাণারাম। জগদ্‌গুরুর কৃপাবলে বলীয়ান একজন প্রকৃত জীবন্মুক্তের আত্মোপলব্ধির ঘোষণা এমন সুস্পষ্টই হয়ে থাকে—যেমন শুনে থাকি আমরা ব্রহ্মবিদ্ ঋষিদের উদ্‌গীত মন্ত্রগুলি।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ অগস্ট শরচ্চন্দ্র শ্রীগুরু-পাদপদ্মে চিরকালের জন্য বিলীন হন। তাঁর বড় সাধ ছিল—'যেন আমার গুরুভ্রাতৃগণের মুখে শেষকালে শুনিতে পাই "বিবেক আনন্দ নামে হোক ভবে জয় জয়।" সে সাধও পূর্ণ হয়েছিল অক্ষরে অক্ষরে অথবা ততোধিক মাত্রায়। অন্তিম সময়ে প্রাণাধিক প্রিয় সুহৃদ্ ও গুরুভ্রাতা স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ পত্র লিখে জানালেন : জয় রামকৃষ্ণের জয়! জয় স্বামীজীর জয়! প্রতি নিঃশ্বাসে বল। কিসের ভয়, কিসের ভাবনা! তুমি যে বৈদান্তিক, তোমার আবার রোগ কি, শরীর কি! তুমি যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা! ওয়াহ গুরুজী ফতে।'

পুস্তক সমালোচনা

গায়ত্রী-রহস্য—রামপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: ফার্মা [redacted] এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭-বি বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২। পৃঃ ২০৪; মূল্য: লাইব্রেরী ঃ ৩৫ টাকা, সুলভ ঃ ৩০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি প্রথম ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি তাহার দ্বিতীয় মুদ্রণ, যাহা গ্রন্থকার পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। দুইশত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে চারিটি পরিচ্ছেদে যথাক্রমে ওঁকারতত্ত্ব, ব্যাহৃতিতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব এবং গায়ত্রীতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে এবং পরিশিষ্টে গায়ত্রীমন্ত্রের অনেকগুলি সংস্কৃত ভাষ্য, যেগুলি শঙ্কর, সায়ণ, মহীধর প্রভৃতি রচিত এবং কোন কোন উপনিষদে, পুরাণে বা তন্ত্রে উদ্ধৃত তাহা সংযোজিত করা হইয়াছে।

গায়ত্রী বৈদিক সাধনার সার-সর্বস্ব এবং ভারতবর্ষের অগণিত জনগণের প্রাণদায়িনী রক্ষা-কবচ। বেদের মধ্যেই উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে: 'বিশ্বামিত্রস্য গায়ত্রং রক্ষতি ভারতং জনম্।' বিশ্বামিত্র ঋষির গায়ত্রীছন্দে নিবদ্ধ এই মন্ত্রটি ভারতের জনগণকে আজও রক্ষা করিতেছে। অনেকেই অবগত আছেন যে, বিশ্বামিত্রের এই মন্ত্রটি একটি সাবিত্রী ঋক্, সবিতাদেবতাসম্বন্ধীয় স্তুতি। এই সাবিত্রী মন্ত্রই আমাদের কাছে ছন্দের মহিমায় গায়ত্রীমন্ত্ররূপে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই মন্ত্রের গান করিলেই ত্রাণ লাভ করা যায়, 'গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাদ্ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ।'

সেই গায়ত্রীর আদিতে ও অন্তে ওঁকার। ওঁকারের পরে ব্যাহৃতিত্রয় অর্থাৎ 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' যুক্ত করিয়া ইহার জপ বিহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেই দৃষ্টিতেই গ্রন্থকার এখানে গায়ত্রী-রহস্য উদ্ঘাটন করিতে গিয়া ওঁকারতত্ত্ব ও ব্যাহৃতিতত্ত্বের সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অনেকের কাছে ইহা 'ধান ভানিতে শিবের গীত' বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু গায়ত্রীর সঙ্গে এগুলির অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ। গায়ত্রীর তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে তাই ওঁকার ও ব্যাহৃতিতত্ত্বের জ্ঞানও অপরিহার্য।

গ্রন্থকার যেভাবে দার্শনিক পটভূমিকায় এই তত্ত্বগুলি আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান সুপরিস্ফুট। কিন্তু সাধারণ পাঠকবর্গ, যাঁহাদের তেমন শাস্ত্রজ্ঞান নাই, তাঁহারা এ গ্রন্থপাঠে কতটা উপকৃত হইবেন বা ইহার রসাস্বাদনে সমর্থ হইবেন, তাহা চিন্তার বিষয়। মূল গায়ত্রীমন্ত্রের একটি সরল সংক্ষিপ্ত হৃদয়গ্রাহী বিবরণ সংযোজিত হইলে সকলের পক্ষে বিশেষ উপকার হইত। তবে যাঁহারা ধৈর্যসহকারে শাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করিতে আগ্রহী তাঁহারা সৃষ্টি, মায়া, প্রকৃতি, অবিদ্যা, ঋত, সত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে এই গ্রন্থপাঠে আলোক-প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞানের নানা আলোচনা সত্ত্বেও, মুখ্যতঃ ভক্তি-আশ্রিত। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন: "অট্টালিকা নির্মাণে যেমন চুণ, বালি, সুরকী, সিমেণ্ট ইত্যাদির ব্যবহার অপরিহার্য্য—উহারা মধ্যে থাকিয়া প্রস্তর, ইট, দরজা, জানালা প্রভৃতি অট্টালিকার উপাদান সকলকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রাখে—সেইরূপ কর্ম ও জ্ঞানকে দৃঢ়ভাবে সংসক্ত করিবার জন্য ভক্তির প্রয়োজন।" জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের মধ্যবর্তী উপাসনাকাণ্ডে তাই এই ভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহিতা। গায়ত্রী এই উপাসনার চরম ও পরম আশ্রয়। গ্রন্থকার তাহার বিশদ পরিচয় দিয়া সকলের অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। পরিশিষ্টে গায়ত্রীর যে-সব সংস্কৃত ব্যাখ্যাগুলি সংযোজিত হইয়াছে, সেগুলির বঙ্গানুবাদও ঐ সঙ্গে দিয়া দিলে তাহা সকলের আস্বাদ্য হইত এবং গায়ত্রীর মর্মার্থ গ্রহণে সহায়ক হইত।

—ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের
ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক।

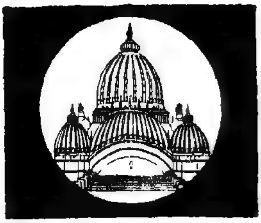

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

আসামে বন্যাত্রাণ : করিমগঞ্জ ও শিলচর জেলার বন্যাপীড়িত পরিবাবেব মধ্যে ২০০০ খানা শাড়ি, ২০০০ খানা ধুতি, ২০৩৫ খানা চাদর, ৫০০টি লুঙ্গি, ১১০৬টি বয়স্কদেব জামা, ৪০০০টি ছোট ছেলেমেয়েদের জামা-প্যাণ্ট, ২০০ খানা পশমের কম্বল, ১০০০টি পুরানো জামা-কাপড়, চাল, আটা, দুধ, বিস্কুট, কেরোসিন তেল, ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, জল-পরিষ্করণের ট্যাবলেট প্রভৃতি বিতরণের মধ্য দিয়ে এখানকার ত্রাণকার্য সমাপ্ত হয়।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ : মাদ্রাজ ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন, শ্রীলঙ্কা থেকে রামেশ্বরের নিকটবর্তী মন্দাপম্ শিবিরে আগত শরণার্থীদের প্রাথমিক সেবাকার্য কবে চলেছেন। এছাড়া তুতিকোরিন, বেদারান্যাম্ ও মন্দাপম্ শিবিরেব ছেলেমেয়েদের জন্য ৫৩১ খানা তোয়ালে, ১৮০০ খানা কম্বল ও ৬৩১০টি বান্ রুটি বিতরণ করেন।

বাংলাদেশে ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ : ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন এবং বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত নরনারীর মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণ-কার্য চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন : ২৪ পরগনা গাইঘাটা থানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ১৯৮৩-র ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ঠাকুরনগর বালিকা বিদ্যালয়ের একতলার ছাদ নির্মাণ গত ২৪ অগস্টে শেষ হয়েছে। গৃহনির্মাণের কাজ এখনও চলছে।

উদ্বোধন-সংবাদ

গত ৩০ অগস্ট, স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের আবিভাব-তিথি উপলক্ষে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হয় এবং সন্ধ্যারতির পর স্বামী নির্জরানন্দ তাঁর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। গত ৭ সেপ্টেম্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজাদি এবং সন্ধ্যারতিব পরে 'সারদানন্দ-হলে' শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী বিকাশানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী অব্জজানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছেন।

দেহত্যাগ

অতি দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে : **স্বামী রুদ্রানন্দ** (মুথুকৃষ্ণ মহারাজ) গত ৩০ জুন ১৯৮৭, সকাল ৬টায় হৃদ্‌যন্ত্রেব দুর্বলতার জন্য শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে ফিজির হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। গত বছর হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল কিছু কালের জন্য বিঘ্নিত হলেও তা থেকে তিনি শীঘ্র সেরে ওঠেন। ১৯৮৫-র মে মাসে তিনি পুনরায় ওই রোগে প্রবলভাবে আক্রান্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। চিকিৎসকদের সবরকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে প্রশান্তির মধ্য দিয়ে তাঁর শেষক্ষণটি ঘনিয়ে আসে।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট তিনি দীক্ষালাভ করেন এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন। ১৯২৯-তে স্বীয় গুরুর নিকটে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সঙ্ঘের তামিল মুখপত্র 'রামকৃষ্ণ বিজয়ম্' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব কয়েক বছরের জন্য পালন

করা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি মাদ্রাজ মঠের অন্যান্য সেবাকার্যেও নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩০-এর দিকে মাদ্রাজের মায়লাপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে অগ্নিবিধ্বস্ত এলাকায় সেবাকার্যের জন্য 'থোণ্ডার সঙ্গম্' নামে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। ওই অগ্নিবিধ্বস্ত মানুষদের জন্য তিনি 'রামকৃষ্ণপুরম্' নামে একটি পুনর্বাসনও তৈরি করেন, যার অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ফিজি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ করে পাঠান। প্রথম থেকেই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে সমাজের দরিদ্র ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিসাধনের জন্য চেষ্টা করেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের দ্বারা তিনি ওই দেশের অর্থনৈতিক জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। নিঃস্বার্থ সেবার জন্য তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তাঁর মধ্যে কখনও নম্রতা ও বিনয়ের অভাব লক্ষিত হয়নি এবং জনসাধারণের সংস্পর্শ থেকে তিনি কখনও নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি। তাঁর দেহাবসানে ফিজিবাসী এবং বিশেষতঃ এই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ, কঠোর ও অনাড়ম্বর স্বভাবের একজন আদর্শ সন্ন্যাসীকে হারাল।

ব্রহ্মচারী শ্রুতিচৈতন্য (বিট্টল) গত ৮ জুলাই ১৯৮৫, রাত্রে মহীশূর রামকৃষ্ণ আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি নিদারুণ পেটের পীড়ায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। যথাসম্ভব চিকিৎসা করানো সত্ত্বেও তাঁর যন্ত্রণার কোনরকম উপশম হয় না।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীর নিকট তিনি দীক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগদান করেন।

এঁদের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক—এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

পুরুনিয়া (বাঁকুড়া) প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের উদ্যোগে গত ২৩ ও ২৪ মার্চ ১৯৮৫, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রথম দিন নবনির্মিত উপাসনালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন এবং দ্বিতীয় দিনে যুবসম্মেলন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী জ্যোতীরূপানন্দের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন স্বামী সর্বদেবানন্দ।

উত্তরাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার-পরিষদের উদ্যোগে কোচবিহার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৪—২৬ মে, তিনদিনব্যাপী ২য় বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব ও যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে স্বামী গহনানন্দের পৌরোহিত্যে স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী [illegible], স্বামী সুমেধানন্দ প্রভৃতি ভাষণ দান করেন।

শ্যামপুকুরবাটী (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ-সঙ্ঘে গত ২৭ অগস্ট সঙ্ঘের ৮ম প্রতিষ্ঠা দিবস নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী নির্জরানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

দ্বারোদ্ঘাটন

গত ১৯ জুন ১৯৮৫, ভদ্রেশ্বর (হুগলী) সারদাপল্লীস্থ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহসহ দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী। এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষের পরিচালনায় বেহালা সুরপীঠ কর্তৃক 'পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশনের পর বিকালের ধর্মসভায় স্বামী আত্মস্থানন্দের সভাপতিত্বে স্বামী গহনানন্দ ও স্বামী প্রভানন্দ ভাষণ দেন। সভারম্ভে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের শুভেচ্ছা বাণী পঠিত হয়।

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ-রচিত

দৈনন্দিন জীবনে ধ্যান ও শান্তি

বিষয়সূচী : দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ/মন অশান্ত হয় কেন/মন শান্ত করার প্রাথমিক উপায়/সংস্কারের প্রভাব ও প্রকাশ/ধ্যান : তত্ত্ব ও পদ্ধতি/ধ্যান : আমি কে/ধ্যান : জীবন ও চেতনায়/চিন্তা, ভাব ও কাজ/ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন সমস্যা/দুঃখ দূর করার তাৎক্ষণিক পথ।

পৃষ্ঠা ২০০ **দাম ২০ টাকা**

ইতিহাস-চিন্তায় বিবেকানন্দ

দাম ২৫ টাকা

স্বামী জীবানন্দ-রচিত

শ্রীশ্রীদুর্গা বন্দনা ৩·৫০

বিবেক-জ্যোতি ৩·৫০

প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী-রচিত

গীতানুসরণ ৮·০০

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রদ্ধা প্রকাশন
এ-ই ১৩১, বিধান নগর
কলকাতা-৭০০০৬৪

উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন
কলকাতা-৭০০০০৩

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।২১

উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক
এই বাণী। —**শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়**

ডাঃ পি. মজুমদারের
এন্টিব্যাক্ট্রিন
Antibactrin

কার্ব্বাঙ্কল কিওর (রেজিঃ)

কার্ব্বাঙ্কল, শোষ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া বা পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়।

বিনা কষ্টে বিনা অস্ত্রে রোগমুক্তি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
শ্রীম কথিত
(৫ খণ্ডে সমাপ্ত) : প্রতি সেট : কাপড় ৭০, বোর্ড ৬০,

শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজি প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহীশিষ্যেরা এবং কথামৃত-কার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রন্থটি যেমনটি দেখিয়া গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে ৫-খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন "কথামৃতের" আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক শ্রীম'র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের Originality এবং সুমহান ঐতিহাসিক পবিত্র ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে বহাল রহিয়াছে এই ৫-খণ্ডে বিভক্ত "কথামৃতে"।

প্রকাশক : শ্রীম'র ঠাকুর বাড়ী (কথামৃত ভবন)
১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা : ৬ ফোন : ৬৫-১৭৫১

Generating Sets for
Industry Factory Cinema Multistoried Building etc
3 to 750 KVA
Contact

Rajkissen Radhakissen Mitter & Co.
15, Ganesh Chandra Avenue
Calcutta-700 013
Phone : 26-7882 ; 26-8338 ; 26-4474

সাধনে প্রসাধনে

জবাকুসুম

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা : নিউদিল্লী

বৃদ্ধ বয়সের সমস্যা ?

(বার্ধক্য আশ্রম)

দীর্ঘ অবসর প্রাপ্ত বা অবসর গ্রহণ আসন্ন অথবা ৪০ বৎসর বয়সের ঊর্ধ্বে—যাঁরা ভবিষ্যৎ জীবনের সুব্যবস্থা করতে চান এমন ঈশ্বরভক্ত দম্পতি বা একক পুরুষ অথবা নারী যাঁদের দেখাশুনার লোকের অভাব, অথবা যাঁরা দূরে সরে থাকতে চান, তাঁরা যদি নিরাপত্তা, আশ্রয়, নিজরুচি অনুযায়ী খাদ্য, চিকিৎসা ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত গৃহের জন্য যুক্তিসঙ্গত ফেরতযোগ্য অর্থ জমার বিনিময়ে জামশেদপুরের শহরতলীতে এক চমৎকার বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকায় জীবনের অবশিষ্ট অংশটুকু শান্ত, বাণপ্রস্থ আশ্রমসুলভ পরিবেশে কাটাতে ইচ্ছুক হন তাহলে বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রদ্বারা যোগাযোগ করুন বা স্বয়ং এসে দেখা করুন।

—PRESIDENT

SWAMI VIVEKANANDA SEVA TRUST

ON THE BANK OF SUBARNAREKHA RIVER

P.O.—SAKCHI, * JAMSHEDPUR—1 * PIN 831001 * Phone : 26459

Calcutta Office :

465, K-Block, 2nd Floor, New Alipore, Calcutta-53

Phone : 450 095, Public Relations Officer,

Swami Vivekananda Seva Trust (open during 2nd week of every month)

॥ ওরিয়েণ্টের শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য ॥

রোমাঁ রোলাঁ বিরচিত

ঋষি দাস অনূদিত

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ১৫.০০

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ২০.০০

বিবেকানন্দের জীবন ২৫.০০

শিশু ও কিশোর নাটক

প্রবোধকুমার সরকার বিরচিত

বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ ৪.০০

বিশ্বত্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ ৪.০০

বিশ্বজননী সারদামণি ৪.০০

ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য বিরচিত

লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণ ২০.০০

শ্রীমা সারদামণি ২০.০০

মহামানব বিবেকানন্দ ২০.০০

স্বামী অমিতানন্দ বিরচিত

শ্রীরামকৃষ্ণের যাঁরা এসেছিল সাথে ১২.০০

সুবলচন্দ্র আদক বিরচিত

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ২.০০

দ্যুতিনাথ চক্রবর্তী বিরচিত

ছোটদের বিবেকানন্দ ২.০০

॥ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ॥ ১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭৩ [ফোন : ৩৪-৩৬৫৪

সেন ব্রাদার্স জুয়েলার্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লাইয়ার্স

১৩২, বিধান সরণি, কলি-৭০০০০৪

মেইন শো-রুম
৯১।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলি-১২ : ফোন ২৭-০৭৬২

ব্রাঞ্চ অফিস
১৩২।১এ বিধান সরণি
কলি-৪ : ফোন ৫৫-০৩৫০

ব্রাঞ্চ—১৩১।১এ, বিধান সরণি, :: কলি-৪ :: ফোন ৫৫-০৪১৯

With Best Compliments From :

National Moulding Company Limited

(Manufacturers of Plastic Goods)

Office :
3C, Camac Street
Calcutta-700 016
Phone : 24-4135 (3 lines)

Factory :
4, Dharmatalla Road
Belur, Howrah
Phone : 64-3361

আপনি কি ডায়াবেটিক

তাঁহলেও, সুস্বাদু মিষ্টান্ন আস্বাদনের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন কেন ?

ডায়াবেটিকদের জন্য প্রস্তুত

*রসগোল্লা *রসোমালাই
*সন্দেশ প্রভৃতি

কে. সি. দাশের

এসপ্ল্যানেডের দোকানে সব সময় পাওয়া যায়।

১১, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-১
ফোন : ২৩ ৫৯২০

Phone : H. O. : 34-4668
Branch : 35-9959

Senco Jewellery Stores (P) Ltd.

Manufacturing Jewellers & Order Suppliers

187, Bepin Behari Ganguly Street,
CALCUTTA-12

Branch :
92/C, Bepin Behari Ganguly Street,
CALCUTTA-12

The most successful CTC machine ever :

New STM RIGICUT CTC TEA PROCESSING MACHINE

It's easy to see why !

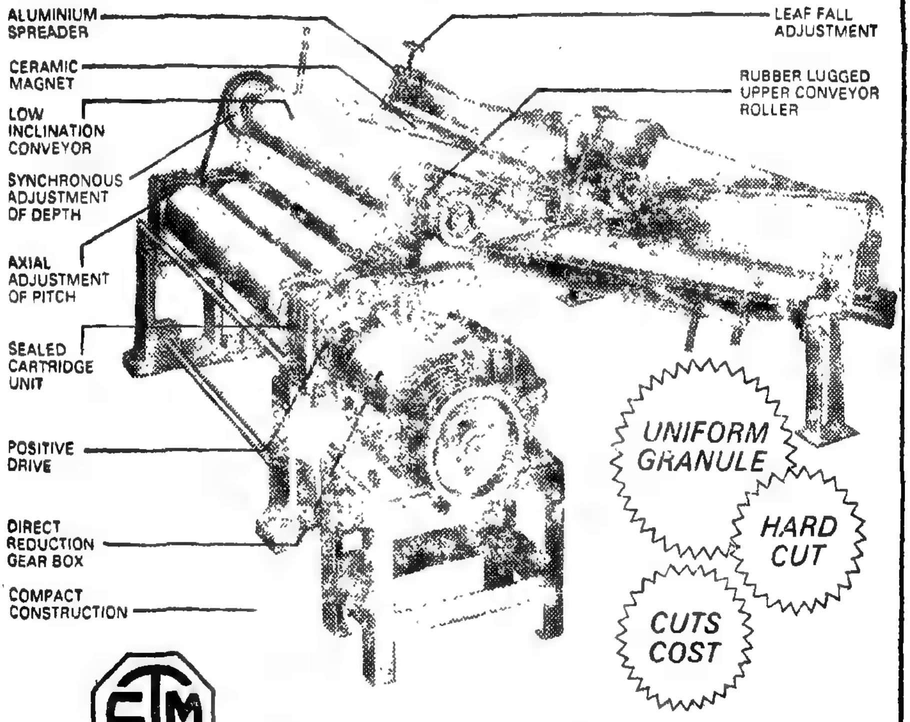
ALUMINIUM SPREADER
CERAMIC MAGNET
LOW INCLINATION CONVEYOR
SYNCHRONOUS ADJUSTMENT OF DEPTH
AXIAL ADJUSTMENT OF PITCH
SEALED CARTRIDGE UNIT
POSITIVE DRIVE
DIRECT REDUCTION GEAR BOX
COMPACT CONSTRUCTION
LEAF FALL ADJUSTMENT
RUBBER LUGGED UPPER CONVEYOR ROLLER
UNIFORM GRANULE
HARD CUT
CUTS COST

FOR MORE DETAILS CONTACT

THE SMALL TOOLS MFG. CO. OF INDIA LTD.
'FARADAY HOUSE' P-17, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700 013
Phone 26-9530/5072 Gram· TAPSANDIES

FOR SOUTHERN REGION:
Contact our authorised representative
TEA-MA CONSORTIUM INDIA LTD.,
Hazelwood, Grays Hill, P.B. 40, Coonoor 643101
Phone : 745/105 Gram: 'TEAMAGROUP'

Thoughtshop

WITH BEST COMPLIMENTS OF :

TRIBENI TISSUES LIMITED

2, LEE ROAD

CALCUTTA-700 020

Phone : 44-2281—85

★

With best compliments of:

CHOUDHURY & CO.,

Manufacturers & Mine-owners of Lime & Limestone

67/45, Strand Road, Cal-700007

[Phone : 33-2850, 33-9056.]

Phone : 22-0820
22-9071
22-5172

For

SEEDS, PESTICIDES, FERTILISERS & AGRIL. MACHINERIES
Please Contact :

Sambhabami Enterprise

33/1, N. S. Road, Marshall House

Room 836/837, Cal-1

Growing range of Gen-Set for the growing need of Industry

THE SOURCE OF INSTANT POWER

VINYLITE

Powered by

Kirloskar-Cummins Engines & Alternators

A CLASS BY ITSELF

Available in
Single/Three phase 220/440 Volts from 1 KVA to 4000 KVA
with Kirloskar-Cummins Engines and alternators
Contact authorised DEM

VINEET ELECTRICAL INDUSTRIES (P) LTD.

19, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700 013

Phone : 27-6813, 27-6817

Gram : DHINGRASON Telex : 021-2675 (VINY)

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক

রোগীর আরোগ্য এবং ডাক্তারের সুনাম নির্ভর করে বিশুদ্ধ ঔষধের উপর। আমাদের প্রতিষ্ঠান সুপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাঁটি ঔসধ পাইতে হইলে আমাদের নিকট আসুন।

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা একটি অতুলনীয় পুস্তক। বহু মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ (২৫ নং) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ৪৫·০০ টাকা মাত্র। এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার যে জ্ঞানলাভ হইবে প্রচলিত বহু পুস্তক পাঠেও তাহা হইবে না। আজই একখণ্ড সংগ্রহ করুন। নকল হইতে সাবধান। আমাদের প্রকাশিত পুস্তক যত্নপূর্বক দেখিয়া লইবেন।

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত ষোড়শ সংস্করণও পাওয়া যায়। মূল্য টা. ১১·০০ মাত্র।

বহু ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক বই ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি। কাটালগ দেখুন।

ধর্মপুস্তক

গীতা ও চণ্ডী—(কেবল মূল)—পাঠের জন্য বড় অক্ষরে ছাপা। গীতা—৭·০০ টাকা, চণ্ডী—৬·০০ টাকা।

স্তোত্রাঞ্জলি—বাছাই করা বৈদিক শান্তিবচন ও স্তবের বই, সঙ্গে ভক্তিমূলক ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। অতি সুন্দর সংগ্রহ, প্রতি গৃহে রাখার মত। ৪র্থ সংস্করণ, মূল্য টাঃ ৪·৫০ মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী—একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা সম্বলিত বড় অক্ষরে ছাপা বৃহৎ পুস্তক। এমন চমৎকার পুস্তক আর দ্বিতীয় নাই। মূল্য ২৫·০০ টাকা।

এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

Tels—SIMILICURE হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস্ এণ্ড পাবলিশার্স Phone : 22-2536, 25-0853

৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

নির্লিপ্তভাবে সংসার করা কি রকম জান? পাঁকাল মাছের মতন। পাঁকাল মাছ যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু তার গায়ে পাঁক লাগে না।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

Space donated by :

AJOY KUMAR
105, Park Street, Cal-16

With Best Compliments From :—

Rollatainers Limited

13/6, Mathura Road
Faridabad-121003
HARYANA

ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'আমার চিন্তা যে করে সে কখনও খাওয়ার কষ্ট পায় না।'

—শ্রীশ্রীমা

Tista Valley Tea Syndicate

TEA MERCHANTS & COMMISSION AGENTS

22-B, RABINDRA SARANI (Room No. F. S. 40)

Estd.—1943

CALCUTTA-700073

Phone : H. O. : 26-8632
Resi. : 47-6580

BRANCH : JALPAIGURI • PHONE : JAL-32

TELE : TISTATEA

ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন
দেশী বিদেশী বহু কাগজের ভাণ্ডার

এইচ. কে. ঘোষ অ্যাণ্ড কোং

২৫৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা-১
[টেলিফোন : ২২-৬২০৯]

M/s. Bhola Nath Sar

Contractors & General Order Suppliers
SSI Regd. No. 21-01-01063 P.M.T. IS.S.I.

Resi : P. O. BARJORA
DIST. BANKURA
Tele : BJR 24 (PP)

G. T. ROAD
DURGAPUR-713203
(BURDWAN)

FOR SOLVING YOUR INDUSTRIAL PROBLEMS
CONTACT

SOLVE YOUR PROBLEMS

10, CLIVE ROW : : CALCUTTA-700001
Experts as Import Licence Negotiators/Export House Consultants
Manufacturers Representatives/Liaison Services in D.G.T.D. & S.S.I.
Phone Office : 26-7926, Residence—54-1102.
CABLE—GUGAGO, TELEX—21-2798—EXPO—IN.
P.O. BOX : 2582—Calcutta. G.P.O. P.O. BAG NO. 2—G.P.O. Calcutta.

Proprietor : **GANESH CH. DEY**

INTERNATIONAL PRODUCTS

Office :
39, SANKAR HALDER LANE,
CALCUTTA-700005
PHONE : 55-1821
Works :
CHANDRAHATI, TRIBENI
HOOGHLY
PHONE : CDN 275

With Best Compliments From :

Telephone : 24-8056
9896
[illegible]127

Tandoor Restaurant

55 PARK STREET
CALCUTTA 700 016

◆

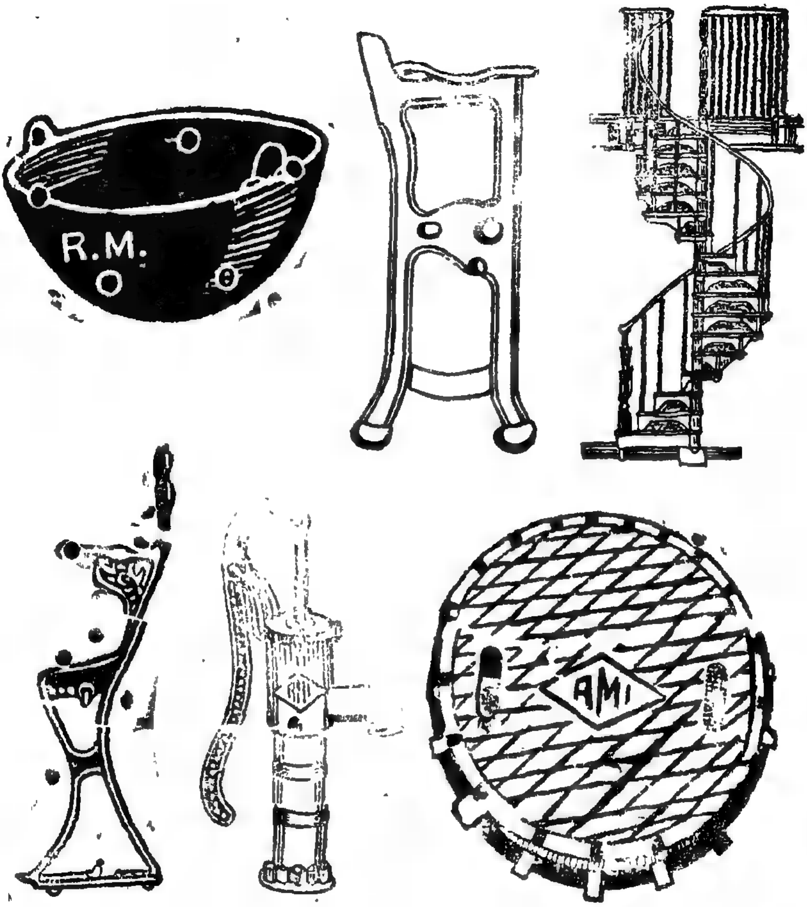

Phone : 61-0287

R. M. INDUSTRIES

P.O. NIBRA, Vill. KANTALIA,
HOWRAH-711-409

Manufacturer of :

RM brand C. I. Pan & Rice Plate, RMI brand Manhole Covers,
Spiral Stair Cases, Cinema Chair Legs, Saddle,
Detagable Joint etc.

…আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে। যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে; যে মেথর-মুদ্দাফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে,—হায়। তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশের এমন কেউ নেই রে।…আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি—'ছুঁসনে ছুঁসনে'—দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ। কেবল ছুঁৎমার্গের দল। অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাথি। ইচ্ছা হয় তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত—কাঙাল দীন-দরিদ্র আছিস্' ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা এদের অন্ন-বস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হ'ল? হায়! এরা দুনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে—সকলে মিলে এদের চোখ খুলে। আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হ'লে কোন দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস্? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—এ নিশ্চয় জানবি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

* * *

Sur Industries Private Limited

Show Room :
P-12, C.I.T. Road,
Calcutta-700014
Phone : 24-0105

Office :
163, Acharya Jagadish Bose Road,
Calcutta-700014
Phone : 24-4233

Phone : { Off. 66-2725
Resi. 66-3795

M/S. CHAKRABORTTY BROTHERS

BAMBOO & TIMBER MERCHANTS,

CONTRACTORS & GENERAL ORDER SUPPLIERS
STOCKIST OF BAMBOO, SALBULLAH & HARD WOOD
PLANKS AND ALL KINDS OF SAL SIZES ETC.

Premier Supplier & Contractor of :
THE TITAGHUR PAPER MILLS CO LTD.

STOCK-YARDS :
1. 55, KHAGENDRA NATH GANGULY LANE,
HOWRAH.
2. 4A/1/1, SALKIA SCHOOL ROAD,
HOWRAH.

Registered Office :
119, SALKIA SCHOOL ROAD,
SALKIA, HOWRAH.
PIN : 711106

॥ প্রকাশিত হয়েছে ॥

নির্মলকুমার রায়-এর

[১] সঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্ণ ১৬৲

[স্বামী নিরাময়ানন্দজী মহারাজের শুভেচ্ছাসহ]

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের সঙ্গে সঙ্গীত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁর সেই দিব্য সঙ্গীতময় জীবনের অভূতপূর্ব পরিচয় ও তৎসহ তাঁর কণ্ঠে গাওয়া একশত সম্পূর্ণ গানের সংকলন।

[২] শ্রীরামকৃষ্ণমুখে শ্রীচৈতন্যকথা ৮৲

[স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজের ভূমিকাসহ]

পূর্ববর্তী অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে পরবর্তী অবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বীয় মুখে অমৃতোপম উক্তি এবং উভয় অবতারের দিব্যজীবন সম্পর্কে তুলনামূলক সমীক্ষা।

জীবন মুখোপাধ্যায়-এর

স্বামী বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ ১৫৲

ভারতের সর্বপ্রথম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সফল যুবনেতা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। যুবসমাজের জন্য তাঁর ভাবনা-চিন্তা, কর্মসূচী ও আদর্শ সম্পর্কে মননশীল গ্রন্থ।

প্রকাশনায় ও পরিবেশনায় :

নবভারতী প্রকাশনী ॥ ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও ঃ যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

৯ম মুদ্রণ, সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই, মূল্য—৩০৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ ঃ …মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী নারী এযুগে বিরল।

সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই, মূল্য—১৪৲

মহাতপস্বিনী দুর্গামাতা (গদ্যে ও পদ্যে)

শ্রীভিখারীশঙ্কর রায়চৌধুরী রচিত।

মূল্য—৭৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার জীবনচরিত।

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

ষষ্ঠ মুদ্রণ—মূল্য—১৪৲

সাধনা

দেশ ঃ সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা…প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক…সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সপ্তম সংস্করণ—মূল্য—১৫৲

সাধু-চতুষ্টয়

স্বামিজী-সহোদর মনীষী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের মনোজ্ঞ রচনা। তৃতীয় মুদ্রণ—মূল্য—৪৲

সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের (অধুনা-লুপ্ত)

সপ্ত গোস্বামী

ডক্টর নির্মলেন্দু রায় লিখিত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

মূল্য—৭·৫০

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

Space donated by :

Phone : { 45-3622
45-8191

THE LIBERTY MARINE SYNDICATE (P) LTD

8/5 Mominpore Road

Calcutta—700 023

Space donated by :

EASTERN ESSES MANUFACTURERS

26/1D Shiv Krishna Daw Lane

Calcutta—700 054

With Best Compliments of :—

* * *

Shaw Wallace & Company Limited

Regd. Office : 4, Bankshall Street, Calcutta-700001.

Telephone : 23-5601 (9 Lines) 23-9151 (10 Lines)

মডার্ন কলাম প্রকাশিত মহান গ্রন্থসম্ভার

প্রণবেশ চক্রবর্তী'র সশ্রদ্ধ অর্ঘ
শ্রীরামকৃষ্ণের সমাজদর্শন ১২৲

ডঃ সুব্রত গুপ্ত-এর বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা
বিবেকানন্দের অর্থ নৈতিক চিন্তা ১২৲

নন্দ মুখোপাধ্যায়-এর মহান প্রয়াস
বিবেকানন্দের আলোয় সুভাষ ১৬৲

● ভি. পি. অর্ডারের অগ্রিম পাঠাবেন ●

মডার্ন কলাম ☐ ১০/২এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

Gram : "STOCKISTS" CAL.

Phone :
Office : 33-2819
Factory : 67-3642
Res. : 55-1791

Manufacturers of :
BOLTS, SCREWS AND NUTS
PRECISION TURNED COMPONENTS SMALL TOOLS

⁂

M/s P. C. Coomar & Sons

HARDWARE & METAL MERCHANTS,
GOVT. RLY. CONTRACTORS

145, Netaji Subhas Road,

CALCUTTA-700 001

Works : Brojonath Lahiri Lane, Santragachi,
HOWRAH
91/3, Beliaghata Main Road, Calcutta-700 010

•

Authorised Dealers : G. K. W. NETTLEFOLD PRODUCTS
PRECISION FASTNERS (UNBRAKO) PRODUCTS.

যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা
করেছেন ও করছেন তাঁদের সকলকেই
'শারদীয় অভিনন্দন জানাই'।

বি. কে. সাহা এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ

॥ বিখ্যাত চা ব্যবসায়ী ॥

[স্থাপিত ১৯২২]

৫ নং পোলক স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০০১

ফোন : ২৬-২৪০৩, ২৭-২৪০৪

ক্যাশ ডিপার্টমেণ্ট—২৭-৯৮১১

"IN REMEMBRANCE"

SHRI NITAI CHANDRA ROY

GOD TOOK YOUR HAND, WE HAD TO PART,
HE EASED YOUR PAIN, BUT BROKE OUR HEARTS
WE'VE LOST A LOVED ONE WITH A HEART OF GOLD
YOU WERE MORE TO US THAN WEALTH UNTOLD
YOU WERE ALWAYS SMILING AND GAY
BUT WE COULD NOT MAKE YOU STAY
QUICKLY AND UNEXPECTED WAS THE CALL
YOUR SUDDEN DEATH SURPRISED US ALL
A LIGHT FROM OUR HOUSEHOLD HAS GONE
A VOICE WE LOVED IS STILL
A PLACE IS VACANT IN OUR HOME
WHICH NEVER CAN BE FILLED
REST ON DEAREST THY LABOUR IS OVER
THY WILLING HANDS WILL TOIL NO MORE
FAITHFUL, LOVING, TRUE AND KIND
NO ONE LIKE YOU ON EARTH WE'LL FIND

FROM
SEFALI N. ROY.
BOMBAY.

কাজ করা চাই বই কি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

◆

ইউনিয়ন প্রেস
—ফটো-অফসেটে বই ছাপার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান—

৫/ই, রামকৃষ্ণ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৩

[ফোন : ৫৫-৬৮৫৫

লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য ; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা ; ···সে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী !—তোমাদের প্রণাম করি ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

* * *

বিবেকানন্দ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

• • সকল প্রকার পুস্তক বাঁধাই-এর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান • •

৯৬নং শোভাবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৫

[ফোন : ৫৫-৩২৭৯

With The Best Compliments Of :—

SHIVMONI & CO.

29 STRAND ROAD

CALCUTTA-700001

PIPE MERCHANTS

With best compliments from :

*** With us printing is not only a vocation but a way of life ***

Basusree Press

80/6, GREY STREET,

CALCUTTA-700 006

[Phone : 55-3867]

With the compliments of :

TATA STEEL

WITH THE COMPLIMENTS

OF

INDIAN TUBE

(A Tata Enterprise)

Phone : 23-1844
23-2928
23-5078
(24 Hours)

Royal Cars

LUXURY AND TOURIST CAR RENTALS
3rd Floor
7/27, Grants Building
Arthur Bunder Road
Colaba, Bombay-400 005

ON THE APPROVED LIST OF D. G. S. & D. (NEW DELHI)

EDUCATION EMPORIAM

Manufacturers : 'JANTRAM Brand Scientific & Technical Instruments
THERMOPOWER' Gas Plant.

26, College Street, * Calcutta-700012 [Phone : 34-1949]

Gram : JEWELBEST

Show Room : 26-3288
27-7631

New Indian Traders

Manufacturers of Loose Leaf Binders

Distinguished Stationers, Printers, Paper & Board Merchants,
Government & Railway Contractors ● Premier House of Artist,
Drawing & Engineering Goods

Authorised Dealers of KORES STATIONERY PRODUCTS

63-C, Radha Bazar Street ● Calcutta-700 001

M/s. Designers & Imprint

35, PAIKPARA ROW, CALCUTTA-700037

Most famous name in Silk Screen printing on Tea chest
Manufacturer of Plywood chest-lets & Mini Tea chest.

God has put you in the world. What can you do about it? Resign everything to Him. Surrender yourself at His feet. Then there will be no more confusion. Then you will realize that it is God who does everything. All depends on 'the will of Rama'.

—SRI RAMAKRISHNA

With Best Compliments Of:

Phone : OFF : 33-6237
RES : 33-4103

M/S. ROAD LIFTERS (INDIA)

Fleet Owners & Premium Road Carriers.
67/2, RATAN SARKAR GARDEN STREET,
CALCUTTA-700070

Phone : 31-1172
34-3274

M. L. ROY & CO.

(Neycer Dept.)
Authorised Distributors of
"Neycer" Sanitaryware "Essco" C. P. Fittings "Johnson" Tiles
28, College Street, Calcutta-73

With Best Compliments Of :

Phone : 35-2641

M/s. United Timber Agency

22D, CANAL WEST ROAD,

CALCUTTA-700 006

Phone : 27-1416

Manufacturers of :

All kinds of

"FIRE FIGHTING"

Appliances and Accessories DEFLAMER Brand
Fire Extinguisher

FIRE PREVENTIVE EMPORIUM

62, BENTINCK STREET

CALCUTTA-69

With Best Compliments From :

The National Insulated Cable Co. Of India Ltd.

NICCO HOUSE, HARE STREET
CALCUTTA-700001

Telex : 021-2653 (NICC IN)
Gram : "MEGOHM", Calcutta.
Phone : 23-5102 (6 Lines).
Works : Shamnagar, E. Rly.

Manufacturers of **Electric Wires & Cables.**

Branches All over India.

With Best Compliments of :

Bhupati Bose Charitable Trust

44/1, DHARMATALA LANE

HOWRAH-2

With Best Compliments of :—

Cable : INALIMER

Phone : OFF : 23-8787, 23-7388
RES : 72-4493, 72-1780

Industrial Implementers

ENGINEERS & CONTRACTORS

8-B, LALL BAZAR STREET

CALCUTTA-700001

With Best Compliments of :

R. N. INDUSTRIES

27-A. CREEK ROW

CALCUTTA-700014

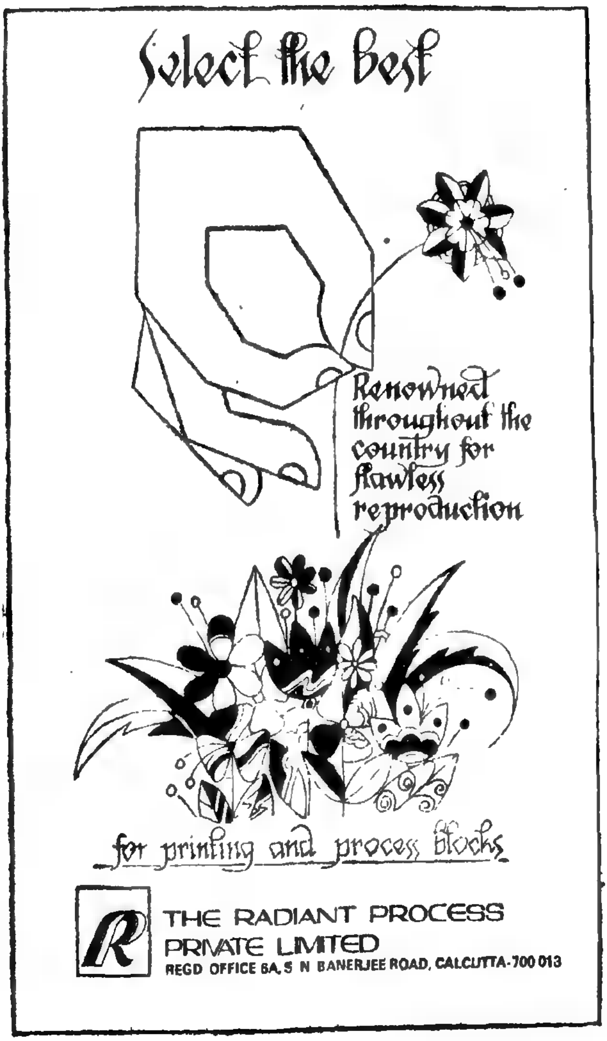

Select the Best

Renowned throughout the country for flawless reproduction

for printing and process blocks

R THE RADIANT PROCESS
PRIVATE LIMITED
REGD OFFICE 6A, S N BANERJEE ROAD, CALCUTTA-700 013

FOR YOUR REQUIREMENTS OF FERTILISERS
AND PESTICIDES, PLEASE CONTACT—

Rallis India Limited

AGROCHEMICAL DIVISION

16, HARE STREET

CALCUTT-700001

STUDY CENTRE

মাধ্যমিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে B. A., B Sc., B. Com., M.A. M. Sc., M. Com., LL B., Entrance প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষা পাশের ব্যবস্থা কোচিং-এর মাধ্যমে Guarantee দিয়ে করা হয়। যোগাযোগ করুন :—

Principal K. A. Rehman
Study Centre, Phone : 47-6320
Beside Bharati Cinema Hall.
Bhowanipore (Sat. & Sunday Closed)

Branches :
* 26/1 Surya Sen Street
(Sunday Closed)
- Calcutta-9
* Mayurvanj Road
(Opposite to Indian Oxygen Ltd.)
KIDDERPORE.

Branches :
Upper Chelidanga Masjid
Qts Nos—1
Near Upendranath High School
Assansol.
(Opened on Sunday only)

(OFFICE HOURS 10 A.M. to 4 P.M.)

* * *

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্"

"যথার্থ সাধু কখনও ব্যক্তিত্বের জালে আবদ্ধ হন না। তুচ্ছ, সামান্য ব্যাপার বা বস্তুকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। যাহারা উন্নত আদর্শে বঞ্চিত তাহারাই সহজে উদ্বিগ্ন এবং হতাশ হন এবং অপরকেও বিষণ্ণ করেন।"

—"প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা"
স্বামী পরমানন্দ

নিবেদক : লায়ন অমিত্ত বিশ্বাস • বাঁকুড়া

With Best Compliments from :

INDIAN PLASTICS LIMITED

LESSEE OF MINI STEEL PLANT OF

UNIVERSAL INDUSTRIES & COTTON MILLS LTD.

Plant :
Suri, Birbhum,
Phone : 340 & 561
Gram : SURISTEEL

Calcutta Office :
9/1, R. N. Mukherjee Road,
Birla Building
CALCUTTA-700001

Phone :
22-3476 22-3495
23-7416 22-2316
Gram : PLASTIKMEN

REGD. OFFICE :
POISAR BRIDGE, KANDIVIL,
BOMBAY 400 067
Phone : 66-1241

আপনারা সকলেই জানেন ছোটদের সেরা কাগজ

শুকতারা

কিন্তু, আপনারা কি জানেন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'শুকতারা' পত্রিকার পাঠক সংখ্যাই সর্বাধিক?

অপারেসন্স রিসার্চ গ্রুপ ও ইণ্ডিয়ান মার্কেট রিসার্চ ব্যুরো দ্বারা ভারতের শহরাঞ্চলে কৃত এবং
১৯৭৯ সালের গোড়ায় প্রকাশিত

ন্যাশনাল রিডারশিপ সার্ভে—২

এই তথ্য প্রকাশ করেছে। তদনুযায়ী নীচে পরিসংখ্যান দেওয়া হল :

পত্রিকার নাম	মোট পাঠক সংখ্যা
শুকতারা	১৬,৩৭,০০০
নবকল্লোল	৯,৪১,০০০

(উল্লেখযোগ্য যে, ওই সমীক্ষা ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের পাঠক-পাঠিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল)

আমাদের গর্ব বোধ করার আরও কারণ আছে

আমরা গর্বিত যে, ছোটদের এবং বড়দের পত্রিকা মিলিয়ে শহরাঞ্চলে যে দুটি পত্রিকা (**শুকতারা ও নবকল্লোল**) সবচেয়ে বেশী (২৫,৭৮,০০০) পাঠক-পাঠিকার কাছে পৌঁছয়, আমরাই তাদের প্রকাশক। আর, আপনারা তো জানেনই গ্রামাঞ্চল ও অন্যান্য অঞ্চলেও এই দুটি পত্রিকার কাটতিই সবচেয়ে বেশী।

আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের জানাই নমস্কার

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯
[ফোন : ৩৫-৪২৯৪, ৩৫-৪২৯৫]

Indian Engineering and their products have very successfully competed in the World market and Electroplating has played an important role in this. In fact Indian Electroplating is equal to that in any country in the World provided similar processes are adhered to. CHATTO CHEMICALS provide free Technical advice and latest techniques to enable the Indian Engineering Industries to compete anywhere in the World.

Our Technical personnel are vastly experienced in the field of Metal finishing. Do not hesitate to consult them. They are always to help you to achieve the best result in Electroplating.

★

CHATTO CHEMICALS

Head Office :
4/1, BHABANATH SEN STREET
Calcutta—700004

●

Branch Office :

Ludhiana Office :

Kucha Ahluwalia,
MILLER GANJ,
1576, G. T. ROAD,
Ludhiana—141003.

Delhi Office :

'EPCCO HOUSE'
C—12, Vishal Enclave
New Delhi—110027.

আমি বিশ্বাস করি না যে, হিন্দু কখনও নাস্তিক হইতে পারে। পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি পড়িয়া সে মনে করিতে পারে, সে জড়বাদী হইয়াছে; কিন্তু তাহা দু'দিনের জন্য। এভাব তোমাদের মজ্জাগত নহে; তোমাদের ধাতে যাহা নাই, তাহা তোমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পার না, তাহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব চেষ্টা।

—স্বামী বিবেকানন্দ

* * *

ফোন : ২৪-৪৩৬৮
২৪-৪৩৬৯
২৪-৪৩৬০

সুর এনামেলের বাসনপত্র গৃহস্থালী কাজে প্রসিদ্ধ

সুর এনামেল অ্যাণ্ড স্টাম্পিং ওয়ার্কস লিমিটেড

২৪, ডাঃ এস. এম. ভট্টাচার্য রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৪

*

শাখা : পানবাজার, গৌহাটি (আসাম)

পত্রের [উদ্বোধন পত্রিকার] প্রচার তো গৃহীদেরই কল্যাণের জন্য। দেশে নবভাবপ্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম বুঝি তুই সাধন-ভজনের চেয়ে কম মনে করছিস? আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নেই। আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, মাগছেলে নেই যে, তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে হবে। **Success** (কাজ হাসিল) হয় তো এর **Income** (আয়টা) সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে। স্থানে স্থানে সঙ্ঘ-গঠন, সেবাশ্রম-স্থাপন, আরও কত কি হিতকর কাজে এর উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যয় হ'তে পারবে। আমরা তো গৃহীদের মতো নিজেদের রোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ করছি না। শুধু পরহিতেই আমাদের সকল **movement** (কাজকর্ম)—এটা জেনে রাখবি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

● জনৈক ভক্তের সৌজন্যে ●

ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন। মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা।

প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয় - যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল।

—শ্রীসারদাদেবী

* * *

Sree Ma Trading Agency

—COMMISSION AGENTS—

26, SHIBTALA STREET * CALCUTTA-700070.

Phone : Off. : 31-1346 ; 35-5396
Res. : 72-1758

ভারতের সর্ববৃহৎ জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রতিষ্ঠান

রাজজ্যোতিষী মহোপাধ্যায় ডঃ ৺হরিশচন্দ্র শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত এবং ইয়োরোপ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যাগত ডঃ এ. ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী পরিচালিত। এখানে হস্তরেখা বিচার, কোষ্ঠী বিচার, কোষ্ঠী প্রস্তুত প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্যোতিষ-কার্য অর্ধশতাব্দী যাবৎ সঠিকভাবে করা হইতেছে, বিরূপ গ্রহ ও ভাগ্যের নিখুঁত প্রতিকার করা হয়।

ডঃ আশিস্ ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী (দ্বিতল)
হাউস অব এস্ট্রোলজি (স্থাপিত—১৯৩০)
৪৫এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড :: কলিকাতা-২৬,
[ফোন : ৪৭-৪৬০৩]

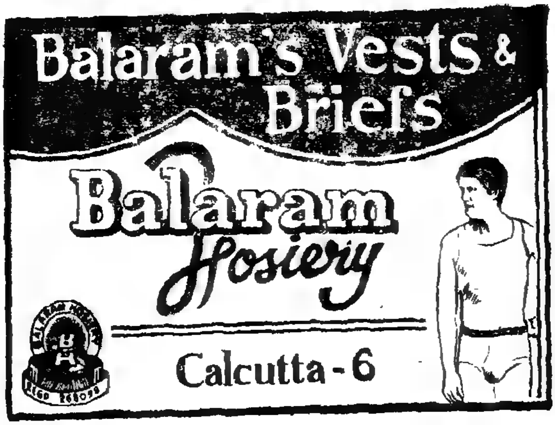
Balaram's Vests & Briefs
Balaram
Hosiery
Calcutta - 6

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পতাকাধারী, মানব সেবাব্রতী অবিনশ্বর স্বামী বীরেশ্বরানন্দের
সমুজ্জ্বল জীবনকথা

স্বামী বীরেশ্বরানন্দের জীবনী ও বাণী
মূল্য : দশ টাকা, ভি. পি. তেরো টাকা
ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বামী বীরেশ্বরানন্দের হস্তলিপি সম্বলিত
শ্রীশ্রীরুদ্র-চণ্ডী মূল্য : আট টাকা
পণ্ডিত শ্রীনারায়ণ চন্দ্র স্মৃতি-তন্ত্র-জ্যোতির্ভূষণ এম. আর. এ. এস. (লণ্ডন)
শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ ৮এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-৭৩

–INSIST ON HINDUSTHAN PRODUCTS–
MANUFACTURERS OF : LAUNDRY SOAPS,
LIQUID SOAPS, SOFT SOAPS, CARBOLIC SOAPS, Etc.

Hindusthan Chemical Corporation
12B, BIPIN MITRA LANE, CALCUTTA-4
[Phone : 55-2052.]

আগে চল! আমাদের চাই অনন্ত শক্তি, অফুরন্ত উৎসাহ, সীমাহীন সাহস, অসীম ধৈর্য, তবেই আমরা বড় বড় কাজ করতে পারবো।

—**স্বামী বিবেকানন্দ**

PAUL SONS & CO.
Dealers in : Mill-Stores, Second Hand Paper Cones Aviation
Wind Sleeves and General Order Suppliers
251A/6H/1, Netaji Subhas Chandra Basu Road,
Calcutta-700 047

With best compliments from :–

ROY ENGINEERING CO.
F C I Storing Agent
P.O.—Barasat Dist.—24-Parganas
Phone : 617-234
617-602

PAPER CRISIS AHEAD:

M ORE
ACHINES
UST
O
V
E

And we make such machines. Many more such machines must move and move fast to avert an acute scarcity of paper. Paper is indispensable—scarcity of this vital material will place the country's economic and intellectual advancement in jeopardy Backed by over 30 years' experience, we have developed facilities and expertise to manufacture and install the full range of paper & Pulp Mill machinery, capacity ranging from 2 tonnes to 250 tonnes per day. Our association with almost all the leading Paper Mills bear eloquent testimony to the superior performance of our Pulp and Paper Mill Machines.

Paper Spells Progress—

AND THOSE WHO MAKE IT—RELY ON US

Engineering Division

Eastern Paper Mills Limited

India's Leading Manufacturers of Pulp, Paper and
Board Mill Machines

Works & Office :

2, Dakshindari Road, Calcutta-700048

Phone : 57-5794 to 57-5799
Cable : Eastrnpaper
Telex : 021-2460 EPM IN

With Best Compliments from :

* *

HAVOL INDUSTRIES

24, PRIYANATH MULLICK ROAD

CALCUTTA-700025

*

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোন প্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হ'য়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হ'য়ে থাকে।

—**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব**

[ফোন : ৫৫-৩৪৬২

সাধুখাঁ এ্যাণ্ড কোং

স্টকিস্ট—এভারেস্ট এসবেসটাস

২৮ আর. জি. কর রোড
কলিকাতা-৭০০০০৪

* * *

যাবতীয় ইমারতী রং, মোজাইক দ্রব্যাদি, এভারেস্ট এসবেসটাস
শীট ও পাইপ ইত্যাদির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Shree Krishna Commercial Corporation

29, STRAND ROAD, CALCUTTA-700 001

Gram : 'ANJNIPUTRA'
Telex : 21-7807 KSNA IN

Phone : 25-0124
25-8109
25-6941

Wholesale Dealers :

THE WEST COAST PAPER MILLS LIMITED
THE ANDHRA PRADESH PAPER MILLS LTD.
THE BENGAL PAPER MILL CO. LTD.
BHADRACHALAM PAPERBOARDS LIMITED

কথামৃতের অমৃত এবার পদ্যে আস্বাদন করুন

সব বয়সের [illegible] উপযোগী

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও গল্প নিয়ে

কবিতায় কথামৃত
কবিতায় কথামৃত

সুন্দর বাঁধাই : অপূর্ব প্রচ্ছদ : -১ম খণ্ড : মূল্য -১৬.

মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩
রামকৃষ্ণ মিশনের সকল বিক্রয় কেন্দ্র।

পবিত্র উপহার

ছোট বড় সকলের হাতে তুলে দিন এই উপহারের নৈবেদ্য

With Best Compliments Of :—

Sri Babu Lal Agarwal

32, Dr. S. P. Mukherjee Road
Dum Dum, Calcutta-700 028

সুনিবিড় ছায়া ঘেরা তৃণ শস্যে ভরা,
বাঙলার পল্লী যেন মায়া দিয়ে গড়া।

কতগুলি পল্লী লয়ে গ্রামের রচনা,
তাহারই উন্নতি হোক মোদের কামনা।

পরমহংসের নাম শুনিয়াছ তুমি,
কামারপুকুর গ্রাম তাঁর জন্মভূমি।

এই মেঘ এই রোদ এই রং তুলি, এই ব্লক এই ছাপা, কেমনে তা ভুলি।

ফোন : ৩৪ ১৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

৭/১ বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

SUN LITHOGRAPHING CO.

PHOTO-OFFSET PRINTERS
&
PROCESS ENGRAVERS

★

P 20, C.I.T. ROAD
CALCUTTA 10
Phone : 352659

"যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো। তাও না পার (ঠাকুরকে দেখাইয়া) শরণাগত, একটু মনে রাখলেই হ'ল—আমার একজন মা কি বাবা আছেন।

সংসার মায়ার বন্ধন।······অমন কাজও করো না। যার উপর যেমন কর্তব্য হাসিমুখে ক'রে যাবে; জড়াবে না। একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কাউকে ভালবেসো না। ভালবাসলে অনেক দুঃখ পেতে হয়।

সংসারে যদি শান্তি পেতে চাও তো কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের।

আর সর্বদা মনে ভাববে আমি কার সন্তান, কার আশ্রিত। যখনই মনে কোন কু-ভাব আসবে, মনকে বলবে—তাঁর ছেলে হ'য়ে আমি কি এ কাজ করতে পারি? দেখবে—মনে বল পাবে, শান্তি পাবে।"

* * *

উদ্বোধনের মাধ্যমে মায়ের এই আশ্বাসবাণী ঘরে ঘরে প্রচারিত হোক—
এই কামনা করি
—শ্রীসুব্রত দত্তগুপ্ত

শতাধিক বৎসরের অভিজ্ঞতায়···

অক্ষয়
কুমার
লাহা

রং

১-ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলি
PHONE: 23-2765 GRAM: COLOURMAN

WHITE PAINT

[Phone : 33-2370]

দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

—বিশুদ্ধ সুরভি ঘৃতের খাবার—

DESHABANDHU MISTANNA BHANDAR

১২৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কলিকাতা-৭

শাখা : ৭৮, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯

ত
ত ন্তু শ্রী
শ্রী

তন্তুশ্রী

—বাংলা-সেরা তাঁতের কাপড়। বাংলার তাঁতশিল্পের নক্সায়, বুননে, বৈচিত্র্যে ও শিল্পরুচিতে যুগান্তর সৃষ্টিকারী নাম তন্তুশ্রী॥

বিক্রয় কেন্দ্র :—কলিকাতা, ত্রিপুরা (আগরতলা), নিউ দিল্লী, মাদ্রাজ, সিন্ধ্রী (বিহার) ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র॥

ওয়েস্টবেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম ডেভলপমেণ্ট
কর্পোরেশন লিঃ

(পঃ বঃ রাজ্য সরকারের সংস্থা)

৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (৭ম তল)
কলিকাতা-১৩

মার্কেটিং বিভাগ : ১এ, অভয় গুহ রোড,
কলিকাতা-৬

Ms. G. M. C. Brothers & Co.

2, Meredith Street
CALCUTTA-700072

Telephone Nos. 27-3007
27-3008
27-3009

দীর্ঘ ৪৫ বৎসর পর পুনর্মুদ্রিত হইয়া বাহির হইল

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কথা (১ম ভাগ)

স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ

মূল্য : ১৫'০০

"মনে হচ্ছে যেন স্বামিজীর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী কর্ণপুটে প্রবেশ করিতেছে।"
—সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান : রাধারমণ কুণ্ড
C/o Acrotone Radio Electronic Products
66, Bhupendra Bose Avenue, Cal-700004

With Best Compliments of :

Phone : 33-5422

Nagendra Nath Ghose & Co.

HARDWARE MERCHANTS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

159, NETAJI SUBHAS ROAD

CALCUTTA-1

K. P. BASU PUBLISHING CO.

42, BIDHAN SARANI, CALCUTTA-6

[Phone : 34-1100

পুস্তকতালিকা :—

১। সহজ আধুনিক গণিত (সপ্তম শ্রেণী)— কে. পি. বসু
২। সহজ আধুনিক গণিত (অষ্টম শ্রেণী)—কে. পি. বসু
৩ সহজ আধুনিক গণিত (নবম শ্রেণী)—কে. পি. বসু
৪। সহজ আধুনিক গণিত (দশম শ্রেণী)—কে. পি. বসু
৫। মধ্যশিক্ষা অতিরিক্ত গণিত (নবম-দশম শ্রেণী)—কে. পি. বসু

1960—1985

The Silver Jubilee Year

OXFORD®

a name that stands for
Quality, Value and Worth
in the world of

LABORATORY NOTE BOOK,
BOUND EXERCISE BOOK,
DRAWING BOOK, GRAPH BOOK, DIARY ETC.

MANUFACTURED & MARKETED BY

TRADERS SYNDICATE

67-A, MAHATMA GANDHI ROAD
CALCUTTA-700 009.

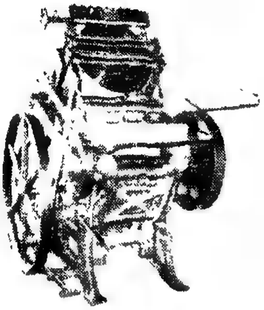

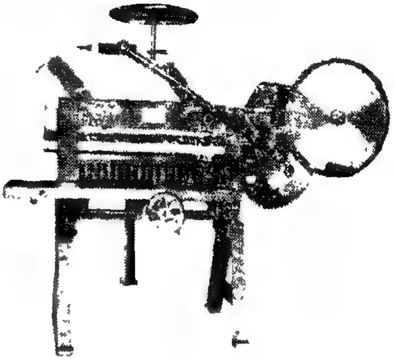

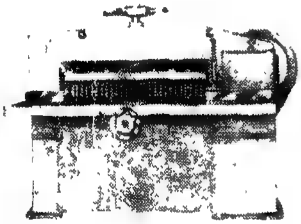

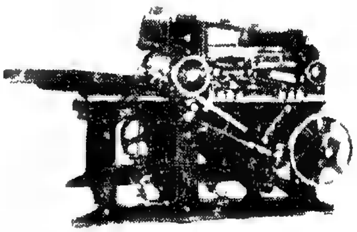

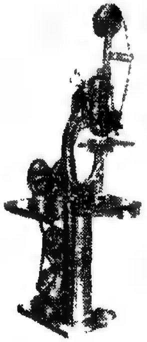

উচ্চমানের, অতি আধুনিক লেটারপ্রেস অটোমেটিক, অফসেট, ওয়েব অফসেট প্রিণ্টিং, পেপার কাটিং, ষ্টিচিং মেসিন ও আমদানী কৃত অফসেট, কাটিং, ব্লকমেকিং ও টাইপ ইত্যাদি।

এ, ঘোষ এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

৩ চৌরঙ্গী স্কোয়ার

ফোন - ২৭-৫০০৯

গ্রাম ঃ প্রেস্ট্রেড

কলিকাতা-৭০০০৭২

যে সাধন-ভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না, মহামোহগ্রস্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না, কামকাঞ্চনের গণ্ডি থেকে মানুষকে বের হ'তে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি? তুই বুঝি মনে করিস—একটি জীবের বন্ধন থাকতে তোর মুক্তি আছে? যত কাল তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম নিতে হবে তাকে সাহায্য করতে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীব যে তোরই অঙ্গ। এই জন্যই পরার্থে কর্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করিস, প্রতি জীবে যখন তোর ঐরূপ টান হবে, তখন বুঝব—তোর ভেতর ব্রহ্ম জাগরিত হচ্ছেন, not a moment before (তার এক মুহূর্ত আগে নয়)। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে এই সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা জাগরিত হ'লে তবে বুঝব, তুই ideal-এর (আদর্শের) দিকে অগ্রসর হচ্ছিস।

স্বামী বিবেকানন্দ

● জনৈক ভক্তের সৌজন্যে ●

ভয় কি, বাবা, সর্বদার তরে জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন, 'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে যাব।' যে যা-খুশি কর না কেন, যে যে-ভাবে খুশি চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, তারা তো ছুড়বেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

● জনৈক ভক্তের সৌজন্যে ●

তাঁর (ঈশ্বরের) শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়,—যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

—**শ্রীরামকৃষ্ণদেব**

Krishna Chandra Dutta
(COOKME) Pvt. Ltd.

* * *

MANUFACTURER EXPORTER & IMPORTER, GENERAL MERCHAN
COMMISSION AGENT.

CABLE : : 'COOKME' CALCUTTA ,. Phone : 34-1078, 32-6548

Sales Office :
38, Kalikrishna Tagore Street
Calcutta-700070
Post Box No. 2187

Registered Office :
207, Maharshi Debendranath Road,
Calcutta-700070
[Phone : 32-3112]

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা

বিবেকানন্দ-শিষ্য শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের শুভেচ্ছা-সম্বলিত প্রথম প্রামাণিক চরিতগ্রন্থ

পৃষ্ঠা ২৯০ : মূল্য ২০৲

প্রকাশক : শ্রীব্রহ্মপদ চক্রবর্তী, ২৫/১ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান : বিবেকানন্দ সোসাইটি, ১৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

এবং

7, AARTI, Vallabhbhai Patel Road, Santacruz West, Bombay-400 054

P. Chatarji & Co. Pvt. Ltd.

SHOWROOM & SALES DEPTT.

53, Ezra Street, Calcutta-1.
Phone : 26-7268
26-0312

9, Parsee Church Street,
Calcutta-1
Phone : 26-2608

Head Office :—23A, Raja Nabakrishna Street, Calcutta-5
Phone : 55-3929

Authorised Dealers & Stockists of :

Crompton Fans, Motors, Starters, Lamps, Tubes, Light fittings, Switch Gears Etc. G.E.C. Fans & Products, Usha & other Fans, Philips Lamps & Fittings, Insulating Materials, Electric Meters, Iron Clad Plugs Sockets & other Electrical Accessories.

With Best Compliments Of :

★

Phone : 33-5841

Kanai Lall Ghosh & Co. Private Limited

HARDWARE AND METAL MERCHANTS

—GOVERNMENT AND RAILWAY CONTRACTORS—

159, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-1

With Best Compliments of:

Phone : 25-6024/25

Ghatal Bandar Cold Storage

56, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-700 001

Men, Men, these are wanted : everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone, are wanted. A hundred such and the world becomes revolutionized.

—Swami Vivekananda

Space donated by :

Animesh Datta Choudhury

Orthopaedics Appliances Suppliers

Spinal Brace, L. S. Belt, Curvical Collar, Abdominal Belt, Crutch, Artificial Leg & All Orthopaedics Goods Etc.

[Phone : 21694

Medicare

Atindra Bhavan
Hill Cart Road
Road Station More
Siliguri

Never think there is anything impossible for the soul. It is the greatest heresy to think so. If there is sin, this is the only sin—to say that you are weak, or others are weak.

—**Swami Vivekananda**

◆

Space donated by :

Sri Harchand Rai Dalmia

Phone : 22-859
20-056

M/s. KANIRAM SHEWDAT RAI

Nehru Road.
P. O. Siliguri,
Dist. Darjeeling

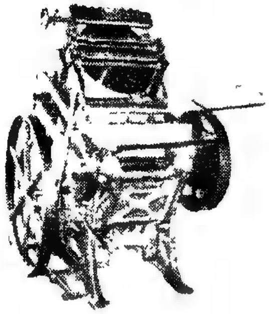

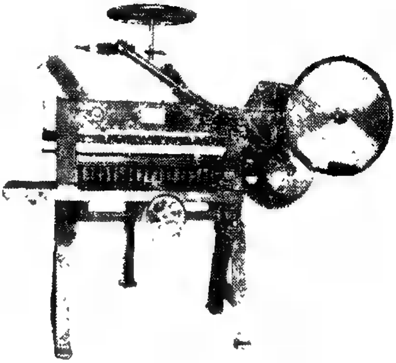

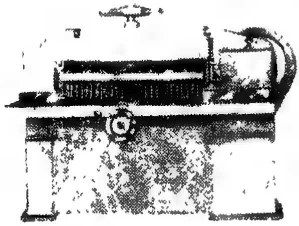

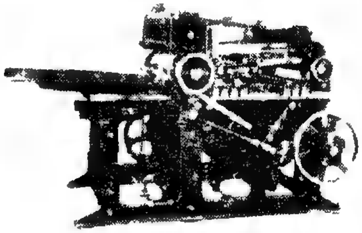

উচ্চমানের, অতি আধুনিক লেটারপ্রেস
অটোমেটিক, অফসেট, ওয়েব অফসেট
প্রিন্টিং, পেপার কাটিং, ষ্টিচিং মেসিন
ও আমদানী কৃত অফসেট, কাটিং,
ব্লকমেকিং ও টাইপ ইত্যাদি।

এ, ঘোষ এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

৩, চৌরঙ্গী স্কোয়ার
ফোন - ২৭-৫০০৯
গ্রাম - প্রেষ্ট্রেড
কলিকাতা-৭০০০৭২

যে সাধন-ভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না, মহামোহগ্রস্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না, কামকাঞ্চনের গণ্ডি থেকে মানুষকে বের হ'তে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি? তুই বুঝি মনে করিস—একটি জীবের বন্ধন থাকতে তোর মুক্তি আছে? যত কাল তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম নিতে হবে তাকে সাহায্য করতে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীব যে তোরই অঙ্গ। এই জন্যই পরার্থে কর্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করিস, প্রতি জীবে যখন তোর ঐরূপ টান হবে, তখন বুঝব—তোর ভেতর ব্রহ্ম জাগরিত হচ্ছেন, not a moment before (তার এক মুহূর্ত আগে নয়)। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে এই সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা জাগরিত হ'লে তবে বুঝব, তুই ideal-এর (আদর্শের) দিকে অগ্রসর হচ্ছিস।

—স্বামী বিবেকানন্দ

● জনৈক ভক্তের সৌজন্যে ●

ভয় কি, বাবা, সর্বদার তরে জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন, 'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে যাব।' যে যা-খুশি কর না কেন, যে যে-ভাবে খুশি চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, তারা তো ছুড়বেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

◆

● জনৈক ভক্তের সৌজন্যে ●

তাঁর (ঈশ্বরের) শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়,—যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

—**শ্রীরামকৃষ্ণদেব**

◆

Krishna Chandra Dutta
(COOKME) Pvt. Ltd.

* * *

MANUFACTURER, EXPORTER & IMPORTER, GENERAL MERCHANT, COMMISSION AGENT.

CABLE : : 'COOKME' CALCUTTA • Phone : 34-1078, 32-6548

Sales Office :
38, Kalikrishna Tagore Street
Calcutta-700070
Post Box No. 2187

Registered Office :
207, Maharshi Debendranath Road,
Calcutta-700070
[Phone : 32-3112]

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা

বিবেকানন্দ-শিষ্য শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের শুভেচ্ছা-সম্বলিত প্রথম প্রামাণিক চরিতগ্রন্থ

পৃষ্ঠা ২৯০ : মূল্য ২০৲

প্রকাশক : শ্রীব্রহ্মপদ চক্রবর্তী, ২৫/১ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান : বিবেকানন্দ সোসাইটি, ১৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

এবং

7, AARTI, Vallabhbhai Patel Road, Santacruz West, Bombay-400 054

P. Chatarji & Co. Pvt. Ltd.

SHOWROOM & SALES DEPTT.

53, Ezra Street, Calcutta-1.
Phone : 26-7268
26-0312

9, Parsee Church Street,
Calcutta-1
Phone : 26-2608

Head Office :—23A, Raja Nabakrishna Street, Calcutta-5
Phone : 55-3929

Authorised Dealers & Stockists of :

Crompton Fans, Motors, Starters, Lamps, Tubes, Light fittings, Switch Gears Etc. G.E.C. Fans & Products, Usha & other Fans, Philips Lamps & Fittings, Insulating Materials, Electric Meters, Iron Clad Plugs Sockets & other Electrical Accessories.

With Best Compliments Of :

★

Phone : 33-5841

Kanai Lall Ghosh & Co. Private Limited

HARDWARE AND METAL MERCHANTS

—GOVERNMENT AND RAILWAY CONTRACTORS—

159, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-1

With Best Compliments of:

Phone : 25-6024/25

Ghatal Bandar Cold Storage

56, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-700 001

Men, Men, these are wanted : everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone, are wanted. A hundred such and the world becomes revolutionized.

—**Swami Vivekananda**

◆

Space donated by :

Animesh Datta Choudhury

Orthopaedics Appliances Suppliers

Spinal Brace, L. S. Belt, Curvical Collar, Abdominal
Belt, Crutch, Artificial Leg & All Orthopaedics
Goods Etc.

[Phone : 21694

Medicare

Atindra Bhavan
Hill Cart Road
Road Station More
Siliguri

Never think there is anything impossible for the soul. It is the greatest heresy to think so. If there is sin, this is the only sin—*to say that you are weak, or others are weak.*

—**Swami Vivekananda**

* * *

Space donated by :

Sri Harchand Rai Dalmia

Phone : 22-859
20-056

M/s. KANIRAM SHEWDAT RAI

Nehru Road,
P. O. Siliguri,
Dist. Darjeeling

"Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth—sinners! It is a sin to call a man so; it is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep, you are souls immortal, spirits free, blest and eternal."

—Swami Vivekananda

◆

Space Donated by:

Arogya Niketan

(MATERNITY CUM NURSING HOME)

Shyamaprosad Mukherjee Road,
P. O. Siliguri,
Dist. Darjeeling

Space donated by :

Dr. (Mrs) K. Agrawal

M. B. B. S., (I.M.S., B H.U.), M. D. (Obst. & Gynae), M. A. G. S. (U.S.A).
Specialist in Gynaecology & Obstetrics

Incharge Maternity Section :

AROGYA NIKETAN

Maternity cum Nursing Home
S. P. Mookherjee Road, (Khalpara)
SILIGURI-734 405

VISITING HOURS

Morning : 9 A.M. to 12 Noon
Evening : 4-30 P. M. to 6-30 P. M.
Sunday Evening Closed

Space Donated by :

Dr. R. K. Agrawal

B. Sc., M. B. B. S. (I.M. S., B. H U.)
M. S. (Surgery), M. A. G. S. (U.S.A.)
M. R. S. H. (London)

Specialist in Surgery & Pediatric Surgery

Incharge :

AROGYA NIKETAN

Maternity cum Nursing Home
S. P. Mookherjee Road, (Khalpara)
Siliguri-734 405

VISITING HOURS

Morning : 8 a.m. to 12 Noon
Evening 4 p.m. to 7 p.m.
Sunday Evening Closed

Korunamoyee Iron Traders And Fabricators

Dealers in :
G. P. Sheet, B. P. Sheet, C. R. C. Sheet & Corrugated
Sheet, Fiber Sheet,

Manufacturers :
Collapsible Gate, Rolling Shutter, M. S. Grill
Railing, Steel Window and all Type of
Fabricating Job & General Order Supplier.

16, Nirmal Chandra Street, Calcutta-12. Dial. 27-7524

This world is the great gymnasium where we come to make ourselves strong. **—Swami Vivekananda**

SRI MAHABIR PROSAD AGRAWAL

Arogya Niketan Medical Store

S. P. Mukherjee Road
Khalpara
Siliguri—734405

ওঁ শান্তি

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২।২৩

আমার পরমারাধ্যা জননী স্বর্গীয়া প্রতিভাদেবীর
আত্মার কল্যাণ কামনায়

শ্রীসুব্রতকুমার গুপ্ত

রাজবল্লভ পাড়া
কলিকাতা-৩

উল্টাডাঙ্গা অয়েল মিলস্
হাবাণ মার্কা খাঁটি সরিষাব তৈল (আগ মার্কা ১ম শ্রেণী)
ও হাবাণ মার্কা সরিষাব খইল প্রস্তুতকারক।
৩৫/৫ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড
কলিকাতা-৭০০০০৪ [ফোন : ৫৫-৫০৮৮, ৫৫-৯৪৯৪

নন্দলাল ভট্টাচার্যের অমৃতস্য পুত্রাঃ ২০, টাকা
এই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং মিশনের প্রেসিডেন্ট মহারাজগণের সচিত্র জীবনী।

নন্দলাল ভট্টাচার্যের পরিব্রাজক শ্রীরামকৃষ্ণ ২০, টাকা
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘুরেছেন তীর্থে তীর্থে, আবার তাঁর শুভ পদার্পণে বহু গৃহ হয়েছে তীর্থ। মিলিত হয়েছেন সমকালীন ভারতীয় মহাসাধকগণের সঙ্গে। সেই পরিব্রাজন আর মহামিলনের আকর্ষণীয় সচিত্র ইতিহাস।

• লিপিকা • ৩০/১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯ •

বেকার যুবকদের
নিজস্ব কুটির শিল্প
গড়ার এক অপূর্ব সুযোগ

আপনি কি আপনার নিজস্ব ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প গড়ার কথা ভাবছেন। আপনার হাতের কাছে এক অপূর্ব সুযোগ অপেক্ষা করছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। নন্দীর নির্ভর যোগ্য কয়েকটি বলপ্রেস বা পাওয়ার প্রেস, হাইড্রোলিক প্রেস ইত্যাদি কিনে, লিঙ্ক ক্লিপ, সুইচ বক্স, স্টীল ফার্ণিচার, হিনজ পাওয়ার বোল্টস, অটোমোবাইল ও সাইকেল পার্টস জাতীয় নানা জিনিষ তৈরী করে মাসে ২000 টাকা উপার্জন করুন। অবিলম্বে আমাদের সাথে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। মেশিন কেনার ক্ষেত্রে কোম্পানী সব রকম পরামর্শ দিয়ে থাকে :

নন্দী এ্যান্ড কোং
১২৫, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া
ফোন : ৬৯-২০৬১

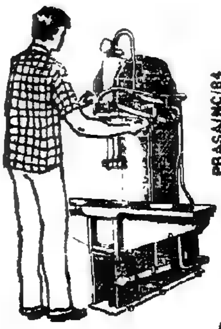

আনন্দময়ীর শুভাগমনের অবসরে
আচার্যবরিষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত

উদ্বোধন পত্রিকার

প্রচারের মাধ্যমে জন-মানস
তাঁরই ভাবধারার
আকলনে
আনন্দময় হয়ে উঠুক !
—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবাশ্রিত জনৈক

Phone : Off : 27-3793
Res. : 31-1321

Mritunjoy Stores

Liquid Soap, Disinfectants, Insecticides
&
Miscellaneous Domestic requisites.

Stockists of : Swastic Oil Mills Ltd.
(Industrial Product Div.)
Bayer India Ltd. (Public Health Products)
27, CANNING STREET, CALCUTTA-1

With best compliments from :

Kejriwal Brothers

Coal & Coke Merchants
1, Princep Street
CALCUTTA-700 072

Off : 27-2697
Phone : Resi. : 34-4563
31-1012
Jharia : 60611

প্রস্তুত কারক
শ্রী দুলালচন্দ্র ভড়ের সহিযুক্ত
দুলালের তালমিছরি
কিনুন

Dulal ch Bhar

শ্রী দুলালচন্দ্র ভড় ২৮নং বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৫ ফোন ঃ ৩৩-৮২৮৪

With Best Compliments of:

Water Supply Specialists Private Ltd.

Mission Row Extention, Post Box 424

(GUJRAT MANSION)

CALCUTTA-700001

Cable : 'PAYASI', Calcutta
Telex : 021-4393 TOSH IN

With Compliments from :

Phone : 26-2102/2
26-7543
26-5236
Post Box No. 2444

A. Tosh & Sons Private Limited

TEA MERCHANT & EXPORTERS
'TOSH HOUSE'

P-32 & 33, India Exchange Place,
Post Box No. 2444
Calcutta-700 001

Branch :

'TOSH HOUSE'
WILLINGDON ISLAND
Post Box—605
Cochin-682 003.

WINSOME STEEL TRADE

6, Clive Row
Calcutta 700001

Phone : Office : 22-9587, 22-3603
Residence : 48-1128 47-4330

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥

Lords Fruits Preserving Co.

13-A, Jagadish Nath Roy Lane
Calcutta-700005, Phone : 55-6584

যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ—কেউ পর নয় মা; জগৎ তোমার। —শ্রীশ্রীমা

* মুদ্রণশ্রী *

১৬৮/সি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলি-৭০০০০৪

[ফোন : ৫৫-৩১৬৬

"ভয় কি, বাবা, সর্বদার তবে জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে তোমাদের ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন, 'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে যাব।"
—শ্রীশ্রীমা

সৌজন্যে :— **M/s. Sudha Advertising Agency**
10, Sovaram Basak Street
Calcutta-700 070

শিশুর খাদ্যে ও রোগীর পথ্যে
রক্ষিতের তাল মিছরী
রক্ষিত এণ্ড কোং
১১ বি, বৈষ্ণব শেঠ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সোনার কেল্লা
বেনারসী সিল্ক, স্যুটিং, সার্টিং,
৯৯এ, বিধান সরণী (শ্যামবাজার),
কলিকাতা-৭০০ ০০৪
[ফোন : ৫৫-০৪৮০]

With Best Compliments From :

"যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ, কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।"
—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

Phone : 536340, 540938

TARA CONSTRUCTION COMPANY
ENGINEERS & CONTRACTORS
2, Aarti North Avenue Co-operative Housing Society,
V. P. Road, Santacruz (W). Bombay-400 054

The Assam Company (India) Ltd.

52, Chowringhee Road,

CALCUTTA—700071

Telephone : 43-2018, 43-1978, 44-1722, 44-0278

Cable : AHOMCHA, Calcutta.

Telex : 217114 (ACHA IN)

গুরুমহারাজ শ্রীশ্রীমোহনানন্দজীর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী :—

১। "সবচেয়ে বড় সাধনা, সবচেয়ে বড় লক্ষ্য—অবিশ্রান্ত তাঁর স্মরণ।"
২। "কল্যাণ আর কি—যখন আমরা স্বার্থপরতার বন্ধন থেকে মুক্ত হই—তখনই চির কল্যাণ।"
৩। "ভোগবৃত্তি মানুষকে অসুর করে—ত্যাগবৃত্তিই মানুষকে দেবতা করে।"
৪। "প্রতিটি কর্মই যজ্ঞ হইতে পারে যদি কর্মমাত্রেই ভগবদর্পিত হয়।"

⁂

চারপুরুষের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

এম. বি. সরকার

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার প্রবর্তক
আসল রত্ন ও মহারত্নাদি সহজলভ্য

পি-২০, মা সারদামণি সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৩
(বাগবাজার স্ট্রীট ও গিরিশ অ্যাভিনিউ সংযোগস্থলের নিকট)
সময় : রবিবার ও ছুটির দিন বাদে—সকাল ৯টা—১২টা
বিকাল ৫টা—৮টা

ফোন নং : ৫৪-৫৪২৭

Phone : 27-8514

Eastern Agency

DEALERS OF SURVEY-DRAWING MATERIALS
DISTRIBUTORS 'SWAN' AMMONIA PAPER
14/2, OLD CHINA BAZAR STREET
CALCUTTA-700001

With Best Compliments of :

R. N. DATTA & CO.
Makers of Galvanised & Black ERW Quality Conduits.
M.S. Pipes and Accessories.
HOLDERS OF ISI MARK
MERCANTILE BUILDINGS, Block 'D', 1st Floor,
10/1F, Lall Bazar Street,
Post Box No. 579.
CALCUTTA-700 001.

Telegram : 'CONTUBES'
Telephone : 23-5509, 23-2874

With best compliments from :

Boncon Engineers (P) Limited
247, Shiv Shakti Industrial Estate,
Off Mathuradas Vasanji Road,
Andheri East, Marol, Bombay-400059.

Machine Design & Plant Consultants to :—
Soft Drinks, Dairy, Breweries, Pharmaceutical, Chemical and allied Industries

---

With Best Compliments from :

GRAM : ROCKETPLY CALCUTTA
Phones : 22-0713, 22-4061, 22-6793, 23-5804

Wood Craft Products Limited
BIRLA BUILDING, 7th Floor
9/1, R N MUKHERJEE ROAD
Calcutta-700 001.

Manufacturers & Exporters
"ROCKETPLY" Commercial Plywood, Decorative Plywood,
Block Board & Flush Doors.

বিগত ৪৪ বছর যাবত নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে !!

শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্জিকা

এই পঞ্জিকায় তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, জন্মে, মৃতে, যোগিনী, বারবেলা, কালরাত্রি, যাত্রা, বিবাহ, শুভকর্ম বিবিধ অমৃতযোগ, মাহেন্দ্র যোগ দেওয়া আছে। সমস্ত ধর্মকৃত্যের উল্লেখ আছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণাশ্রিত সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তমণ্ডলীর আবির্ভাব তিরোভাব তিথিও দেওয়া আছে। দৃক্‌সিদ্ধান্ত মতানুযায়ী গণনা।

পঞ্জিকা পাইতে ইচ্ছুক ও বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সত্বর নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন!

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠ
১০, রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

ফোন—৫৪-৪৩৩৯

Manufacturers of Quality Sugar

Bagaha Chini Mills Limited

Registered Office :
5 & 6, **Pannalal Banerjee Lane**
(Fancy Lane)
Calcutta-700 001

Gram : NORBISUGAR
Telex : 7396 Fibre Cal
Phone : 22-7756 (4 Lines)

Mills at :
Bagaha (N. E. Rly.)
Distt. W. Champaran
Bihar.

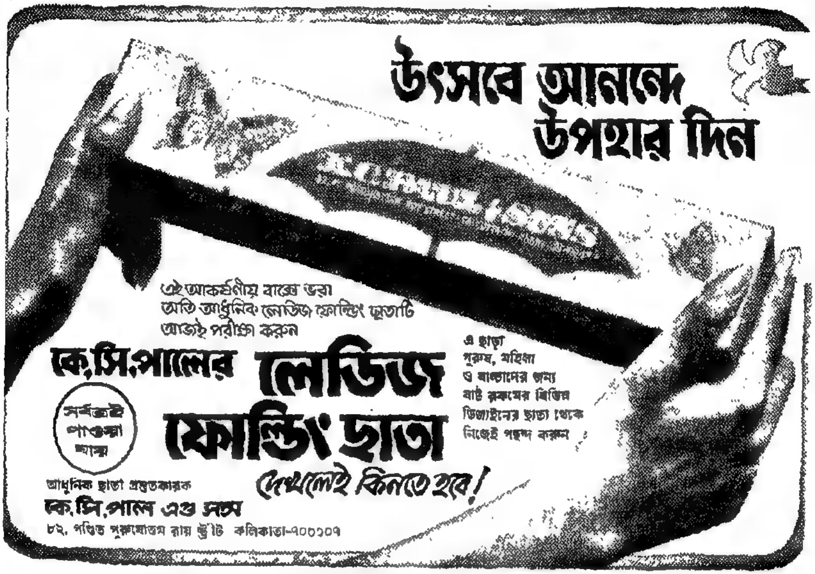

উৎসবে আনন্দে
উপহার দিন

এই আকর্ষণীয় বাক্সে ভরা
অতি আধুনিক লেডিজ ফোল্ডিং ছাতাটি
আজই পরীক্ষা করুন

কে.সি.পালের লেডিজ
ফোল্ডিং ছাতা

সর্বত্রই
পাওয়া
যায়

এ ছাড়া
পুরুষ, মহিলা
ও বাচ্চাদের জন্য
ষাট রকমের বিভিন্ন
ডিজাইনের ছাতা থেকে
নিজেই পছন্দ করুন

দেখলেই কিনতে হবে!

আধুনিক ছাতা প্রস্তুতকারক
কে.সি.পাল এণ্ড সন্স
৮২, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

Dial : 47 { 1265
0573
6408

Cement Trading Corporation

38B, BALARAM BOSE GHAT ROAD

CALCUTTA-700 025

STOCKIST OF :

"KONARK" BRAND CEMENT

॥ মনমুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বলছি—'হে ভগবান্ তুমি আমার সর্বস্ব ধন', এবং মনে বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে বসে রয়েছি ; এরূপ লোকের সকল সাধনই বিফল হয় ॥

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

With Best Compliments of :

Cardo Print Supply (P) Ltd.

All sorts of card-board boxes and carton manufacturers and book-binders.

93/1M, BAITHAKKHANA ROAD, CALCUTTA-9

[Phone : 35-2874]

With Best Compliments of :

Phone : 22-9321

The G. S. Emporium (Agency) Ltd.

16, India Exchange Place
Calcutta-700001

Bumper Offer

Special Hire Purchase Scheme

Black & White TV (Uptron, Crown, Webel, Televista) ···	700.00
Refrigerator (Kelvinator) ···	1500.00
Fan (Polar, Orient) ···	100 .00
Almairah ···	1000.00

S. K. ENTERPRISES

9C, Esplanade Row East
Dharmatala Market : Shop No. 15
Calcutta-700069

সমস্ত প্রকার সেলাই-এর সুতা পাওয়া যায় :

প্রতিমা ষ্টোর

৪১নং খোংরা পট্টী
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রশ্ন—ঈশ্বর কোথা আছেন, তাঁকে কিরূপে পাওয়া যায় ?

উত্তর—সমুদ্রে রত্ন আছে যত্ন চাই। সংসারে ঈশ্বর আছেন সাধনা চাই।

বাউল যেমন দুহাতে দুরকম বাজনা বাজায় আর মুখে গান করে, হে সংসারী জীব! তুমিও হাতে কর্ম কর, কিন্তু মুখে ঈশ্বরের নাম সর্বদা করতে ভুলো না।

যেমন কালীঘাটে মায়ের বাড়ী যাবার অনেক পথ আছে; সেইরকম ভগবানের ঘরেও নানা পথ দিয়ে যেতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্মই এক এক পথ দেখাইয়া দিতেছে। ঈশ্বরীয় কথায় ইতি করা যায় না—পড়ুন।

৺সুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও মিত্র ব্রাদার্স [ফোন : ৩৩-৩৭৮০] হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ

এই একমাত্র পুস্তকই ১৮৮৪ খৃঃ ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় মধুর, সুরেন্দ্রাদি ভক্তগণ কর্তৃক ঠাকুরের নিকট পঠিত হইলে **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং "শালা ঠিক ঠিক লিখেছে"** বলিয়া হাস্য করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত পুস্তক বাহির হইয়াছে ও হইতেছে তন্মধ্যে **ইহাই আদি ও সর্বপ্রথম পুস্তক**।

—: প্রাপ্তিস্থান :—

উদ্বোধন অফিস, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ (কামারপুকুর), শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির (জয়রামবাটী), গোলপার্ক, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী বুকস্টল ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

ফোন : ২৩-২৯৮৯ গ্রাম : ডিফেনডার

ইষ্ট ইণ্ডিয়া আর্ম্মস্ কোং

১ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, ক্যাপ, বারুদ, ছিটা প্রভৃতি আমদানী কারক।

With Best Compliments of :

[Phone : 55-2726

Madan Gopal Medical Stores

449 Rabindra Sarani

Calcutta-700006

With Best Compliments from :

Phone . 57-5652, 57-6189

Jayanta Group of Industries

Manufacturers of Glass Shells for GLS. Lamps and 'Orient', 'Globe' and 'Jayanta' Brand GLS. Lamps

Teghoria, P. O. Hatiara, Calcutta-700059

* *

Mukherji Tea House

Wholesale and Retail tea merchant.

Chandrakona Road. Midnapur.

For Quality Sweets

Phone : 54-1025

Please Step in :—

* * *

Chittaranjan Mistanna Bhandar

34 B, Shyambazar Street, Calcutta-700005

Estd. 1907

Makers of : SPECIAL SPONGE RASSOGOLLA & KESHAR ITEMS

With Best Compliments From :

HOUSE OF ELECTRONICS

H. B. ENTERPRISE

110-B, S. P. Mukherjee Road, Calcutta-26 : 482002

59, Ballygunge Gardens (Gol Park) Calcutta-19 : 411172

With Best Compliments From :

BASUSREE CINEMA

(Air Conditioned)

102, S. P. Mukherjee Road

Calcutta-700 026

Phone : 47-8807
47 8808

Durgapur Steel Plant. India's major Steel complex. A veritable giant in whose benevolent shadow hundreds of people work, play and grow. Fed and supported by the plant's Steel strength.

And people have given their love in return. Their constant care and round-the-clock untiring work help the plant grow.

* *

Steel Authority of India Limited

DURGAPUR STEEL PLANT

*

With Best Compliments From :

Hindustan Motors Limited

Manufacturers of :

Contessa and Ambassador Cars, Hindustan Driveaway Chassis
Hindustan Normal Control & Full Forward Control Trucks
Passenger Coach, Mini Bus, Trekker and Porter

Excavators, Electric Overhead Travelling Cranes Upto 400
Tonnes Capacity, Dumpers, Front End Loaders,
Crawler Tractors, Scrapers

★

Registered Office at
9|1 R. N. Mukherjee Road
CALCUTTA-700 001

Factories at

HINDMOTOR (West Bengal) **TRIVELLORE (Tamil Nadu)**

প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন ক'রে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপে তৈরি করছি। শিক্ষা শেষ হ'লে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিভাবে হ'তে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান্ সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মতো পরিষ্কার ক'রে তাদের বুঝিয়ে দেবে। তোদের দেশের mass of people (জনসাধারণ) যেন একটা Sleeping Leviathan (ঘুমন্ত বিরাট জলজন্তু)। এদেশের এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এতে শতকরা বড়জোড় একজন কি দুজন দেশের লোক শিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে—তারাও দেশের হিতের জন্য কিছু ক'রে উঠতে পারছে না। কি করেই বা বেচারি করবে বল? কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে সে সাত ছেলের বাপ! তখন যা তা ক'রে একটা কেরানিগিরি, বড়জোর একটা ডেপুটিগিরি জুটিয়ে নেয়। এই হ'ল শিক্ষার পরিণাম! তারপর সংসারের ভারে উচ্চকর্ম উচ্চচিন্তা করবার তাদের আর সময় কোথায়? তার নিজের স্বার্থই সিদ্ধ হয় না; পরার্থে সে আবার কি করবে?

—**স্বামী বিবেকানন্দ**

Sur Iron and Steel Co. Ltd.

15 CONVENT ROAD
CALCUTTA-700 014

M/s. Designers & Imprint

35, Paikpara Row, Calcutta-700037

Most famous name in Silk Screen printing on Tea chest
Manufacturer of Plywood chest-lets & Mini Tea chest.

God has put you in the world. What can you do about it? Resign everything to Him. Surrender yourself at His feet. Then there will be no more confusion. Then you will realize that it is God who does everything. All depends on 'the will of Rama'.

—SRI RAMAKRISHNA

With Best Compliments Of :

Phone : OFF : 33-6237
RES : 33-4103

M/S. ROAD LIFTERS (INDIA)

Fleet Owners & Premium Road Carriers.
67/2, RATAN SARKAR GARDEN STREET,
CALCUTTA-700070

Phone : 31-1172
34-3274

M. L. ROY & CO.

(Neycer Dept.)
Authorised Distributors of
"Neycer" Sanitaryware "Essco" C. P. Fittings "Johnson" Tiles
28, College Street, Calcutta-73

With Best Compliments Of :-

* * *

Phone : 35-2641

M/s. United Timber Agency

22D, CANAL WEST ROAD,

CALCUTTA-700 006

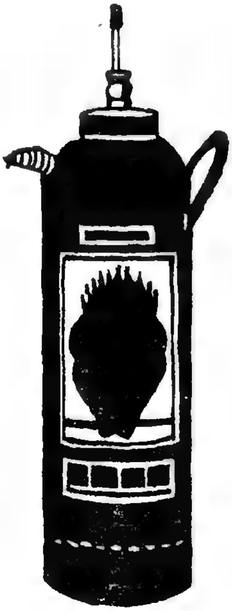

Phone : 27-1416

Manufacturers of :

All kinds of

"FIRE FIGHTING"

Appliances and Accessories DEFLAMER Brand
Fire Extinguisher

FIRE PREVENTIVE EMPORIUM

62, BENTINCK STREET

CALCUTTA-69

With Best Compliments From:

The National Insulated Cable Co. Of India Ltd.

NICCO HOUSE, HARE STREET
CALCUTTA-700001

Telex : 021-2653 (NICC IN)
Gram : "MEGOHM", Calcutta.
Phone : 23-5102 (6 Lines).
Works : Shamnagar, E. Rly.

Manufacturers of **Electric Wires & Cables.**

Branches All over India.

With Best Compliments of :

Bhupati Bose Charitable Trust

44/1, DHARMATALA LANE

HOWRAH-2

With Best Compliments of :—

Cable : INALIMER

Phone : OFF : 23-8787, 23-7388
RES : 72-4493, 72-1780

Industrial Implementers

ENGINEERS & CONTRACTORS

8-B, LALL BAZAR STREET

CALCUTTA-700001

With Best Compliments of :

R. N. INDUSTRIES

27-A. CREEK ROW

CALCUTTA-700014

Select the Best

Renowned throughout the country for flawless reproduction

for printing and process blocks

THE RADIANT PROCESS
PRIVATE LIMITED
REGD OFFICE 6A, B N BANERJEE ROAD, CALCUTTA-700 013

FOR YOUR REQUIREMENTS OF FERTILISERS
AND PESTICIDES, PLEASE CONTACT—

Rallis India Limited

AGROCHEMICAL DIVISION

16, HARE STREET

CALCUTT-700001

STUDY CENTRE

মাধ্যমিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে B. A., B Sc., B. Com., M.A. M. Sc., M. Com., LL B, Entrance প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষা পাশের ব্যবস্থা কোচিং-এর মাধ্যমে Guarantee দিয়ে করা হয়। যোগাযোগ করুন ঃ—

Principal K. A. Rehman
Study Centre, Phone : 47-6320
Beside Bharati Cinema Hall.
Bhowanipore (Sat. & Sunday Closed)

Branches :
* 26/1 Surya Sen Street
(Sunday Closed)
Calcutta-9
* Mayurvanj Road
(Opposite to Indian Oxygen Ltd.)
KIDDERPORE.

Branches :
Upper Chelidanga Masjid
Qts Nos—1
Near Upendranath High School
Assansol.
(Opened on Sunday only)

(OFFICE HOURS 10 A.M. to 4 P.M.)

* * *

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্"

"যথার্থ সাধু কখনও ব্যক্তিত্বের জালে আবদ্ধ হন না। তুচ্ছ, সামান্য ব্যাপার বা বস্তুকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। যাহারা উন্নত আদর্শে বঞ্চিত তাহারাই সহজে উদ্বিগ্ন এবং হতাশ হন এবং অপরকেও বিষণ্ণ করেন।"

—"প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা"
স্বামী পরমানন্দ

নিবেদক ঃ লায়ন অমিত বিশ্বাস ● বাঁকুড়া

With Best Compliments from :

◆

INDIAN PLASTICS LIMITED

LESSEE OF MINI STEEL PLANT OF

UNIVERSAL INDUSTRIES & COTTON MILLS LTD.

Plant :
Suri, Birbhum,
Phone : 340 & 561
Gram : SURISTEEL

Calcutta Office :
9/1, R. N. Mukherjee Road,
Birla Building
CALCUTTA-700001

Phone :
22-3476 22-3495
23-7416 22-2316
Gram : PLASTIKMEN

REGD. OFFICE :
POISAR BRIDGE, KANDIVIL,
BOMBAY 400 067
Phone : 66-1241

With best compliments from :

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

3rd Floor, Maker Chamber IV,
222, Nariman Point, Bombay 21.

VIMAL

Suitings, Shirtings, Sarees & Dress Materials. India's widest range of Synthetic and Blended Fabrics, beautiful collections in qualities like :
TEREX, TRIWOL, SNOWBALL, SUPERTEX, PERKINI, VERONICA ETC.

MANUFACTURERS OF :

"TEXAFIT" a texturised bulk stabilised yarn in all Deniers, Single and Double

and

"RECRON" Polyester Filament Yarn in different deniers.

MILLS RETAIL SHOWROOM :

LAFFANS
Veer Nariman Road,
Fountain, Bombay.

Telephone Nos. 22-6070, 22-5870
Grams : "RELCOMCOP"
Telex : 11-2950 VMAL IN.

'প্রাণের আরাম,
মনের আনন্দ,
আত্মার
শান্তি'

—শান্তিনিকেতন

কোলাহলের অসহ্য পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চলুন সব পেয়েছির দেশ শান্তিনিকেতনে, যেখানে মানুষ আর প্রকৃতি কাছাকাছি, যেখানে পরিবেশ সুমধুর, বাতাস স্নিগ্ধ, গন্ধমদির। জগৎ এসে যেথায় মেশে সেই শান্তিনিকেতনে এসে মনে হবে এলেম নতুন দেশে।
রবিতীর্থ এই আশ্রমে এসে পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন, ফিরিয়ে আনুন মনের প্রশান্তি। দেখুন মুক্তাঙ্গন অধ্যয়ন, বিচিত্র দেয়ালচিত্র, নন্দলাল, রামকিংকর, বিনোদবিহারীর শিল্পকর্ম, কলাভবন ও বিচিত্রার অমূল্য সংগ্রহশালা, রবীন্দ্ররচনার পাণ্ডুলিপি আর তাঁর চিত্রকলার নিদর্শন। আসুন উত্তরায়ণের আঙিনায়—দেখুন সেখানকার অপূর্ব গৃহশৈলী, উদয়ন, কোনার্ক, পুনশ্চ, উদীচি আর শেষ বেলাকার ঘরখানি শ্যামলী। আসুন শান্তিনিকেতনে, যেখানে আকাশে গান, বাতাসে গান, ঋতুতে ঋতুতে উৎসব। আপনার আনন্দ আর আরামের জন্য প্রস্তুত ট্যুরিস্ট লজ।

বিশদ বিবরণ ও বুকিংএর জন্য
যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো এবং রিজার্ভেসন কাউন্টার,
ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট)
কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৩-৮২৭১,
গ্রাম : TRAVELTIPS : নেহরু রোড, দার্জিলিং ;
হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি ;
ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফরমেশন ব্যুরো,
এ/২ স্টেট এম্পোরিয়া, বাবা খরগ সিং মার্গ,
নিউদিল্লী-১১০০০১ ফোন : ৩২৩৮৪০।
করিম ম্যানসন, ৭৮৭, আন্না সালাই,
মাদ্রাজ-৬০০ ০০২ ফোন : ৮৭৬১২

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

With best compliments from :

B. K. ROY PRIVATE LIMITED

4, BANKSHALL STREET,
CALCUTTA-700 001

Bharat General &
Textile Industries
Limited

Regd. & H. O.
9/1, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700 001
Telex : 021-3394 A/B 'BGTI IN'
Gram : KESOSHOP—Phones : 22-7668, 23-6976

Leading Exporters of Cottonseed extractions

Manufacturers of
'COOKEN Brand' Refined Cottonseed oil
'RHINO Brand' Cotton yarn

Oil Mills & Refineries : Dhamangaon (PS), Malkapur (Buldana) & Achalpur (all in Maharashtra) & Guntur (Andhra Pradesh).
Extraction Division : Malkapur (Maharashtra)
Spinning Mills : Assam Cotton Mills, Chariduwar (Assam).

মধ্য কলিকাতায় অবস্থিত

২৫ বৎসরের পুরান একটি অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

CHAKRABURTI'S

AID TO ED.

ESTD.—1960

(**রজত জয়ন্তী ১৯৮৫-তে**)

(Govt. Affiliated : Affiliated to I. C. W. A of India)

এখানের শিক্ষা পদ্ধতি উচ্চমানের—সকল বিষয় পড়ান হয়। ইহা শিক্ষিত অভিজ্ঞ অধ্যাপক দ্বারা খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র নিয়ে প্রতি বিষয়ে পৃথক করে পড়ান হয়। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বি. এ., বি. এস. সি., বি. কম্ (পাশ এবং অনার্স) এম. এ., এম. কম্ ও অন্যান্য পরীক্ষার বিষয় যেমন—Jt. Entrance, C. A. Entrance, Banking প্রভৃতি।

৩৯নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

COSTING COURSE

I. C. W. A. (Intermediate and Preliminary)

কোচিং দেওয়া হয়।

১২৮, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ ফোন : ৩৫-৫৭৩৩

যোগাযোগের সময়—সকাল ৯টা থেকে ১২টা এবং বিকাল ৩টা থেকে ৯টা।

Announcing
the newcomer in the family.

REMINGTON *Travelriter*

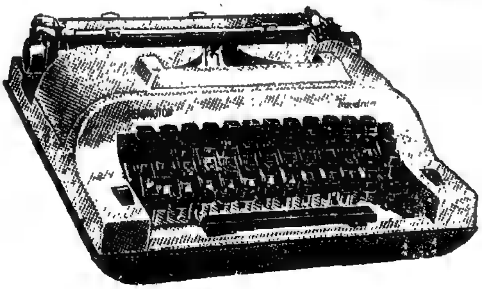

Easy to type, easy to carry.
India's only portable typewriter.

REMINGTON RAND
OF INDIA LIMITED

Calcutta · Bombay · Delhi · Madras

With best compliments of :

PHONE : Office : 25-2282
Resi : 72 2594

SHOTBLASTING & METALLIZING CO.
METAL CLEANING, ANTICORROSION TREATMENT AND
COMPLETE METALLIZING SERVICE
10, CLIVE ROW, CALCUTTA-700 001

With best compliments of :

SENCO
49/B, SHYAMBAZAR STREET, CALCUTTA-700 004
MANUFACTURERS OF
GOLD PRINTERS, PLASTIC FOLDERS

Space donated by :

The Pioneer Art Advertiser
(An authorised advertising Agent of C. S. T. C. Buses)

P-58, B. K. PAL AVENUE
CALCUTTA-700 005

[Phone : 54-3415

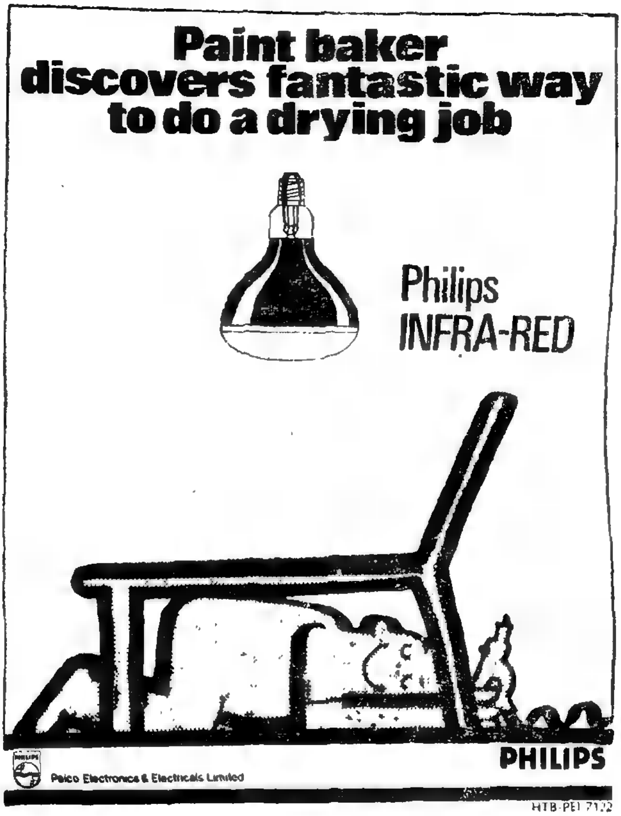
Paint baker discovers fantastic way to do a drying job
Philips INFRA-RED
PHILIPS
Peico Electronics & Electricals Limited
HTB-PEI 7122

KESORAM INDUSTRIES & COTTON MILLS LIMITED

9/1, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700001

Manufacturers of Cotton Textiles & Piece Goods, Rayon Yarn, Transparent Cellulose Film, Sulphuric Acid, Carbon-di-Sulphide, Cast Iron, Spun Pipes, Cement & Refractories etc. etc.

Sections :	*Mills :*
Textile Section	42, Garden Reach Road, Calcutta
Rayon & T. P. Section	Tribeni, Dist. Hooghly
Spun Pipe Section	Bansberia, Dist. Hooghly
Cement Section	Basantnagar, Dist. Karimnagar (A. P.)
Refractory Section	Kulti, Dist. Burdwan

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক
সাহিত্যের সেরা সম্পদ

শ্রীম-কথিত	
*শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত	২৫-০০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	
বিবেকানন্দ চরিত	১৫-০০
ছেলেদের বিবেকানন্দ	৬-০০
শঙ্করীপ্রসাদ বসু	
আমাদের নিবেদিতা	৬-০০
কৃষ্ণ	১০-০০
সুভাষচন্দ্র বসু	
তরুণের স্বপ্ন	১২-০০
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী ১ম	৩৫-০০
ঐ ২য়	৩০-০০
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	
রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্মচেতনা	৮-০০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	
রবীন্দ্রজীবনকথা	২০-০০
মনোজিৎ বসু	
বিধানচন্দ্র	১০-০০
ইন্দ্র মিত্র	
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা	৮-০০
শরৎ-কথামালা	১২-০০
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	
কথায় কথায়	১০-০০
শিবকালী ভট্টাচার্য	
চিরঞ্জীব বনৌষধি	
১ম খণ্ড	৩০-০০
২য় খণ্ড	৩০-০০
৩য় খণ্ড	৩০-০০
৪র্থ খণ্ড	৩০-০০
৫ম খণ্ড	৩০-০০
৬ষ্ঠ খণ্ড	৩০-০০
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	
সাংস্কৃতিকী (৩য়)	২০-০০

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়	
ধর্ম ও প্রগতি	১০-০০
তপনকুমার দাস ও	
ডঃ কানাইলাল ভৌমিক	
কৃষি বিজ্ঞান ঃ প্রযুক্তি ও তথ্য	৪০-০০
ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও	
মলয় দাশগুপ্ত	
ফুল ফোটানোর সহজ পাঠ	১৫-০০
ফুলের বাগান	২৫-০০
দীনেন্দ্রকুমার রায়	
পল্লীচিত্র	১৫-০০
পল্লীবৈচিত্র্য	১৫-০০
তারাপদ রায়	
কাণ্ডজ্ঞান	২৫-০০
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি	১৫-০০
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	
মুক্তিনাথ	১০-০০
সাগরময় ঘোষ	
সম্পাদকের বৈঠকে	১৫-০০
একটি পেরেকের কাহিনী	৬-০০
হীরের নাকছাবি	১৫-০০
ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু	
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে	৭-০০
ক্ষিতিমোহন সেন	
বেদোত্তর সংগীত	২৫-০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট
লিমিটেড
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯
দূরভাষণ=৩৪৪৩৬২ * ৩২৩৪১৭

With best compliments of :

Phone : 25-8434, 250619
Gram : EASY DRYING
Telex : 021-4092 G. P. I.

Grain Processing Industries (India) Pvt. Ltd.
("EXPORT HOUSE" RECOGNISED BY GOVT. OF INDIA)

29, STRAND ROAD, CALCUTTA-700001

Works : *KANTALIA, P. O. MAKARDAH, HOWRAH*

- Complete Modernisation of Rice Mills Undertaken
- Automatic Parboiled Paddy Drier
- Automatic Paddy Parboiling Plant
- Automatic Sheller Type Rice Milling Plant

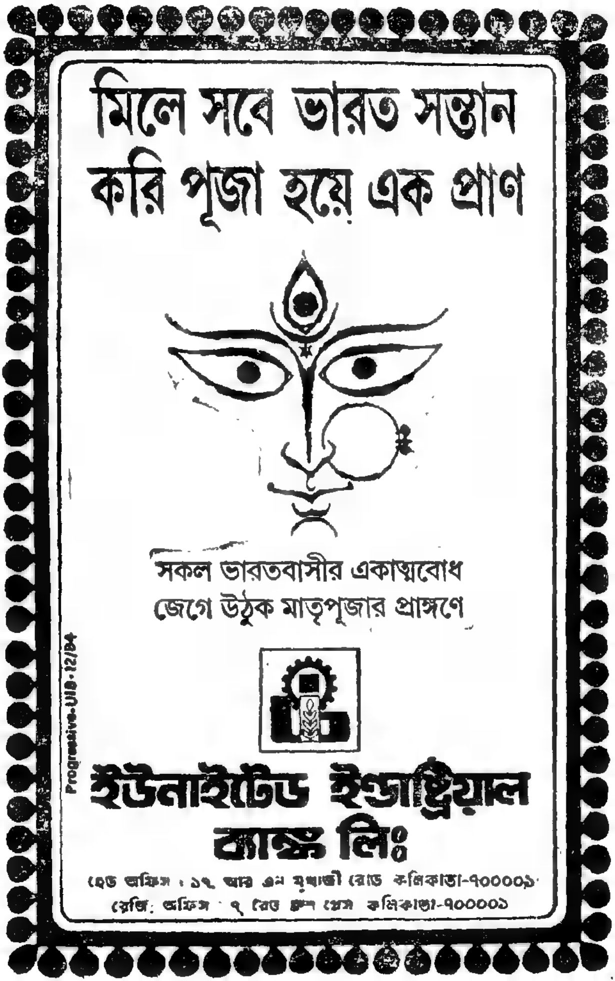

মিলে সবে ভারত সন্তান
করি পূজা হয়ে এক প্রাণ

সকল ভারতবাসীর একাত্মবোধ
জেগে উঠুক মাতৃপূজার প্রাঙ্গণে

**ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ**

হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জী রোড কলিকাতা-৭০০০০১
রেজি: অফিস : ৭, রেড ক্রশ প্লেস কলিকাতা-৭০০০০১

Progressive-UIB-12/84

নিম্নের গ্রন্থগুলি পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

রাজা মহারাজ
স্বামী নরোত্তমানন্দ

মহাপুরুষ শিবানন্দ
স্বামী অপূর্বানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দ
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ
সংকলক ঃ স্বামী সিদ্ধানন্দ

পাঞ্চজন্য
স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভারতের সাধনা
স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে
স্বামী বিবেকানন্দ

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা
সংকলক ঃ স্বামী ধীরেশানন্দ

সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ
অনুবাদক ঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ
অনুবাদক ঃ স্বামী জগদানন্দ

বৈরাগ্যশতকম্
অনুবাদক ঃ স্বামী ধীরেশানন্দ

নারদীয় ভক্তিসুত্র
স্বামী প্রভবানন্দ
অনুবাদক ঃ শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ

রামানুজ চরিত
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

যোগচতুষ্টয়
স্বামী সুন্দরানন্দ

নূতন প্রকাশিত হইতেছে

ওঠ, জাগো, এগিয়ে চলো
স্বামী বুধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা
স্বামী প্রভানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয় | ১ উদ্বোধন লেন | কলিকাতা—৭০০০০৩

বই কিনুন ! বই পড়ুন ! বই আপনার বন্ধু !
নিজে পড়ুন অপরকে পড়ান।
আনন্দ-উৎসবে প্রিয়জনকে বই উপহার দিন।

✻ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত পুস্তকাবলী ✻

মরণের পারে	২৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	২·০০
পুনর্জন্মবাদ	১২·০০	ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	৩০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৯·০০	রাগ ও রূপ (৩ খণ্ডে)	৯০·০
যোগশিক্ষা	২০·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে)	৭৫·০
যোগদর্শন ও যোগসাধনা	২৮·০০	পদাবলী কীর্ত্তনের ইতিহাস	২০·০
কাশ্মীর ও তিব্বতে	২৮·০০	সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান	৩৮·০
আত্মজ্ঞান	২০·০০	মন্ত্রসাধনা ও সংগীত	১৪·
আত্মবিকাশ	৯·০০	বাণী ও বিচার (৫ খণ্ডে)	১২৫·০
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৭·৫০	মন ও মানুষ (২ খণ্ডে)	৫৩·০
হিন্দুনারী	১৫·০০	অভেদানন্দ দর্শন	৩২·
কর্মবিজ্ঞান	১০·০০	কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব	৬·০
শিক্ষা-সমাজ ও ধর্ম	২০·০০	গীতা	১৪ ·
স্তোত্ররত্নাকর	৬·০০	বিশ্বরূপিণী মা সারদা	৩৪·
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে)	৬০·০০	আচার্য অভেদানন্দ	৫·
স্বামী অভেদানন্দ	৬·০০	স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা

স্বামী তেজসানন্দ

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ—আদর্শ ও ইতিহাস ২.০০

প্রার্থনা ও সঙ্গীত ৫.৫০ শ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা ৬.০০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

ধর্ম ও ধর্ম-জীবন ১.৫০

স্বামী প্রেমেশানন্দ

গীতা-সার সংগ্রহঃ ৪.৫০

পরমহংসদেব ২.০০ আত্মবিকাশ ২.০০

স্বামী অব্জজানন্দ

স্বামিজীর পদপ্রান্তে ২২.০০

অন্যান্য পুস্তক :

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ১.০০ শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ ১.০০

স্বামীজীর উপদেশ ১.০০ স্বামী প্রেমানন্দ ২.০০

নূতন প্রকাশিত পুস্তক :

চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত গল্প ৮.০০

প্রকাশক :
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া
পিন—৭১১-২০২

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে নতুন সংযোজন ঃ

স্বামী শুদ্ধানন্দ ঃ জীবনী ও রচনা

সংকলক ও সম্পাদক ঃ **স্বামী নিরাময়ানন্দ**

পৃষ্ঠা ২১+২৫৫ মূল্য ঃ ১৫·০০

বিষয় ঃ স্বামী শুদ্ধানন্দ ঃ জীবনী/স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি/প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন/বৈজ্ঞানিক প্রণালী/ব্যবহারিক ও পারমার্থিক/ভালবাসা/উদাসীর ধর্মস্বপ্ন/ম্যাক্সমূলার লিখিত পরমহংসদেবের জীবনচরিত/স্বামী যোগানন্দ/বিবেক-বৈরাগ্য/কোন্ পথে যাই ?/ আদর্শ ও বাস্তব/আসল ও নকল/সাধকের স্বগতোক্তি/সাধনা/ধর্মবিরোধ ভঞ্জনের কয়েকটি উপায়/ সাধনভজন ও জীবসেবা/মানুষ/'আমি'র অনুসন্ধানে/মানবসমাজে ধর্মের প্রয়োজন/ কঃ পন্থাঃ ? / উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য/স্বামীজীর আদর্শ/উদ্বোধনের নববর্ষ/কি শিখিলাম/উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত/শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও উপদেশ/ সন্ন্যাসীর গীতি।

স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্ন্যাসিশিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পর 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক। স্বামী সারদানন্দের পরই তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ-সচিব এবং পরবর্তী কালে পঞ্চম সঙ্ঘাধ্যক্ষ। শুদ্ধানন্দ-কৃত স্বামীজীর রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তি রহস্য, সন্ন্যাসীর গীতি প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ অনুবাদ-সাহিত্যে চির অক্ষয় এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের মহান সম্পদ।

বিভিন্ন সময়ে উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামী শুদ্ধানন্দ-রচিত প্রবন্ধাবলী থেকে সুনির্বাচিত সংকলনটি বর্তমান যুগে স্বামীজীর বাণীর তাৎপর্য বুঝতে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে অসাধারণ উপযোগী।

প্রকাশক

উদ্বোধন কার্যালয় | ১ উদ্বোধন লেন | কলিকাতা-৭০০০০৩

Space donated by Smt. Reva Chakravarty, Siliguri.

স্বামিজীর পদপ্রান্তে

(স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের জীবনচরিত)

স্বামী অব্জজানন্দ

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ **মূল্য—বাইশ টাকা**

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :

"স্বামিজীর অলৌকিক জীবনের এক-একটি বিশেষ দিক তাঁহার এক একজন শিষ্যের চরিত্রে ও কর্মে কীভাবে রূপায়িত হইয়াছে, উহারই মর্মকথা এবং বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধর্মান্দোলনে এই সব ত্যাগী পুরুষের আত্মনিবেদনের ইতিহাস প্রকাশ্যমান গ্রন্থখানিতে পাওয়া যাইবে।"

*

"…গ্রন্থটি স্বামী বিবেকানন্দের উৎকৃষ্ট জীবনী—শিষ্যগণের জীবনের পটে লেখা। সে বিবেকানন্দ ভয়ংকর না সুন্দর?…তিনি যেন সূর্য, অগণ্য কিরণে অগণ্য হৃদয়কে আলোকিত করছেন।…তিনি যেন স্বয়ং পশুপতি—মানবের অন্তরস্থ নিদ্রিত বেদান্তকেশরীদের জাগিয়ে তোলার জন্য অমোঘ গর্জন করছেন।…

"স্বামী অব্জজানন্দের গ্রন্থ থেকে সাধারণ ইতিহাসেরও নানা উপাদান পেয়েছি। উনিশ শতকের শেষভাগে ধর্মাশ্রিত আদর্শবাদে আক্রান্ত বাঙালী যুবকদের মানসিক অবস্থার কথা এখানে পাওয়া যাবে; রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাথমিক সংগঠন পর্বের এবং সেবাধর্ম-কর্মের আদি ইতিহাসও।… সব জড়িয়ে নিকট কালের রামায়ণীয় আলেখ্যদর্শন। এই গ্রন্থের চিত্রশালায় আছে অজস্র চিত্র…।"

—**অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু** ('উদ্বোধন', ফাল্গুন, ১৩৯০)

"স্বামিজীর শিষ্যদের সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রন্থে বিবেকানন্দকে পাওয়া যায় নব রূপে, নব ভাবে। গুরু রূপে, পিতা রূপে, কখনো স্নেহপ্রবণ কোমল হৃদয়, কখনো অভিমানী বালকস্বভাব স্বামিজীকে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেল তাঁর সন্তানদের জীবনচরিতে—এতদিন তাঁর এ পরিচয় জানা যায়নি। ত্যাগে, প্রেমে, সেবায়, ভক্তিতে উজ্জ্বল এই সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীদের জীবনকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছিলেন স্বামিজী, রেখেছিলেন তাঁর অপরিমেয় ভালবাসা দিয়ে। বর্তমান গ্রন্থে লেখক গুরু ও শিষ্যদের ঐকান্তিক ভালবাসার চিত্রগুলির সঙ্গে উপহার দিয়েছেন তৎকালীন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের জীবন ও কর্মের বহু খণ্ড চিত্র এবং শ্রীমা সারদাদেবীর সন্তানস্নেহের কয়েকটি দুর্লভ মুহূর্ত।"

—**ডক্টর চিত্রা দেব** ('দেশ', ১৮ অগস্ট, ১৯৮৪)

প্রকাশক :
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ
বেলুড়-মঠ (হাওড়া) ৭১১-২০২

Space donated by an ex-student of Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম

বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৫৬

প্রকাশিত স্বল্প মূল্যে কিছু ভাল বই

● স্বামী নির্বেদানন্দ

Hinduism At A Glance [ভূমিকা ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান]	২০.০০
হিন্দু ধর্ম	১৫.০০
Religion and Modern Doubts	১৪.০০
Our Education [UNESCO কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত]	১২.০০
ভারত কল্যাণ [ভারতের জাতীয় সমস্যা ও স্বামী বিবেকানন্দের পথনির্দেশ]	৬.০০

● স্বামী সন্তোষানন্দ গ্রথিত

উপনিষদ্ সংকলন [সুনির্বাচিত শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ]	৮.৮০

● স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

গল্পে বেদান্ত [ভারত সরকারের পুরস্কার প্রাপ্ত]	৭.০০

● স্বামী সত্যঘনানন্দ

আমাদের বিবেকানন্দ [জীবনী, উপদেশ এবং যুবকদের প্রতি আহবান]	৩.৬০

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ৫০০তম জন্মজয়ন্তী বর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

কিশোর-কিশোরী ও সর্ব সাধারণের জন্য

ভাগবতের কথা ও গল্প (সচিত্র)

স্বামী অমলানন্দ

দশ টাকার বই ১৯৮৫-এর জন্য আট টাকা

● স্বামী অমলানন্দের আরও বই

রামায়ণ কাহিনী	৪.৫০
মহাভারত কাহিনী	৬.৫০
রামায়ণ কণিকা	২.৫০
মহাজীবন ও বাণী [শ্রীশ্রীঠাকুর, মা এবং স্বামীজীর জীবন ও বাণী এবং আরতি স্তব]	১.৫০

● শ্রীম-কথিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতম্ (১ম) [বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ]	২০.০০

প্রাপ্তিস্থান :

(১) প্রকাশক (২) উদ্বোধন কার্যালয়, কলি-৩
(৩) রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ
(৪) অদ্বৈত আশ্রম, ৫, ডিহি এন্টালি রোড, কলি-১৪
(৫) অনুপমা বুক হাউস, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩